প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা

[শিক্ষা বিষয়ক নির্বাচিত সংকলন]

সম্পাদনা
অসিতাভ দাশ

প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ ঃ সুবল সরকার

মুদ্রণ ঃ
দি নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলি-৬

যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।

—রবীন্দ্রনাথ

যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলের আমার সমস্ত প্রাক্তন সহকর্ম্মী-দের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ—

যাদের স্নেহে, প্রশ্রয়ে ও আশ্রয়ে
কেটেছে আমার
স্মৃতি মধুর অনেকগুলো বছর—

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

(যে সমস্ত গ্রন্থ, সাময়িক পত্রিকা ও গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি তাদের নাম উল্লেখ করা হল।)

উদয়ন

চন্দননগর সরকারী কলেজ গ্রন্থাগার

দেশ ঃ সাহিত্য সংখ্যা

নারায়ণ

প্রদীপ

প্রবাসী

ভারতী

বঙ্গদর্শন

বঙ্গবাণী

বিচিত্রা

বিশ্বভারতী

যোগমায়া দেবী কলেজ গ্রন্থাগার

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী

সুপ্রভাত

সৈয়দ মুজতবা আলি রচনাবলী

স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী

এবং সমস্ত লেখকবৃন্দ

॥ কথামুখ ॥

"শিক্ষা" এমন একটি বিষয় যা আমাদের জীবনজীবিকার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। মানুষ যখন থেকে সমাজ ও নানা আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে ভাবতে শিখেছে, তখন থেকেই শিক্ষার আত্মপ্রকাশ। পুরাণের শিক্ষা পদ্ধতি থেকে বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানবার জন্য আমারা সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকি। এই হেতু মূলতঃ স্বাধীনতার পূর্বে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাংলার জ্ঞানী-গুণীজন যে চিন্তাভাবনা করেছিলেন সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। তারই মধ্যে বেশ কিছু প্রবন্ধরাজি সংকলন করে প্রকাশিত হল "প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা"।

অস্বীকার করার উপায় নেই, শিক্ষা বিষয়ক বহু গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের সংকলনের সংখ্যা খুব কম, নেই বললেই চলে। বিশেষ করে এই সংকলনে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যাঁদের লেখা সংকলিত হয়েছে, তাঁরা অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাজগতের সাথে সংযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৃত্তিতে ও পেশায় স্বমহিমায় দেশের মানুষের নয়নমণি ছিলেন ও কর্মদক্ষতা বলে দেশের মানুষের একান্ত আপনজন বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

শিক্ষাজগত সম্বন্ধে তাঁদের যে অমূল্য চিন্তাভাবনা যে প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, আশা করি সেই প্রবন্ধগুলির সঠিক মূল্যায়ণ প্রকৃত পাঠকরা তাঁদের সঠিক দৃষ্টি দ্বারা বিচার করে সম্মান জানাতে দ্বিধাবোধ করবেন না।

এই গ্রন্থের আর একটি অমূল্য আকর্ষণ বাংলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ, খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক ও সুকবি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ পবিত্র সরকারের অমূল্য মুখবন্ধ। শিক্ষাজগতে তাঁর পরিচয় ও অবদানের কথা নিষ্প্রয়োজন। প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার পরিসীমা নেই। আমি তাঁকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

এই গ্রন্থের পরিকল্পনা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার পোয়ালীর বাসুদেব ঘোষ ও গোরাচাঁদ ঘোষ এবং তরুণ প্রকাশক অসীমকুমার মণ্ডলের কাছে আমি ঋণী। নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছে আমার বন্ধু ও সহপাঠী আশীষ ভট্টাচার্য্য, যোগমায়া দেবী কলেজের গ্রন্থাগারিকদ্বয় রমা কুমার এবং সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীর কর্ম্মী অজিতকুমার পাত্র, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র অসীম চক্রবর্ত্তী, মৃণাল কান্তি মণ্ডল এবং অমিতাভ দত্ত এবং দি নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্সের কর্মীবৃন্দ। ব্যক্তিগতভাবে এদের সকলের কাছে আমি ঋণী।

এই গ্রন্থের পরিশেষে যে সমস্ত লেখকের প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং কোন্ কোন্ পত্রিকা থেকে প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হয়েছে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া যে সমস্ত পত্রপত্রিকা গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার এই সংকলনের কার্য্যে ব্যবহার করেছি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সেগুলির একটি তালিকা গ্রন্থের প্রথমাংশে সংযোজন করা হল।

আবার স্মরণ করিয়ে দিই এই সংকলনটির যথার্থ মূল্যায়ণ ও গুণাগুণের বিচারের ভার পাঠকদের উপর।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪
৬, অন্নদা ব্যানার্জী লেন
কলিকাতা—২০

অসিতাভ দাশ

। মুখবন্ধ ॥

শিক্ষা বিষয়ে মনস্বী বাঙালিদের নানাবিধ চিন্তার একটি সংকলন এই মুহূর্তেই খুব প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন এই জন্য যে, দেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটছে, সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর কার্যক্রমে উৎসাহের প্রবল সাড়া পড়েছে, স্কুলে কলেজে ভর্তির জন্য প্রবল উদ্যম ও ভর্তি হতে না পারলে হতাশার ছবিটি দৈনিক কাগজে বেশ স্পষ্ট করেই প্রচার করা হচ্ছে—কিন্তু সবচেয়ে বড় এই প্রশ্নগুলি আর করা হচ্ছে না যে—'কেন' শিক্ষা, 'কোন্' শিক্ষা, 'কীভাবে' শিক্ষা। শিক্ষা নিতে নিতেই আর ভর্তি, পরীক্ষা দেওয়া, পাশ করার জন্য ব্যাকুল হতে হতেই—বার বার আমাদের এ প্রশ্নগুলি করে যেতে হবে; নিজেদের কাছে, এবং যাঁরা শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা করেন তাঁদের কাছে। এমন নয় যে, এ প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যায়নি। যেসব মনীষীর লেখায় এ সংকলন সমৃদ্ধ হয়েছে তারা নানাভাবে উত্তর দিয়েছেন। সে উত্তরগুলি আমরা সব সময় মনে রাখতে পারি না—এই যা।

প্রশ্নগুলি দিয়েই আবার শুরু করা যাক। উপরের তিনটি প্রশ্ন পরস্পর থেকে আলাদা নয়, বরং প্রথমটির উত্তর পেলে বাকি-গুলির উত্তরও সহজে হাতে এসে যাবে। কাজেই সেটা নিয়েই দু-কথা বলা যায়। প্রথম প্রশ্নটির একটা উত্তর আদর্শবাদী স্তরে দেওয়া হয়—শিক্ষা মানুষ হওয়ার জন্য; আর একটি উত্তরও কমবেশি আদর্শবাদের সঙ্গেই জুড়ে থাকে—শিক্ষা জ্ঞানলাভের জন্য; কিন্তু তৃতীয় উত্তরটির উৎস আমাদের পারিবারিক সামাজিক ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রাগমাটিজ্‌ম—শিক্ষা উপযুক্ত জীবিকা লাভের জন্য।

আমরা যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছি, বিশেষত উপনিবেশ-বসানো বিদেশি শাসকেরা যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে তৈরি করেছে, তাতে প্রথম দুটি উত্তর কেবল অর্থহীন বুলিতে পরিণত হয়েছে; তৃতীয় উত্তরটিই আমাদের জীবনসর্বস্ব হয়ে উঠেছে।

তার কারণ খুব সহজ। প্লাতো, আরিস্তোতল, স্পেনসার, রুশো, লক্, কোঁত, ডিউই, পিয়াজে শিক্ষাচিন্তা করেন স্বাধীন কিংবা গণতান্ত্রিক সমাজের সদস্যদের বিকাশের কথা ভেবে, আমাদের মনীষীরাও মূলত সেই আদর্শকে শিরোধার্য করেন। কিন্তু উপনিবেশের শিক্ষানীতি হয় ভালো চাকর তৈরির শিক্ষানীতি। উপনিবেশ স্থাপন করা হয় বৃহত্তর বাজার দখলের জন্য, তার শাসন চলে সস্তায় উৎপাদন ও বেশি দামে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা মজবুত ও অনড় রাখার জন্য। ফলে আজ যাকে 'বাজার-অর্থনীতি' বলি, সেই 'ফেলো-কড়ি-মাখো-তেল' অর্থনীতির মূল রূপই হল ঔপনিবেশিক অর্থনীতি। রাজনীতি তখনও অর্থনীতির ক্রীতদাস ছিল, এখনও আছে। আর শিক্ষানীতিও রাজনীতি-অর্থনীতির হুকুম মেনেই তৈরি হত, এখনও তাই হয়। ফলে চাকরি সর্বস্ব শিক্ষার একটা শর্ত তৈরি হয়ে গেছে। অর্থনীতির মন্দার ফলে এখন মেয়েদেরও শিক্ষা আর ডিগ্রি নিয়ে চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় আসতে হচ্ছে—যেটা সামাজিক সমতারক্ষার দিক থেকে নিশ্চয়ই ভালো ব্যাপার—কিন্তু তার ফলে ছাত্রছাত্রীরাও হয়ে উঠছে বিক্রয়যোগ্য পণ্য। চাকরির বাজারে কার কত দাম দাঁড়াচ্ছে তারই উপর নির্ভর করছে মনুষ্যত্বের মূল্য। এও সোনাচাঁদির হিসেব। অন্নদাশংকর রায়ের একটি ছড়ায় একটি সম্ভাব্য পাত্র বলেছে—'করছি পণ নেব না পণ বউ যদি হয় সুন্দরী, কিন্তু আমায় বলতে হবে স্বর্ণ দেবে কয় ভরি।'...অর্থাৎ সুন্দরী সুন্দরী নয়, যদি না তার পিছনে কাঞ্চনমূল্য ধরে দেওয়া হয়। কিন্তু যখন সেই পাত্রকে জিজ্ঞেস করা হল—'তুমিই বা কোন্ কার্তিক? তখন সে রেগেমেগে বলল যে, হিসেবটা 'উভয়তই আর্থিক—স্বর্ণের নাম সুন্দরী, আর মাইনের নাম কার্তিক।' সে মোটা মাইনে পায়, কাজেই ধরে নিতে হবে সে কার্তিকের মতো রূপবান।

অলংকার-যৌতুক আর মোটা মাইনে বাগানোর এই শিক্ষাই আমাদের উন্মাদ ঘোড়দৌড়ের লক্ষ্য। সেই জন্যই ইংলিশ মিডিয়াম অথচ প্রায় নিরক্ষর বহু স্কুলের এত রমরমা, সেই জন্যই এত জয়েন্ট এনট্রান্সের ভিড়, সেই জন্যই ছেলেদের বিজ্ঞান বা ডাক্তারি বা

ম্যানেজমেন্ট না পড়াতে পারলে বাপ-মা সর্বনাশ হল বলে মনে করেন। আর চাকরির জন্য চাই ভালো ডিগ্রি—জ্ঞান নয়, তাই এত নোট বই, প্রাইভেট টুইশান কোচিং ক্লাসের দুন্দুভিনিবাদ। এক বাজার আর এক বাজারকে পুষ্ট করে, বেসিক ইণ্ডাস্ট্রির সঙ্গে ডাউনস্ট্রিম ইণ্ডাস্ট্রির মতো ডিগ্রির বাজারের সঙ্গে জুড়ে যায় অবৈধ শিক্ষাবিক্রয়ের বাজার।

কেউ কেউ হয়তো ভাবে—শিক্ষা কি এই জন্যই? তরুণরা কেউ কেউ এই পেষণযন্ত্রের মধ্যে পড়ে ছিটকে যায়, আত্মহত্যার দৃষ্টান্তও খুব বিরল নয়। তাদের মধ্যেই হয়তো বেশি করে ভাবনাটা জাগে—কেন এই শিক্ষা, কেন এমন শিক্ষা। কাকে বলে সত্য শিক্ষা, কোন্ লক্ষ্যে পেঁছে দেবে সেই সত্য শিক্ষা? নিষ্ঠুর বাজারি প্রতিযোগিতা নয়, পাশে দৌড়োনো প্রতিযোগীকে ফেলে দিয়ে ধ্বংস করে এগিয়ে যাওয়া নয়, কেবল অন্ধ আত্মসুখসন্ধান অর্থ বিত্ত আয়েশ সন্ধান নয়, শিক্ষায় নিশ্চয়ই এর চেয়ে বড় কোনো একটা মানে আছে, আছে একটা মানবিক সুখ।

সেই অর্থের, সেই মানবিক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে এ বইয়ে সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে। বাঙালির মনন জীবন ও আদর্শ-বোধকে যাঁরা অসামান্যরূপে সমৃদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সেই যাবতীয় মনীষীর শিক্ষাচিন্তার শ্রেষ্ঠ ও প্রতি-নিধিত্ব মূলক নিদর্শনগুলি এখানে সংগৃহীত হয়েছে। তাঁরাই উপরের প্রশ্নগুলির শ্রেষ্ঠ উত্তর জুগিয়েছেন। সেইসব উত্তর আমাদের শিক্ষার নীতিগত ও মানবিক ভিত্তিকে আরও সবল করুক। 'প্রভা প্রকাশনী'কে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই এরকম একটি সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন বলে।

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচীপত্র

বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের উপরে যে শক্তি যে শাসন যে ইচ্ছে কাজ করচে, সমস্তই বাইরের দিক থেকে। সে এত প্রবল যে, তাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম ক'রে আমরা কোনো ভাবনাও ভাবতে পারি নে। এ'তে ক'রে আমাদের মনীষা প্রতিদিন ক্ষীণ হ'য়ে যাচ্চে। আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি, অন্যের শিক্ষাকে গ্রহণ করি, অন্যের বাণীকে আবৃত্তি করি, তাতে ক'রে প্রকৃতিস্থ হ'তে আমাদের বাধা দেয়। এই জন্যে মাঝে মাঝে যে-চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় তাতে কল্যাণের পথ থেকে আমাদের ভ্রষ্ট করে। এই অবস্থায় এক-দল লোক গর্হিত উপায়ে বিদ্বেষ-বুদ্ধিকে তৃপ্তি দান করাকেই কর্ত্তব্য ব'লে মনে করে, আর একদল লোক চাটুকারবৃত্তি বা চর-বৃত্তির দ্বারা যেমন ক'রে হোক্ অপমানের অন্ন খুঁটে খাবার জন্যে রাষ্ট্রীয় আবর্জ্জনাকুণ্ডের আশে পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এমন অবস্থায় বড় ক'রে দৃষ্টি করা বা বড় ক'রে সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না; মানুষ অন্তরে বাহিরে অত্যন্ত ছোট হ'য়ে যায়। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।

যে-ফলের চারাগাছকে বাইরে থেকে ছাগলে মুড়িয়ে খাবার আশঙ্কা আছে সেই চারাকে বেড়ার মধ্যে রাখার দরকার হয়। সেই নিভৃত আশ্রয়ে থেকে গাছ যখন বড় হ'য়ে ওঠে তখন সে ছাগলের নাগালের উপর উঠে যায়। প্রথম যখন আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প আমার মনে আসে তখন আমি মনে করেছিলুম ভারতবর্ষের মধ্যে এইখানে একটি বেড়া-দেওয়া স্থানে আশ্রয় নেব। সেখানে বাহ্য শক্তির দ্বারা অভিভূতির থেকে রক্ষা ক'রে আমাদের মনকে একটু স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা করা যাবে। সেখানে চাঞ্চল্য থেকে রিপুর আক্রমণ থেকে মনকে মুক্ত রেখে বড় ক'রে শ্রেয়ের কথা চিন্তা করব এবং সত্য ক'রে শ্রেয়ের সাধনা করতে থাকব।

আজকাল আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তপস্যাকেই মুক্তির তপস্যা ব'লে

ধ'রে নিয়েছি। দল বেঁধে কান্নাকেই সেই তপস্যার সাধনা ব'লে মনে করেছিলুম। সেই বিরাট কান্নার আয়োজনে অন্য সকল কাজ-কর্ম্ম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এইটেতে আমি অত্যন্ত পীড়াবোধ করেছিলুম।

আমাদের দেশে চিরকাল জানি, আত্মার মুক্তি এমন একটা মুক্তি যেটা লাভ করলে সমস্ত বন্ধন তুচ্ছ হ'য়ে যায়। সেই মুক্তিটাই, সেই স্বার্থের বন্ধন রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তিটাই আমাদের লক্ষ্য, সেই কথাটাকে কান দিয়ে শোনা এবং সত্য ব'লে জানার একটা জায়গা আমাদের থাকা চাই। এই মুক্তিটা যে কর্ম্মহীনতা শক্তিহীনতার রূপান্তর তা নয়। এতে যে নিরাসক্তি আনে তা তামসিক নয়; তাতে মনকে অভয় করে, কর্ম্মকে বিশুদ্ধ করে, লোভ মোহকে দূর ক'রে দেয়।

তাই ব'লে এ-কথা বলিনে যে বাইরের বন্ধনে কিছুমাত্র শ্রেয় আছে, বলিনে যে তাকে অলংকার ক'রে গলায় জড়িয়ে রেখে দিতে হবে। সেও মন্দ কিন্তু অন্তরে যে মুক্তি তাকে এই বন্ধন পরাভূত ও অপমানিত করতে পারে না। সেই মুক্তির তিলক ললাটে যদি পরি তা'হলে রাজসিংহাসনের উপরে মাথা তুলতে পারি এবং বণিকের ভূরিসঞ্চয়কে তুচ্ছ করার অধিকার আমাদের জন্মে।

যাই হোক, আমার মনে এই কথাটি ছিল যে, পাশ্চাত্যদেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে, সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানারকমে বল দিচ্চে ও পথ নির্দ্দেশ করছে। তারি সঙ্গে সঙ্গে অবান্তরভাবে এই শিক্ষা দীক্ষায় অন্য দশরকম প্রয়োজনও সিদ্ধ হ'য়ে যাচ্চে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড় লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে নি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড় হ'য়ে উঠ্‌ল।

জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে, সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, একথা যদি না মানি তা'হলে নিতান্ত ছোট হ'য়ে যাই।

এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে ক'রেই এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্চে বাইরের নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্যে এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।

আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ কালের অবস্থাটা দেখেন নি। তখন আর যাই হোক এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সব চেয়ে বড় ছিল সে হচ্চে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুল মাষ্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমন কি, বিছানা তৈজসপত্র প্রভৃতি সমস্ত আমাকেই জোগাতে হ'ত।

কিন্তু আধুনিক কালে এত উজান পথে চলা সম্ভবপর নয়। কোনো একটা ব্যবস্থা যদি এক জায়গায় থাকে এবং সমাজের অন্য জায়গায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তা'হলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টিঁকতে পারে না। সেইজন্যে এই বিদ্যালয়ের আকৃতি প্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হ'য়ে এসেচে। কিন্তু হ'লেও সেই মূল জিনিষটা আছে। এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্যমুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্চে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।

তার পরে ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন করব। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী যে-জালে আমাদের দেশকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলেচে তার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত। দেশে বিদেশে শিক্ষার যে-সব সিংহদ্বার আছে আমাদের বিদ্যালয়ের পথ যদি সেইদিকে পেঁছে না দেয়, তা'হলে কি জানি কি হয় এই ভয়টা মনের ভিতর ছিল। পুরোপুরি সাহস ক'রে উঠতে পারি নি, বিশেষত আমার শক্তিও যৎসামান্য অভিজ্ঞতাও তদ্রূপ। সেইজন্যে এখানকার বিদ্যালয়টি মাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে তুলতে হয়েছিল। সেই গণ্ডিটুকুর মধ্যে যতটা পারি স্বাতন্ত্র্য রাখতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমাদের বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীনে আনতে পারি নি।

পূর্বেই বলেচি, সকল বড় দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য

ব্যবহারিক সুযোগ লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতাসাধন। এই লক্ষ্য হ'তেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক্ ও রাজা তাঁদের সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধনের জন্যে বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন। এমন কি, তখনকার কোনো কোনো পুরোনো দফ্তরে দেখা যায় প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ তিরস্কার করেচেন।

তারপরে যদিচ অনেক বদল হ'য়ে এসেচে, তবু কৃপণ প্রয়োজনের দাসত্বের দাগা আমাদের দেশের সরকারী শিক্ষার কপালে পিঠে এখনো অংকিত আছে। আমাদের অভাবের সংগে অন্নচিন্তার সংগে জড়িয়ে আছে বলেই এই বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন ক'রে হোক্ বহন ক'রে চলেচি। এই ভয়ংকর জবরদস্তি আছে ব'লেই শিক্ষা-প্রণালীতে আমরা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারচি নে।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধ'রে নেওয়া হয়েচে যে আমরা নিঃস্ব। যা-কিছু সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে—আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই। এ'তে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্ব ভাব জন্মায়। আত্মাভিমানের তাড়নায় যদি বা মাঝে মাঝে সেই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি, তা'হলেও সেটাও কেমনতর বেসুরো রকম আস্ফালনে আত্মপ্রকাশ করে। আজকালকার দিনের এই আস্ফালনে আমাদের আন্তরিক দীনতা কিছুই ঘোচে নি, কেবল সেই দীনতাটাকে হাস্যকর ও বিরক্তিকর ক'রে তুলেচি।

যাই হোক মনের দাসত্ব যদি ঘোচাতে চাই তা'হলে আমাদের শিক্ষার এই দাসভাবটাকে ঘোচাতে হবে। আমাদের আশ্রমে শিক্ষার যদি সেই মুক্তি দিতে না পারি, তা'হলে এখানকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

কিছুকাল পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়েছিল। আমাদের টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্যসকল

শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল আশ্রয় স্বরূপ অবলম্বন ক'রে তার উপরে অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের ক'রে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র হ'তে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর এই সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নানা বাধায় তখন তিনি তা পারেন নি। এই অধ্যবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেন।

তার পরে তাঁকে পুনরায় আশ্রমে আহ্বান ক'রে আনা গেল। এবার তাঁকে ক্লাস পড়ান থেকে নিষ্কৃতি দিলুম, তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হ'ল এই রকম কাজই হচ্চে শিক্ষার যজ্ঞ ক্ষেত্রে যথার্থ যজ্ঞ। যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এই রকম বিদ্যার সাধকদের চারিদিকে সমবেত হন তা হলে ত ভালই, আর যদি আমাদের দেশের কপালদোষে সমবেত না হন তাহলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না। কথার মানে এবং বিদেশের বাধা বুলি মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের তোতাপাখী ক'রে তোলার চেয়ে এ অনেক ভাল।

শিশু দুর্ব্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সত্য যখন সেই-রকম শিশুর বেশে আসে তখনই তার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়। একেবারে দাড়ি গোঁফ সুদ্ধ যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে তাহলে জানা যায় সে একটা বিকৃতি। বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোট দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েচে। কিন্তু ছোটর ছদ্মবেশে বড়র আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা যাক্, মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠুক। একান্তমনে এই আশা করা যাক্ যে এই শিশু বিধাতার অমৃত ভাণ্ডার থেকে অমৃত বহন ক'রে এনেচে; সেই অমৃতই এঁকে ভিতর থেকে বাঁচাবে, বাড়াবে, এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।

শিক্ষাপ্রণালী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মীমাংসা হইয়াছিল ইংরাজি না পড়িলে আমাদের কোন উন্নতি হইবে না, যেহেতু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাল পত্রের গ্রন্থগুলিতে কেবল ক্ষীরসমুদ্রের ও দধিসমুদ্রের বর্ণনা আছে।

আজকাল সাব্যস্ত হইতে বসিয়াছে ইংরাজি পড়িয়া ত বিশেষ কিছু ফল হইল না। পঞ্চাশবৎসরের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় পণ্ড হইল দেখিয়া দেশের মধ্যে একটা হাহুতাশ ও কলরব উপস্থিত হইয়াছে, ও চারিদিকেই তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে।

বৎসর দুই পূর্ব্বে এশিয়াটিক্ সোসাইটির সভাপতি বার্ষিক অধিবেশনের বক্তৃতাকালে সোসাইটির জন্মকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সোসাইটির সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির লেখকের তালিকা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, দেখ, তালিকা মধ্যে বাঙ্গালীর নাম কেমন বিরল, এতকাল ইংরাজি শিখিয়াও একটা সুচারু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইহাদের মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইল না; বাঙ্গালীর কোন আশাই নাই। তাহাদের মাথাই নাই।

দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতির প্রতি দয়া বিতরণে বিধাতা তেমন মুক্তহস্ত নহেন, তথাপি কেমন করিয়া এই নিদারুণ বাক্যবাণ তাঁহার নিকট পেঁছিয়া তাঁহার হৃদয়কে একটু যেন করুণ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কেননা, উক্ত অধিবেশনের পর এক বৎসর পার না হইতেই ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর কার্য্যকলাপ বাঙ্গালীর মলিন মুখকে সহসা জ্যোতিস্ম্যয় করিয়া দিয়াছে।

বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র যন্ত্রটি বনমানুষের হাড়ের বিনা প্রয়োগে আদেশমাত্র আকাশ তরঙ্গ ঘটিত যে সকল নিগূঢ় কথা বলিয়া ফেলে, তাহা সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট দুর্ভেদ্য রহস্য মাত্র, কিন্তু তিনি যে তাহার শুষ্ক মুখে হাস্য সঞ্চার করিয়াছেন, তজ্জন্য সে তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে।

যাহাই হউক, বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অনুর্ব্বরতা সম্বন্ধে আজকাল তত লম্বা কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, তথাপি বর্ষণ সত্ত্বেও ফল প্রসব হইতেছে না কেন তাহা চিন্তনীয় বিষয়।

সেদিন বিজ্ঞান সভায় বঙ্গের মহামান্য শাসনকর্ত্তা বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিরাশ হইবার তেমন কারণ নাই, তবে কর্ষণের পদ্ধতি দোষে এ রকম ফলাভাব। সুচারুরূপে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কর্ষিত হইলেই ক্ষেত্রে শস্য জন্মিবে এবং কৃষ্ণ কাকের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ঘটিলেই সে গৃধ্ররাজের সহিত আপনার পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া তাহার কর্ক্কশ কলরবে বিরাম দিবে।

সেই পদ্ধতিটা কি? বক্তার মতে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীটা ঠিক্ নহে। অর্থাৎ ভারত গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা লাভ যে প্রণালীতে বাঙ্গালী সন্তানকে মানুষ করিতেছেন, তাহাতে সে মানুষ না হইয়া কাক হইতেছে। ছাত্রেরা পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া অবধি কেবল শব্দতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্ব অভ্যাস করে, সেই জন্য তাহাদের কেবল শব্দালঙ্কারে ও বাক্যালঙ্কারে আপনাকে অলঙ্কৃত করিবার শক্তি জন্মে। কখনও হাতে কলমে কাজ শেখে না, বিশেষতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্র নামে যে একটা শাস্ত্রকে সকলেই নিন্দা করে, অথবা যাহার সাহায্য না লইলে এক পা চলিতে পারে না; সেই শাস্ত্রের একবারে আলোচনা নাই বলিলেই হয়। অথচ অন্য পক্ষে মিলের ও বার্কের রচনা হইতে কতকগুলা বচন সংগ্রহ করিয়া তাহার বাবদ কথা বৃদ্ধি পায় কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপে তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে সে জ্ঞানই তাহার জন্মে না। অস্ত্র বড় উপকারী পদার্থ, কিন্তু যে অস্ত্রের ব্যবহারে অনভিজ্ঞ ও প্রয়োগে অপটু, তাহার পক্ষে তাহা কেবল ভার স্বরূপ।

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি; বিজ্ঞান শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে অন্যের কোন সন্দেহ থাকিলেও আমাদের কিছুমাত্রও সংশয় নাই এবং বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসাদে আমাদের কার্য্যকারণ তত্ত্বজ্ঞান ও তাহার সহিত কাণ্ডজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে তাহাও আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি; আর হাতে কলমে শিক্ষা, যাহাকে ইংরাজিতে টেকনিক্যাল শিক্ষা বলে, তাহার

অভাবে প্রয়োগাভিজ্ঞতা জন্মে না তাহাও স্বীকার করি। তথাপি একটা কিন্তু আছে, তাহার উত্থাপনের পূর্ব্বে আর কে কি বলেন, তাহা একবার দেখিয়া লওয়া যাক্।

অনেকের মত এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে ধর্ম্মহীন ও নীতি-হীন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই জন্য আমাদের চরিত্র ভাল জমাট বাঁধিতেছে না; এবং চরিত্রের সারবত্তা না থাকিলে কোন শিক্ষাতেই কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মহীনতা ও নীতি-জ্ঞানের অভাবে আমরা জীবনের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব বুঝতে পারি না। আমরা সংসারে থাকি। অথচ, সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বুঝি না। আমরা উপরে ভাসি, তলে মগ্ন হইতে পারি না। যত দিন ধর্ম্মহীন ও নীতিহীন শিক্ষা বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন আমরা সংসার-সলিলে ভাসিতেই থাকিব।

এই কথাটাও আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাঁহারা এই বিষয়ে কথা তুলেন, তাঁহারা মীমাংসার পথ দেখান না। যাঁহাদের উপর শিক্ষার বন্দোবস্তের ভার আছে, তাঁহারাও ইহা স্বীকার করেন কিন্তু কর্ত্তব্য-বিচারের সময় কেমন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন। গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, ভারত-বর্ষের হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান জড়িত সমাজে আমরা কিরূপে ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি; বিশেষতঃ যখন আমরা এবিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না এই প্রতিশ্রুতি করিয়া বসিয়া আছি। তবে ধর্ম্ম অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও নীতির উপদেশ চলিতে পারে; তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, প্রবেশিকার সাহিত্য পুস্তকের এত পাতার মধ্যে এত পাতার কম যেন নীতি-কথা না থাকে। নীতিশিক্ষার এমন রাজকীয় পন্থা আবিষ্কার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন অন্যের কর্তৃক অসাধ্য। কোন কোন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা আরও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মিশনরী সাহেবেরা ছাত্রদিগকে ভয় দেখান, বাইবেল ক্লাশে উপস্থিত না থাকিলে পরীক্ষা দিতে দিব না। অথচ, আর্য-বিদ্যার আকরগুলিতে আজকাল গীতা পাঠের ও চাণক্য শ্লোক আবৃত্তির ব্যবস্থা হইতেছে। এমন কি গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে স্থাপিত "উচ্চতর শিক্ষাসমাজ" আপনার নাম গোপন

করিয়াও মাঝে মাঝে নৈতিক লেকচারের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, শুনিয়াছি। আশা করা যায়, গবর্ণমেণ্ট আগামী দশম বার্ষিক সেন্সাস লইবার সময় এই সকল উপায়ে নীতিশিক্ষাপ্রাপ্ত বালকগণের সংখ্যা লইবার একটি ঘর রাখিয়া দিবেন, ও বর্ষে বর্ষে এই সকল উপায়ে বাঙালী যুবকের নীতির কি হারে উন্নতি হইতেছে তাহার একটা করিয়া রিপোর্ট দিবেন।

আর এক সম্প্রদায় আরও একটু মূলে হাত দেন। তাঁহারা বলেন, পরিশ্রমের অভাবে কেবল মানসিক ব্যায়ামে লিপ্ত থাকিয়া বাঙালী সন্তানের মাথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এ কথাটা ঠিক্। রুগ্নদেহে সুস্থ চিত্তের অবস্থিতি বিজ্ঞান বিরুদ্ধ; এবং যথোচিত দৈহিক ব্যায়াম শারীরিক বলের পুষ্টিলাভের সঙ্গে মানসিক বলও যে বৃদ্ধি পায় কোন্ ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করিবে? এই জন্য কিছু দিন পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব হইয়াছিল, যাহারা বৎসরের মধ্যে এতদিন কুস্তিশালায় উপস্থিত না থাকিবে, তাহাদিগকে যেন পরীক্ষা দিতে না দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে মানসিক ব্যায়ামের মাত্রাটা কিছু কমাইবার এবং দরিদ্র অন্নহীন বালকের শারীরিক ব্যায়ামে অত্যন্ত আবশ্যক শরীর পোষণের উপাদান সংগ্রহের কোন প্রস্তাব হইয়াছিল কিনা, ঠিক্ জানি না। এইরূপে নানারূপ কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে ও হইতেছে। কেহ বলেন, পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা বেশী; কেহ বলেন, পাঠ্য পুস্তকের পাতা বেশী; কেহ বলেন, ছেলেরা না বুঝিয়া কেবল মুখস্থ করে; কেহ বলেন, পুস্তক মুখস্থ না করিয়া তাহার "কী" অর্থাৎ অর্থ পুস্তক মুখস্থ করে; কেহ বলেন, সেই 'কী' আবার ভুলে পূর্ণ। সম্প্রতি একখানি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক কাগজ কয়েক মাস ধরিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন যে, বাঙালী লিখিতে গেলেই ইংরাজি ভুলে, সেই জন্য এত দুরবস্থা। কেহ বা একবারে নির্ঘাত বলিয়া ফেলেন, ইংরাজি শিক্ষাটাই কিছুই নয়; স্কুলগুলি তুলিয়া দিয়া টোল বসাও।

আমরা নিরীহ ভাবে এই সকল কথারই সারবত্তা মানিয়া লইতেছি; কিন্তু প্রত্যেকটাতেই আমাদের সেই প্রাচীন "কিন্তু" রহিয়াছে। ইংরাজি শিক্ষা উঠাইয়া দিলে যে চলিতে পারে না,

তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তাহা ঘটিবে কি? ভুল না লিখিয়া শুদ্ধ ইংরাজি লিখিলে ভাল হয়, কিন্তু কোন্ অছিলা অনুসারে ভ্রান্ত লেখকের শাস্তি বিধান করিব? শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক, কিন্তু ফ্যামিন ফণ্ডের তহবিলেও আর এত মৌজুদ নাই, যে তাহার সাহায্যে ফুটবল ক্রীড়ার্থীর আহারের ব্যবস্থা করা যাইবে। ধর্ম্ম-শিক্ষা ত ভাল, কিন্তু ইণ্ডিয়ান মিরারের সার্টিফিকেট সত্বেও সকলে গীতার অর্জ্জুনকৃত ভগবৎ গোত্রকেও অসাম্প্রদায়িক বলিয়া স্বীকার করিবে না। বিজ্ঞান শিক্ষা ত অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু যে শেক্সপীয়র বা বার্ক মুখস্থ করিয়াছে তাহার মুখে দুইটা মিষ্ট বাক্যের আশা করা যায়, কিন্তু যে কেবল ডেশানেলের বিজ্ঞান গ্রন্থ মুখস্থ করিয়াছে তাহার নিকট সে আশাও নাই।

সকলেই সকল কথা বলেন, কিন্তু একটা সোজা কথা কেহই বলেন না, অথবা মুখে বলিলেও সেই বাক্যের ন্যায় সঙ্গত তাৎপর্য্য বুঝিয়া দেখেন না। সেই সোজা কথাটা এই যে, শিক্ষা কোথায় যে বাঙ্গালী সন্তান শিক্ষালাভ করিবে? উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেন না; কেবল পরীক্ষা করেন; এবং সেই পরীক্ষার পদ্ধতি আবার এমন যে, যে শিখিতে ব্যস্ত, তার পরীক্ষায় উদ্ধারের আশা নাই; যে মুখস্থ করে সেই তরিয়া যায়। শিক্ষার ভার স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের হাতে; কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাদানে প্রকৃত বিদ্যালয়ের জীবনের স্থায়িত্ব সম্ভাবনা কতটুকু, তাহা যিনি জানেন তিনিই বুঝিবেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দেয় না, বিদ্যালয় পরীক্ষার জন্য ছাত্র তৈয়ার করে মাত্র।

সেই পদ্ধতিই বা আবার কেমন? ইংরাজেরা আজকাল সকল কাজ কলে চালান। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত নানা যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। জল তোলা, গাড়ী টানা, আলো জ্বালা সমস্তই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। ইংরাজের সাম্রাজ্যে শাসনকার্য্য যন্ত্রে চলে। এ দেশে ইংরাজ প্রবর্ত্তিত শিক্ষাকার্য্যও যন্ত্রে সম্পাদিত হয়। ছাত্রের পিতা বা অভিভাবক যথা সময়ে বালককে কলে ফেলিয়া আসেন; এবং কিছু দিন পরে কল হইতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার ললাটপটে 'শিক্ষিত' শব্দ যদি অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে পরিশ্রম ও ব্যয় বিধান সার্থক

হইয়াছে ; বালকের মন শরীরের অভ্যন্তরে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না দেখিয়া লওয়া অনাবশ্যক।

মধ্যে শুনিয়াছিলাম, এডিসন সাহেব সন্দেশ তৈয়ার করিবার কল বাহির করিয়াছেন,—কলের এক প্রান্তে একটা গরু ও কয়েক-গাছি ইক্ষু দণ্ড পুরিয়া দিলে অন্য প্রান্ত হইতে সন্দেশ বাহির হইয়া আসে।

গরু ও ইক্ষুদণ্ডকে আহারোপযোগী সন্দেশে পরিণত করিবার জন্য যে সকল প্রতিভা আবশ্যক, তাহা যন্ত্রটি নীরবে ধারাবাহিক-রূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রে লব্ধপ্রবেশ বালক যখন শিক্ষিতের ছাপ লইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন যন্ত্র-সম্পাদিত বিকৃতিটা সন্দেশের মত মধুর হয় কি না তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

জীব শরীরকেও আজকালি যন্ত্রের সহিত উপমিত করিবার প্রথা দাঁড়াইতেছে। জীব-দেহ অনেক বিষয়ে যন্ত্রের মত হইলেও উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। শরীর-যন্ত্রের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে পরস্পর যতটা সম্বন্ধ আছে, নিজ্জীব যন্ত্রের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে পরস্পর তেমন সম্বন্ধ নাই। ঘটিকা চক্রের একখানা চাকা ভাঙ্গিয়া গেলে যন্ত্র কিছু কালের জন্য বন্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অন্যান্য চাকা ও অন্যান্য অঙ্গ নষ্ট হয় না ; সেই ভাঙ্গা চাকাখানি মেরামত করিয়ে দিলে ঘটিকা যন্ত্র আবার পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকে। কিন্তু জীব-দেহের একটা অঙ্গ বিকৃত বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলে অনায়াসেই অন্যান্য অঙ্গও অল্প বা অধিক মাত্রায় বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে, রক্তের দোষে মাথা খারাপ হয়, মাথার দোষে হাত পা নষ্ট হয় ইত্যাদি। এবং একটা অঙ্গ একবার নষ্ট হইয়া গেলে তাহার মেরা-মতও সহজে চলে না।

নিজ্জীব যন্ত্রের এক স্থানে বিকৃতি ঘটিলে বিকৃতিটা সেই-খানেই আবদ্ধ থাকে ; আর সজীব যন্ত্রের একটা স্থানে ব্যাধি ঘটিলে সেই ব্যাধি ক্রমে প্রসার লাভ করিয়া সমগ্র যন্ত্রকেই আক্রমণ করে। এক কথায় ইংরাজিতে যাহাকে সিম্পাথি বলে, জীব-দেহের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে তাহা বর্ত্তমান ; যন্ত্র-দেহের বিবিধ অবয়ব মধ্যে তাহা বর্ত্তমান নাই।

আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালীর সহিত আমাদের শিক্ষা প্রণালীর তুলনা করিতে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়। উভয়ই যন্ত্র সাহায্যে সম্পাদিত হয়। ইংরাজের রাজ্য শাসন কলে চলে, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানও কলে চলে। শাসন-যন্ত্র ও শিক্ষা-যন্ত্র উভয়েরই বিবিধ অঙ্গ ও বিবিধ অবয়ব বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সেই সকল অবয়বের মধ্যে পরস্পর যেন একটা সম্বন্ধ বা সহানুভূতি বা সিম্পাথি নাই। প্রথমে শাসন-যন্ত্রের কথা ভাবিয়া দেখ। সত্য বটে, একজন বর্ষীয়সী গরিষ্ঠচরিতা মহারাজ্ঞী ভারত-সম্রাজ্যের কেন্দ্র স্থলে বর্ত্তমান আছেন, এবং চক্রের নেমি যেমন কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে ভারত-সাম্রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জের নিয়তি সেই রূপেই সেই কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে বিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু সেই কেন্দ্রও সেই নেমির মধ্যে ব্যবধান এতই অধিক, যে একের সংবাদ অন্যের নিকট পৌঁছিতে পারে কি না সন্দেহ। জীব-দেহে হৃৎপিণ্ড হইতে যে শোণিত ধারা বাহির হয় তাহা শত সহস্র বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ধমনী ও দৈহিক নালীর যোগে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া অস্থি-মজ্জা ও স্নায়ু-পেশী প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক দূরস্থিত কোষের নিকট স্নেহ সামগ্রী ও পুষ্টির উপাদান লইয়া যায়; ও বিশুদ্ধ রক্ত-ধারা বাহিত উপাদানে পুষ্ট ও স্নিগ্ধ ও নবাকৃত হইয়া প্রত্যেক কোষ আপন জীবনযাত্রা নূতন বলে আরম্ভ করে। হৃৎপিণ্ড এইরূপে প্রত্যেক কোষের যথা সময়ে সংবাদ লয়, ও প্রত্যেক কোষ তাহার প্রতিবেশীরও দূরস্থিত কুটুম্বগণের সংবাদ রাখে, ও কেন্দ্রস্থিত হৃৎপিণ্ডের নিকট আবেদন পাঠাইয়া দেয়। আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনচক্রে এইরূপ সজীবতার কোন চিহ্ন নাই। যাঁহাদের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা নির্দ্ধারিত নিয়মের অনুসারে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া যান; ঘটিকাচক্রের চাকা হয়ত সব সময়ে যথানিয়মে কর্ত্তব্য পালন করে না, কিন্তু শাসন-যন্ত্রের প্রত্যেক চক্র বিনা তৈল প্রয়োগে নীরবে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া চলে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অথবা জড়-প্রকৃতি যেমন নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃত নিয়মের অনুসারে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহার দয়াও নাই আবার ক্রোধও নাই, প্রেমও নাই, তেমনি বিরাগও নাই, সেইরূপ প্রেমশূন্য

ঈর্ষ্যাশূন্য ; ঘৃণাশূন্য, অনুরাগ বিরাগ উভয় ভাব বিবর্জ্জিত শাসন-যন্ত্র অহর্নিশ আপন কাজ করিয়া যাইতেছে, কাহারও মুখের পানে চাহিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালনে বিরত থাকে না। শাসন-যন্ত্রের যে কয়েকটি বিশেষণ ব্যবহার করিলাম তাহার সকলগুলি ঠিক হইয়াছে কি না সে বিষয়ে কাহারও কাহারও সংশয় জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা-যন্ত্রের প্রতি যদি ঐ সকল বিশেষণ প্রয়োগ করি, তাহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি ঘটিবে না। বীজ-গণিত শাস্ত্রে অজ্ঞাত রাশি একটা সাংকেতিক বর্ণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়—যেমন ক। ক বলিলে বুঝিতে হইবে উহার প্রকৃত পরিমাণ কি তাহা এখনও জানি না। ভারতবাসী প্রজাপুঞ্জের অধিকাংশের নিকট তাহাদের অধীশ্বরী মহারাজ্ঞী সেইরূপ অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অনির্দ্দেশ্য অপ্রতর্ক্য, অপ্রকল্প্য ক না হইলেও, আমাদের শিক্ষা-যন্ত্রের নোমপ্রদেশে ঘূর্ণমান বালকবৃন্দের জীবনকেন্দ্র উপাসিতা বাগ্দেবী সরস্বতী নিতান্তই ক। পৌরাণিকের নিকট বাগ্দেবী নীরস, বীণাপুস্তক রঞ্জিত হস্তাম্বরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েরও শিক্ষা-বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্পন্দহীন, বর্ণহীন, নীরস নীরব ক'য়ে পর্য্যবসিতা হইয়াছেন। তাঁহার চিন্তা নাই, বেদনা নাই, অনুভূতি নাই, তিনি কেবল শিক্ষা-যন্ত্রের কোন অনির্দ্দেশ্য স্থানে অবস্থিত থাকিয়া শুষ্ক কঠোর ব্যবস্থা নির্দ্দেশে ও নিয়ম নির্দ্দেশে ও দণ্ডচালনায় শিক্ষার্থীর ভ্রমণ পথ নিয়ন্ত্রিত করেন। বাগ্দেবী ত দূরে আছেন, যে শিক্ষক ও অধ্যাপক সম্প্রদায় মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া উপাসিতার সহিত উপাসকের সম্বন্ধ স্থাপনে নিয়োজিত তাঁহারাও রাগানুরাগশূন্য যন্ত্রাঙ্গ মাত্রে পরিণত হইয়াছেন। আচার্য্য ও শিষ্যের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ ও অনুরাগের সম্বন্ধ না থাকিলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য কেবল পণ্য বিনিময়ের ফলে আর যাহাই হউক না কেন, তাহাতে মনুষ্যত্বের পুষ্টিলাভের কোন আশা থাকে না। একালের বেতনভোগী রাজপুরুষ যেমন আপন নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনের পর আপনাকে ঋণমুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহার পরিশ্রমের আশানুরূপ ফল লাভ ঘটিল কি না তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে তাঁহার অবসরও নাই, প্রবৃত্তিও নাই, একালের অধ্যাপকও সেইরূপ তাঁহার বৃত্তির

বিনিময়ে নির্দ্ধারিত কর্ম্ম সম্পাদিত করিয়া আপনার সকল কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইল ধ্রুব জানেন, তাঁহার শিষ্যের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিবার প্রয়োজন ঘটে না।

কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজ কাল বিজ্ঞানশিক্ষা, সাহিত্য-শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, ইতিহাসশিক্ষা, হাতে-কলমেশিক্ষা বা টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা ইত্যাদি নানা উপাধিতে অলঙ্কৃতা হইয়া সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; এবং কোন্ শিক্ষা ভাল আর কোন্ শিক্ষা মন্দ এই তর্কের কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে একবারেই অক্ষম। শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটা মাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি; সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি স্ফূর্ত্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকাশ পায়, হীন মনুষ্য স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া উঠে, তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি, এবং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিন্ন যে পাঁচটা পথ আছে তাহাও আমাদের কল্পনায় আসে না। সত্য বটে, মনুষ্য বয়স্ক হইলে তাহাকে একটা ব্যবসায় বিশেষ অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়,—এবং সেই ব্যবসায় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কিছুদিন একটা সংকীর্ণ রাস্তায় শিকল পায়ে দিয়া বিচরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু সে বয়সের কথা, বাল্যের কথা নহে।

যাহার মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, যাহার গায়ে বল জন্মিয়াছে, যে অন্যের হাত না ধরিয়া অথবা যষ্টির সাহায্য না লইয়া নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, যাহার চোখের উপর একটা রঙিন পরকলার আচ্ছাদন নাই, এবং সেই চোখ উন্মীলন করিয়া যে দিগন্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাকে এই ব্যবসা শিক্ষার জন্য প্রয়াসের দরকার হইবে না। সে আপন ব্যবসায় আপনি বাছিয়া লইবে, আপন রাস্তা আপনি দেখিয়া লইবে, এবং আবশ্যক হইলে সেই নির্ব্বাচিত পথে বাহির হইয়া কুঠার হস্তে তাহার প্রতিরোধক বিঘ্ন অপসারিত করিয়া যাহা দুর্গম ছিল তাহা সুগম করিয়া লইবে। তাহার জন্য তুমি চিন্তা

করিও না। কিন্তু সেই বল সঞ্চয়ের পূর্ব্বে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—যাহাতে তাহার আপনার উপর নির্ভর করিবার শক্তি জন্মে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রকৃত কথা এই যে, বাল্যকালের উপযোগী যে শিক্ষা, সে শিক্ষার কেবল একটা অর্থ, এবং তাহার কেবল একটা উপায়। সত্য বটে যে, ব্যক্তিভেদে সেই উপায় প্রয়োগের বিধিও অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন আবশ্যক ; কিন্তু সাধারণ নিয়ম একটা। কেবল বিজ্ঞান, কেবল ইতিহাস বা কেবল সাহিত্য শিক্ষা দিলে চলিবে না। যে-রূপেই হউক, বালকের মনুষ্যত্ব যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পৃথিবীর এবং চাঁদের সূর্য্যের, অম্লজানের ও যবক্ষারজানের কতকগুলি সংবাদ আনিয়া মাথায় পুরিয়া দিলে তাহাকে শিক্ষা বলিব না। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন নহে, বালক যাহাতে স্বয়ং আপন চেষ্টায় সমর্থ হয়, তাঁহার বিধানের নামই শিক্ষা।

এইরূপ শিক্ষাকে ধর্ম্মবর্জ্জিত বা নীতিবর্জ্জিত শিক্ষা বলিলে চলিবে না ; ঠিক্ যে উপায়ে তাহার মন শরীরে বলের সঞ্চার করিতে হইবে, ঠিক্ সেই উপায়েই এক সঙ্গে ধর্ম্মের ও নীতির বিকাশেরও চেষ্টা করিতে হইবে। বিজ্ঞানশিক্ষার অথবা ধর্ম্মশিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই,—আমাদের ইচ্ছা শিক্ষা যেন বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্ম্মসঙ্গত হয়। বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্ম্মসঙ্গত দুইটা বিশেষণ পৃথক্ করিয়া ব্যবহার করিলাম তাহাতে কেহ যেন না বুঝেন, যে বিজ্ঞানসঙ্গত শিক্ষা একরূপ, ও ধর্ম্মসঙ্গত শিক্ষা অন্যরূপ, দুইটা দুইকালের শিক্ষা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যাহা বিজ্ঞান সম্মত তাহাই ধর্ম্মসম্মত যাহা বিজ্ঞান সম্মত নহে তাহা ধর্ম্মসম্মতও হইতে পারে না।

এইরূপ শিক্ষা কি উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে ? বর্ত্তমান প্রবন্ধে সকল কথার আলোচনা অসম্ভব। প্রচলিত পদ্ধতির সমালোচনা ও দোষ প্রদর্শনার্থই বোধ হয় চারিটা প্রস্তাব লেখা যাইতে পারে, ও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি একটা গড়িয়া তুলিতে হইলে আরও দুটো প্রস্তাবে কুলায় না, তবে একটা মনের কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

প্রথমেই আমরা শিক্ষকমহোদয়ের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করিব, মানব সন্তান যতই দুর্ব্বল হউক তাহাকে যেন একটা গতিহীন যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা না হয়। প্রকৃতপক্ষে সে একটা জীব। অন্ততঃ একটা উদ্ভিদের পালন ও বর্দ্ধনের জন্য সচরাচর যে বিধি প্রচলিত আছে, মনুষ্য শিশুর পালনে ও বর্দ্ধনে যদি সেইরূপ বিধানও অবলম্বিত হয় তাহা হইলেও আমাদের তত ক্ষোভ থাকে না।

এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, একটা সামান্য তৃণজাতীয় উদ্ভিদেরও বৃদ্ধির জন্য খানিকটা হাওয়া ও খানিকটা জল ও খানিকটা রৌদ্রের নিতান্ত আবশ্যক। যদি কেহ আঁধার গর্ত্তের ভিতর অথবা শুষ্ক বালুকার উপর বাগান তুলিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আমরা ভক্তির সহিত বন্দনা করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহ পারে নাই। গাছের অঙ্কুর যখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বাহির হয়, তখন যদি তাহার চারিদিকে একটা লোহার জাল পাতিয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে মাথা তুলিতে না দেওয়া যায়,—তবে তাহার উদ্ভিদ-লীলা অচিরেই সমাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। প্রশস্ত স্থানে রসপরিষিক্ত মৃত্তিকার মধ্যে খোলা বাতাসে উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাহাকে স্বাধীনভাবে বাড়িতে দাও, ও তাহাতে আপনার আহার আপনিই সংগ্রহ করিয়া আপনার অঙ্গ পোষণ করিতে দাও, ও যতদিন বাল্যকালানুগত দৌর্ব্বল্য বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন প্রবল শত্রুর ও প্রবল আপদের আক্রমণ হইতে যত্নের সহিত ও স্নেহের সহিত রক্ষা কর, দেখিতে পাইবে, কিছুদিন পরেই সে আপনি পূর্ণ ও সমর্থ হইয়া শাখার পল্লবে হরিদ্বর্ণ হইয়া উঠিবে, ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে; তখন আর সে তোমার সাহায্যের প্রার্থী থাকিবে না, তখন সে আত্মরক্ষার জন্য তোমার মুখাপেক্ষী হইবে না, তখন সে উন্মত্ত প্রভঞ্জনের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও স্থানচ্যুত হইবে না; স্বয়ং দূরপ্রসারী মূল বিস্তার করিয়া বসুন্ধরাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবে, ও উর্দ্ধে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আতপতপ্ত পথিককে ছায়াদানে তৃপ্ত করিবে।

সংযম নিয়ম ও শাসনের কোন আবশ্যকতা নাই এ কথা আমি

বলিতে চাহি না। যদি প্রস্তাবের ভাষার ভঙ্গীতে সেইরূপ কেহ বুঝিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট সানুনয় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার এইমাত্র বলা উদ্দেশ্য যে শাসন ও সংযম সম্পূর্ণ আবশ্যক হইলেও স্বাধীনবৃত্তির একেবারে সংহার সাধনটা ঠিক নহে। শিক্ষার্থীর অন্তঃকরণে যে সকল শক্তির অঙ্কুর হইতেছে, সেই সকল শক্তিকে একবারে আবদ্ধ ও সংযত না করিয়া স্বাধীনভাবে খেলিতে দাও, এবং যতক্ষণ সে স্বাধীনভাবে খেলা করিতে থাকিবে ততক্ষণ একটু দূরে ও অন্তরালে দণ্ডায়মান থাক। যদি তাহাকে পথভ্রান্ত হইয়া ধ্বংসের পথে চলিতে দেখ তখনই সময় নষ্ট না করিয়া সাবধান করিয়া দাও; মুখের কথায় ফল না হইলে তীব্রতর শাসনের ব্যবস্থা কর। কিন্তু যখন বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইবে, তখনও যেন তোমার মূর্তি দেখিয়া গুরুমহাশয় বলিয়া ভ্রম জন্মিতে না পারে। এ কথাটা মনে রাখিবে যে, জননীর পীযূষ-পূর্ণ স্তন্য ধারাতেই তোমার জড়দেহ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, কারা-গৃহের নিয়মের মধ্যে তোমাকে বাস করিতে দিলে তোমার গুরুত্ব প্রাপ্তির অবকাশ ঘটিত না।

বাস্তবিকই নবাগত মানবশিশুর চোখের সম্মুখের এত বড় সৌন্দর্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বসুন্ধরাটা বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহাতে দেখিবার বিষয় কত আছে। শিশুর সহিত যখন তাহার ভবিষ্যতের বাসভূমির প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন সকলই তাহার নিকট নূতন ও নূতনত্বের রহস্যে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। কত আগ্রহের সহিত কত ঔৎসুক্যের সহিত সে সেই নূতন পরিচিতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য চেষ্টা পায় এবং সম্বন্ধ স্থাপনে যে একটু সফলতা লাভ করে তাহাতে তাহার কত আনন্দ উপস্থিত হয়। এমন সময়ে তুমি যদি তাহার ও জগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই সম্বন্ধ স্থাপনে বাধা দিতে চাও, ও তাহার সেই আনন্দের প্রতিরোধী হও, তাহা হইলে তুমি নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড; তুমি যদি সেইরূপ কার্যের দ্বারা তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি ঘোর মূর্খ।

তোমার এস্থলে কর্তব্য কি? কর্তব্য যথেষ্ট আছে। তুমি যদি বেত্রহস্তে তাহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হও ও মুক্ত জগতের

সহিত তাহার সাক্ষাৎ করা নিষেধ করিয়া তোমার কাল্পনিক জগতের একটা মিথ্যা ছবি কেবল তোমার বাক্যের উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়া বাক্যালংকারে সংযত করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে বুঝিব তোমার কর্ত্তব্যবোধ হয় নাই। তুমি তাহাকে স্বাধীনভাবে জগতের মধ্যে বিচরণ করিতে দাও; নিত্য নূতন সামগ্রী আহরণ করিয়া তাহার ইন্দ্রিয় পঞ্চকের সম্মুখে স্থাপিত কর, তুমি তাহার হইয়া দেখিও না বা দেখাইয়া দিও না, সে স্বয়ং চেষ্টা করিয়া দেখিতে থাকুক। তাহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, প্রত্যেক স্নায়ু, প্রত্যেক পেশী জাগতিক বিবিধ পদার্থের স্পর্শে আসিয়া পরিচালিত হউক ও বৃদ্ধিলাভ করুক ও পুষ্টিলাভ করুক। তুমি গুরু মহাশয়ের ও উপদেষ্টার কঠোর মূর্ত্তি সংবরণ করিয়া সহচরের মত ও বন্ধুর মত তাহার পাছে পাছে চলিতে থাক। তাহার চিত্ত যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে না পারে; খাদ্য সামগ্রীর অভাবে যেন তাহার পাকস্থলীর নিষ্কর্ম্মা হইবার অবসর না ঘটে অথচ দুষ্পাচ্য ও গুরুভার পদার্থের ভারে যেন পাকস্থলী অবসন্ন হইয়া না পড়ে। সে স্বয়ং দেখিবে, স্বয়ং শুনিবে, স্বয়ং স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিবে; এবং পরীক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বিবিধ পদার্থের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে থাকিবে। বহুত্বের মধ্যে একত্ব দেখিবে; সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখিবে, পাঁচবার বা প্রতারিত হইবে এবং প্রতারিত হইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইবে, পুনঃ পুনঃ তাহাকে প্রতারিত হইতে দিবে; যে কখন সংসারের মধ্যে প্রতারিত হয় নাই তাহার ভাগ্যের আমি প্রশংসা করি না। সে পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হউক তাহাকে প্রতারিত হইতে দেখিয়া তুমি দয়া করিবে না; কেবল আশার বাক্যে, উৎসাহের বাক্যে ও স্নেহের বাক্যে তাহার মনে আগ্রহের ও প্রীতির ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার কর। সে পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হউক ও অবশেষে সফলতা লাভ করিয়া পরমানন্দে ভাসিতে থাকুক; তুমি তাহার আনন্দে আনন্দ দেখাও, তাহার উৎসাহে উৎসাহিত হও, তাহার মনে উৎসাহের শক্তি আরও উদ্দীপিত করিয়া দাও। ইহারই নাম বিজ্ঞানশিক্ষা, ইহারই নাম সাহিত্যশিক্ষা, ইহারই নাম ধর্ম্মশিক্ষা। শারীরিক ও মানসিক ও

নৈতিক ত্রিবিধ শিক্ষাই একই প্রণালীতে সম্পাদিত হইবে। যাহাতে শরীরে বল আসিবে, তাহাতেই চিত্তে স্ফূর্ত্তি জন্মিবে, তাহাতেই বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ লাভ করিবে, তাহাতেই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। ইহারই নাম আবার হাতে-কলমে শিক্ষা; যে ঠেকিয়া না শেখে তাহার হাতে-কলমে শিক্ষা হয় না।

আমার বিবেচনায় এই মূল সূত্রটি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্যকালে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, দেশ-কাল-পাত্রভেদে কিরূপ বিশেষ বিধান ও বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক হইবে তাহা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে, এস্থলে সে সকল বিশেষ বিধির অবতারণায় প্রবৃত্ত হইব না।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে বিশেষ কোন নূতন তত্ত্বের উল্লেখ হইল তাহা নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, শিক্ষা কাহাকে বলে, তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় সকলেই প্রায় এক রকম কথাই বলিয়া থাকেন, তবে প্রয়োগের সময় আর মূল সূত্রের অনুসারে কার্য্য হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহারা বক্তৃতার সময় শিক্ষা সম্বন্ধে নানা যুক্তিপূর্ণ বাক্যমালা সাজাইয়া বলেন, তাঁহারাই আবার প্রয়োগের সময় ঠিক বিরোধী নীতি অবলম্বন করেন।

আজকাল আমাদের শিক্ষা-বিভাগেব বালকদের ডিসিপ্লিনের একটা ধূয়া উঠিয়াছে। বাজারের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বস্তুতঃই ডিসিপ্লিনের ব্যবস্থা একটু সূচারু না থাকিলে জীবনযাত্রা অচল হয়। কিন্তু তথাপি ডিসিপ্লিন কথাটা শুনিলেই মনে কেমন একটা ব্যথা লাগে। সেনা নিবাসে, পুলিশের থানায় ও কারাগারে ডিসিপ্লিনের কঠিন বন্দোবস্তের দরকার বুঝিতে পারি; কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়গুলিও কি কাল মাহাত্ম্যে ঐ সকল স্থানের সহিত ক্রমে পর্য্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছে? কর্ত্তৃপক্ষেরা এ ঘটনা যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। অন্যান্য দেশে ব্যবস্থা কিরূপ জানি না, কিন্তু আমাদের সে কালে চতুষ্পাঠীতে শান্তি-রক্ষার জন্য ও নীতি রক্ষার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রয়োগের কোন দরকার ছিল, বোধ হয় না। মনু-সংহিতাতেও ব্রহ্মচারীর কঠোর সংযম অভ্যাসের বিধি আছে; কিন্তু বিধির অপালনে দণ্ডবিধানের পারুষ্য দেখি না। অথবা

মনুসংহিতার মহিমান্বিত ব্রহ্মচর্যের কথা এস্থলে উথাপন করিয়াই আমি কেন অকারণে পাতকগ্রস্ত হইতে বসিয়াছি?

শিক্ষার প্রণালী যেমনই হউক না কেন, আনন্দ ও আগ্রহ ও উৎসাহ যদি তাহার আনুষঙ্গিক না হয় তবে তাহাকে যে শিক্ষা নাম দিতে চাহে সে মূর্খ, সে পাষণ্ড, সে নাস্তিক। অভিধানে বাছিয়া আমি তাহার উপযুক্ত বিশেষণ সংগ্রহে অসমর্থ। আজকাল হিপ্নটিজম্ বিদ্যার সমালোচনায় যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে এই কথারই সমর্থন করে। মনুষ্যের চিত্তের মত নমনীয় কোমল পদার্থ বুঝি আর কিছুই নাই। যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শিক্ষার কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কেবল বেত্রাঘাত ও শাসন ও ভয় প্রদর্শন ও নৈরাশ্য সঞ্চারের ব্যবস্থা করিয়া মানসিক উৎকর্ষ জন্মাইবার আশা কেবল বাতুলের স্বপ্ন মাত্র। পক্ষান্তরে স্নেহের বাণী ও আশার বাণী দুর্ব্বল হস্তেও বল প্রদানে সমর্থ হইতে পারে। স্পন্দহীন হৃৎপিণ্ডকে উত্তেজিত করিতে পারে, স্নায়ুর মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া নির্জীব দেহেও জীবনের সঞ্চার করিতে পারে। এ সকল স্থূল কথা ও সহজ কথা; অথচ কেহ বুঝিবে না, হা হতোহস্মি। হা দগ্ধোহস্মি!

ব্যক্তিগত শিক্ষার সম্বন্ধে যে কথা বলা গেল, জাতীয় শিক্ষার সম্বন্ধেও সেই কথা আরও জোরের সহিত বলা যাইতে পারে। এবং আরম্ভ করিলে কথাও বোধ হয় ফুরাইবে না।

লোকশিক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্যই নাই। কিন্তু বাঙালীর দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্দ্বারা প্রস্তর পর্য্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহমাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য্য হয়। বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে।

ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা! আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাঁদ স্কোয়ার পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজী-নবীশ সে বিষয়ে কোন কথা করিয়াছেন।

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রুসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা এদেশীয় লোক

সহজে অনুভব করিতে পারেন না।

এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সম্বাদপত্র ; কোনখানির গ্রাহক দুই শত, কোনখানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপত্র শত শত, সহস্র সহস্র। এক একখানির গ্রাহক সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক। তারপর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা। যাহার কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবেশী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার শত শত সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয় ; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই স্বাদু খাদ্য চর্বণ করিতে করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশের যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দ্দশার কথা ত পূর্বেই বলিয়াছি ; বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক্ দিয়াও যায় না, তাহার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে ; আর বক্তৃতাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়।

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন ? মনে করিয়া দেখ বৌদ্ধধর্মের কূট তর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম চরণকে আর্দ্র করে ; মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কূটতত্ত্বময়, নির্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্বোধ্য ধর্ম ; শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে—গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না ? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দিগ্বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারত-

বর্ষকে শৈবধর্ম শিখাইলেন—লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলেব দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সে দিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিঁড়ীর উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস নুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মেব ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদালঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজণ করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য যে অহিংসা পরম ধর্ম, যে লোকহিত পরমকার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। গুলকি কাওরাণী শূয়োর চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হইবে? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রাণ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজি শিক্ষা সত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টি-পাত করে না। মরুক্ রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল্‌কারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব, এ দেশে সার অস্‌লি ইডেন্, ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্ তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি ঊনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাটি লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।

মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শৈশবে ও বাল্যকালে আমরা পিতামাতা ও অন্য আত্মীয়জন এবং প্রতিবেশীদের মুখের কথা শুনিয়া যে জ্ঞানলাভ করি, তাহা মাতৃভাষার সাহায্যেই করি। সুতরাং শৈশবে ও বাল্যে পুস্তকাদি হইতে যে জ্ঞানলাভ করি, তাহাও মাতৃভাষার সাহায্যে করাই যে স্বাভাবিক এবং তাহাই যে প্রকৃষ্টতম উপায়, সে বিষয় প্রমাণ ও যুক্তির প্রয়োগ অনাবশ্যক। কৈশোর ও যৌবনে জ্ঞানলাভও যে মাতৃভাষার সাহায্যেই ভাল হয়, তাহাই কেবল আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ বলিয়া এবং সেই কারণে আমাদিগকে অল্প বয়স হইতেই ইংরেজী শিখান হয় বলিয়া এরূপ আলোচনা এদেশে আবশ্যক বোধ হয়। মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, না বিদেশী কোন ভাষা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, এরূপ আলোচনা স্বাধীন ও সভ্য কোন দেশে হয় বলিয়া অবগত নহি।

ইংরেজী শিক্ষা করা যে আমাদের পক্ষে উচিত ও আবশ্যক, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য। মানুষের জ্ঞান বিদ্যার সকল বিভাগেই বাড়িয়া চলিতেছে। নূতন জ্ঞানের সহিত পরিচয়ের জন্য কোন-না কোন শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য ভাষা জানা দরকার; কারণ, ভারতবর্ষের কোনও ভাষায় কোন বিদ্যার উচ্চতম ও নবীনতম জ্ঞানের পুস্তক, পত্রিকাদি প্রকাশিত হয় না। ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ ইত্যাদি পাশ্চাত্য ভাষায় এইরূপ পুস্তক পত্রিকাদি প্রকাশিত হয়। আমাদিগকে অন্য কারণে ইংরেজী শিখিতে হয়। তাহাতে জ্ঞান-অর্জ্জন সম্বন্ধীয় এই উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষা যদি কেহ শিখিতে পারেন ত আরও ভাল। সকল বিষয়ে উচ্চতম ও আধুনিক জ্ঞান যাহা হইতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ইংরেজীই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বেশী লোকে ব্যবহার করে। অতএব, ভারতবর্ষের লোকের ইংরেজী জানিলে তাহার সাহায্যে সভ্য জগতের যত লোকের সহিত চিন্তা ও ভাবের আদান-

প্রদান করিতে পারিবে, অন্য কোন ভাষার সাহায্যে তাহা পারিবে না। এইরূপ আদানপ্রদান একান্ত আবশ্যক; কেন-না, তাহা ব্যতিরেকে আমাদিগকে কূপমণ্ডুক হইয়া থাকিতে হইবে। ইংরেজীর সাহায্যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা চিন্তা ও ভাবের বিনিময় করে, বাণিজ্য চালায় এবং নিখিল-ভারতীয় ধাম্মিক সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রচেষ্টা চালায়। তাহার দ্বারা ভারতীয় মহাজাতি গঠনের সাহায্যও হইয়া আসিতেছে। ইংরেজীর সাহায্যে সকল মহাদেশের সহিত ভারতীয়েরা ব্যবসাবাণিজ্যও চালাইয়া থাকে। চাকরী, ওকালতী, ডাক্তারী, অধ্যাপকতা ইত্যাদির জন্য ইহা যে আবশ্যক, তাহা সকলেই জানে।

অতএব, মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা উচিত, এরূপ বলিলে ইহা বলা হয় না যে ইংরেজী শিক্ষা করা অনাবশ্যক। বস্তুতঃ, যে সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদের প্রত্যেকটিতে ইংরেজীও শিখান হইয়া থাকে। যেমন, অধ্যাপক কার্ভে মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রতিষ্ঠিত গুরুকুলে, লালা দেবরাজের প্রতিষ্ঠিত জালন্দর কন্যা মহাবিদ্যালয়ে, ইত্যাদি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ১৯৩৭ সন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে সংকল্প করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থাতেও ইংরেজী শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে।

আমরা যে-যে কারণে ইংরেজী শিক্ষা করা আবশ্যক বলিয়াছি, তাহার সবগুলিই মনে রাখিয়া লোকে যে সন্তানদিগকে ইংরেজী শিখান, তাহা নহে; চাকরী ও উপার্জ্জনের অন্যান্য উপায় সুগম হইবে বলিয়াই প্রধানতঃ ইংরেজী শিখান। এই উদ্দেশ্যটি ছেলেদের শিক্ষায় যতটা মুখ্য, মেয়েদের শিক্ষায় ততটা মুখ্য নহে। মেয়েদেরও আর্থিক বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি, যে, ছেলেদের মধ্যে প্রায় সকলেই উপার্জ্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষা পাইবার অভিলাষী হয়; মেয়েদের সম্বন্ধে ঠিক তাহা বলা চলে না। এই জন্য মাতৃভাষাকে ছেলেদের শিক্ষার বাহন করার বিরুদ্ধে যতটা আপত্তি শোনা যায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার ব্যবহারের বিরুদ্ধে ততটা আপত্তি হইতে

পারে না। অবশ্য আমাদের মতে, ছাত্র-ছাত্রী কাহাদেরই শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। পাছে কেহ ভুল বুঝেন এইজন্য ইহাও বলিয়া রাখা ভাল, যে, আমাদের মতে ছেলে-মেয়ে উভয়েরই উচ্চ শিক্ষা হওয়া উচিত।

এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার সমুদয় সভ্য দেশে শিশু ছাড়া আর প্রায় সমুদয় পুরুষ ও নারী লিখিতে পড়িতে পারে। জাতির সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোকের লিখিতে পড়িতে জানা বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতার একটি লক্ষণ, এবং তাহা প্রগতির জন্য আবশ্যক। আমাদের দেশে আমরা যাহাকে সেকেণ্ডারী শিক্ষা (অর্থাৎ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা) বলি, অনেক সভ্য দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (এলিমেণ্টারী স্কুলস) সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে সেকেণ্ডারী শিক্ষা প্রধানতঃ ইংরেজীর সাহায্যে দেওয়া হয়। তাহার পর কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয় সকলেও ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষা ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে প্রায় দেড়শত বৎসর দেওয়া হইয়া আসিতেছে। তাহার ফলে ১৯২১ সালে ভারতবর্ষের সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে কেবল পঁচিশ লক্ষ লোক ইংরেজী লিখন-পঠনক্ষম ছিল বলিয়া গণিত হয়। দেড়শত বৎসরে পঁচিশ লক্ষ লোক ইংরেজী লিখনপঠনক্ষম হইয়া থাকিলে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পঁয়ত্রিশ কোটি পরিচিত লোককে ইংরেজীতে লিখনপঠনক্ষম করিতে দুই শত দশ শতাব্দী অর্থাৎ একুশ হাজার বৎসর লাগিবে! এখন যেরূপ ধীরে ধীরে মাতৃভাষাতে প্রাথমিক শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে সকল লোককে মাতৃভাষায় লিখনপঠনক্ষম করিতেও অতি দীর্ঘকাল লাগিবার কথা। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার মত এত বেশী সময় লাগিবে না, এত বেশী খরচও হইবে না, এবং আমাদের হাতে স্বরাজ আসিলে পাঁচ কিংবা দশ বৎসরেই দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করা যাইবে।

অনেকে বলেন, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিবার পক্ষে উপযোগী উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক নাই। কিন্তু গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য যে-সব বাংলা বই পড়ে তাহাতে তাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য ঐ সব বিষয়ের

ইংরেজী বহির চেয়ে কম শিক্ষা পায় না। ছাত্রবৃত্তির জন্য যখন নানাবিষয়ে বাংলা বহি লিখিত হইয়াছে, তখন প্রবেশিকা পর্যন্তও ত নিশ্চয়ই লিখিত হইতে পারিবে। তাহার প্রমাণ দিতেছি।

ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশেও আগে উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার হইত না, লাটিন গ্রীকে হইত। ক্রমশঃ উচ্চ শিক্ষা যেমন মাতৃভাষায় হইয়াছে অমনি উচ্চতম শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তকও লিখিত হইয়াছে, প্রয়োজনমত নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দ রচিত হইয়াছে। ইউরোপে এই প্রকারে উচ্চতম শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়ায় তথাকার নানা দেশের মাতৃভাষার সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়াছে। আমাদের দেশেও উচ্চতম শিক্ষার জন্য মাতৃভাষা ব্যবহৃত হইলে এই প্রকার উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক মাতৃ-ভাষায় রচিত হইতে পারিবে, এবং তাহার দ্বারা মাতৃভাষার সাহিত্য পুষ্ট হইবে। যত ইচ্ছা প্রয়োজন-মত পারিভাষিক শব্দ প্রধানতঃ সংস্কৃত হইতে রচিত হইতে পারিবে। আরবী-ফারসীরও সাহায্য স্থলবিশেষে লইলে সুবিধা হইবে, যেমন হায়দারাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লইতেছেন। কোন কোন স্থলে ঠিক ইংরেজী শব্দই রাখা বাঞ্ছনীয় হইবে। প্রাচীন কালে উচ্চতম জ্ঞান ভারতীয়েরা সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে নিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। সংস্কৃত প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের এখন দেশভাষায় তাহা করিতে না পারিবার কোন কারণ নাই। বাংলা মাসিক পত্রে বিজ্ঞানের অনেক কঠিন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকেরা আবশ্যক-মত পারিভাষিক শব্দ রচনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। প্রাচীনকালে হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণ দরকার হইলে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করিতেও সংকোচ বোধ করিতেন না। যেমন, জ্যোতিষে ব্যবহৃত 'হোরা' শব্দটি। উহা গ্রীক "হোরা" (Hora) হইতে গৃহীত, যাহা হইতে ইংরেজী ("Hour") শব্দের উৎপত্তি। কলিকাতার অনেক কলেজে রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপকেরা পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়নী-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা অনেক সময় বাংলায় করিতেন; কেবল কোন কোন স্থলে ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে হইলে তাহার জন্য উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়ায় মাতৃভাষার সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে। এখানে "সাহিত্য" ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে না হইলেও ভাল ভাল কবিতা, উপন্যাস, গল্প, সাধারণ প্রবন্ধ মাতৃভাষায় রচিত হইতে পারে, হইতেছেও; কিন্তু জ্ঞানগর্ভ অন্য নানাবিধ গ্রন্থ মাতৃভাষায় যথেষ্ট রচিত হইবে না, সুতরাং, মাতৃভাষার সাহিত্য অঙ্গহীন থাকিয়া যাইবে। জ্ঞানের নানা শাখার গ্রন্থ মাতৃভাষায় রচিত হইলে আর একটি সুবিধা এই হইবে যে, যাহারা কম শিক্ষিত, এমন কি হয়ত নিরক্ষর, তাহাদের মধ্যেও কিছু কিছু উচ্চ জ্ঞান মুখে মুখে পরোক্ষভাবে গিয়া পৌঁছিবে।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য ভাষার শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় যে উপকার হইয়াছে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাহার কোন কোন কুফলেরও উল্লেখ অবশ্যক।

সংস্কৃত টোলে যে পণ্ডিত মহাশয় উচ্চতম শিক্ষা পাইয়াছেন এবং যে কৃষক হয়ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর—ইহারা দুই জন ঠিক ভিন্ন ভিন্ন জগতের লোক এমন মনে হয় না। কিন্তু একজন প্রবেশিকা পাস করা ছেলে ও একজন মজুরকে অনেক সময় যেন ভিন্ন জগতের লোক মনে হইবে। এক পক্ষের জ্ঞানবত্তা ও অন্যপক্ষের অজ্ঞানতা ইহার একমাত্র কারণ নয়। কিছু ইংরেজীর জ্ঞান মানুষকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান দেয় বলিয়া এরূপ ঘটে। সকলেরই অধিকাংশ শিক্ষা প্রধানতঃ দেশভাষায় হইলে অহঙ্কারের এই কারণটা অনেকটা না থাকায় দেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধানের অন্ততঃ একটা কারণ কিছু কমিবে মনে করি। অবশ্য "উচ্চ জাতি" 'নীচ জাতি" প্রভৃতি কুসংস্কার আরও বেশী ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ব্যবধানের অন্যান্য কারণ আছে বলিয়া ভাষাগত এই একটা কারণকে মন্দীভূত করা অনাবশ্যক, এরূপ মনে করা উচিত নয়।

পুরুষজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত যে ব্যবধানের কথা বলিলাম, তাহা নারীদের মধ্যে আগে বেশী ছিল না; এখন ক্রমশঃ তাহার সৃষ্টি হইতেছে। তাহা প্রবল হইবার আগেই

যদি ছাত্রীদের শিক্ষা প্রধানতঃ মাতৃভাষায় হয়, তাহা হইলে ব্যবধানটা দূর করিবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

জাতীয় একতা ও সংহতি বৃদ্ধির জন্য এরূপ কোন ব্যবধান থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু ব্যবধান আছে বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদিগকে তাহা দূর করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছে। আজকাল সকল শ্রেণীর লোকদের পরিচ্ছদ আগেকার চেয়ে এক রকমের হওয়ায় এবং জাতীয় মহাসভা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট সভাসমিতিতে দেশভাষায় সমুদয় কাজ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পাইতেছে।

সমুদয় বিষয়ের শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে দিয়া কেবল ইংরেজী ভাষার শিক্ষা ইংরেজী পুস্তক ও কথোপকথনের সাহায্যে দিলে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজীর যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না, কেহ কেহ এইরূপ আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন ইংরেজী যেমন করিয়া শিখান হয়, তাহাতে এই আশংকাকে সম্পূর্ণ অমূলক বলিতে পারি না। কিন্তু সুপ্রণালী অনুসারে ইংরেজী শিখাইলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চয়ই ঐ ভাষা এখনকার মত কাজ চালাইবার মত শিখিতে পারিবে মনে করি, হয়ত তার চেয়ে ভাল পারিবে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, ইংরেজ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের শিক্ষা-বিভাগে, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে ও তদ্রূপ অন্য কোন কোন কাজের জন্য, এবং কোন কোন বিদ্যালয়ে কিছু বক্তৃতা দিবার জন্য যে-সব ফরাসী, জার্মান, ডচ্, চেক্, নরুজিয়ান প্রভৃতি পণ্ডিত আমদানী করেন, তাঁহারা নিজ নিজ দেশে উচ্চতম শিক্ষা নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই লাভ করেন, ইংরেজীটা কেবল একটা ভাষা-হিসাবে বিদ্যালয়ে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা করেন; অথচ তাঁহারা এদেশে তাঁহাদের কাজ ইংরেজীতে করিয়া যান। তাহার কারণ, তাঁহাদের দেশে ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষা শিখাইবার প্রণালী ভাল। আমাদের দেশে ঐরূপ সুপ্রণালী অবলম্বিত হইলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরাও অল্প সময়ে ইংরেজী শিখিতে বলিতে এবং লিখিতে পারিবে।

মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞান যত সহজে ও অল্প সময়ে অর্জ্জিত হয় এবং উহা মনের যেমন "অস্থিমজ্জাগত" হয়, বিদেশী ভাষার সাহায্যে তাহা হয় না। অল্প সময়ের মধ্যে মাতৃভাষার সাহায্যে যে

অধিক জ্ঞান লাভ হয়, তাঁহার একটি মাত্র প্রমাণ উল্লেখ করিলেই হইবে। আমরা অনেকে বাল্যকালে দশ-এগার বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য বাংলা ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা শিখিয়াছিলাম, ইংরেজী ইস্কুলের ছেলেরা এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবার জন্য পনর-ষোল বৎসর বয়সে ইংরেজী ভাষায় তাহা অপেক্ষা বেশী শিখিত না—এখনও বোধ হয় শিখে না।

এই প্রকার নানা যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়, যে, মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, এবং শিক্ষাকার্য্যে উহার ব্যবহার স্বাভাবিকও বটে।

শিক্ষার বিরোধ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এতদিন এদেশে শিক্ষার ধারা একটা নির্ব্বিঘ্ন নিরুপদ্রব পথে চলে আসছিল। সেটা ভাল কি মন্দ এ-বিষয়ে কারও কোন উদ্বেগ ছিল না। আমার বাবা যা পড়ে গেছেন, তা আমিও পড়ব। এর থেকে তিনি যখন দু'পয়সা করে গেছেন, সাহেব-সুবোর দরবারে চেয়ারে বসতে পেরেছেন, হ্যাণ্ডশেক্ করতে পেরেছেন, তখন আমিই বা কেন না পারব? মোটামুটি এই ছিল দেশের চিন্তার পদ্ধতি। হঠাৎ একটা ভীষণ ঝড় এল। কিছুদিন ধরে সমস্ত শিক্ষা-বিধানটাই বনিয়াদ-সমেত এমনি টল্‌মল্ করতে লাগল যে, একদল বললেন, পড়ে যাবে। অন্যদল সভয়ে মাথা নেড়ে বললেন, না, ভয় নেই—পড়বে না। পড়লেও না। এই নিয়ে প্রতিপক্ষকে তাঁরা কটু কথায় জর্জ্জরিত করে দিলেন। তার হেতু ছিল। মানুষের শক্তি যত কমে আসে মুখের বিষ তত উগ্র হয়ে ওঠে। বাইরে গাল তাঁরা ঢের দিলেন, কিন্তু অন্তরে ভরসা বিশেষ পেলেন না। ভয় তাঁদের মধ্যেই রয়ে গেল, দৈবাৎ বাতাসে যদি আবার কোনদিন জোর ধরে ত এই গোড়া-হেলা নড়বড়ে অতিকায়টা হুমড়ি খেয়ে পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবে না।

এমনি যখন অবস্থা তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে এলেন, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি কয়েকটি বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবল ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে বসি। কিন্তু এ তো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়,—যা তাঁরও বহুপূজ্য,—সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত। তাঁর কথা নিয়ে কয়েকটা Anglo-Indian কাগজ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে তাদের প্যাঁচালো উপদেশের আর বিরাম নেই। আর কিছু

না হোক দেশের হিতকাঙ্ক্ষায় এদের যখন বুক ফাটতে থাকে তখনি ভয় হয়, ভেতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছে। বিশেষ করে বাঙালী-পরিচালিত Anglo-Indian একখানা কাগজ। এর মুখের ত আর কামাই নেই। নিজের বুদ্ধি দিয়ে কবির কথাগুলো বিকৃত বিধ্বস্ত করে অবিশ্রাম বলছে—আমরা বলে বলে গলা ভেঙ্গে ফেলেছি,—ফল হয়নি,—এখন রবিবাবু এসে রক্ষে করে দিলেন। যথা—

"And if there were any among educated Bengalees, who were wavering and vacillating, knowing not what to do,—to exclude the West or to stick to the East—Rabindranath's recent Calcutta lectures have gone a great way towards making up their minds. They have given up their sitting-on-the-fence posture. They have jumped off on Western side."

অর্থাৎ আমরা দেশে শিক্ষিত সমাজ বেড়ার ডগায় বসেছিলাম, পশ্চিম-প্রত্যাগত কবির ইঙ্গিতে 'জয় রাম' বলে পশ্চিম দিকেই লাফিয়ে পড়লাম! বাঁচা গেল! শিক্ষিত সমাজের এতদিনে একটা কিনারা হ'লো! কিন্তু শিক্ষিতের দল যা নিয়ে এতবড় রই-রই করেন, যাঁদের অশিক্ষিত অজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করতে বিন্দুমাত্র সংকোচ অনুভব করেন না,—তাঁদের যুক্তি-তর্কে এর কি মূল্য দাঁড়ায় একবার সেটাও ওজন করা ভাল। কিন্তু মোটের উপর পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলনে আসল কথা কবি কি বলেছেন?

প্রথম কথা বলেছেন এই যে, আজকের দিনে পশ্চিম জয়ী হয়েচে, সুতরাং সেই জয়ের কৌশল অদের কাছে আমার শেখা চাই। বেশ। দ্বিতীয় কথা, লড়াইয়ের পরে পশ্চিম শোকাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কই'? অতএব তাদের সেটা বলে দেওয়া আবশ্যক। এও ভাল কথা। আমি যতদূর জানি অসহযোগপন্থীর কেউ এ-বিষয়ে কোন আপত্তি করে না। তৃতীয় দফায় কবি উপনিষদের ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'ঈশ্বরাস্যমিদং সর্ব্বম্' অতএব 'মা গৃধঃ'। চমৎকার কথা,—কারও কোন দ্বন্দ্ব নেই। এ

যে একটা তত্ত্ব নয়, সমস্ত দুনিয়ার এও কেউ লোকসমাজে অস্বীকার করে না, অথচ মানুষের এমন পোড়া স্বভাব যে, সে সরল ও সহজ সত্য কিছুতেই সোজা করে বলে মিটিয়ে নেবে না। আপন আপন স্বার্থ ও প্রয়োজনমত তার মধ্যে অসংখ্য sub clause, অগণিত qualification-এর আমদানি করে তাকে এমনি ভারাক্রান্ত করে তুলবে যে, তত্ত্বকথা আপনি হেঁয়ালী হয়ে দাঁড়াবে। তখন অসংকোচে তাকে সত্য বলে চিনে নেওয়াই কঠিন। শুধু এই জন্যই উপস্থিত fact-গুলোই সংসারে সত্যের মুখের পরে, মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তার ধারার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে, অপরিমেয় অনর্থের সূচনা করে দেয়।

কবি প্রথমেই বলেছেন,—

"এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করেছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল···অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোরে।"

আজকের দিনে এ-কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, পৃথিবীর বড় বড় ক্ষীরভাণ্ডেই সে মুখ জুবড়ে আছে,—তার পেট ভরে দুই কস বেয়ে দুধের ধারা নেমেছে—কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি।

এ একটা fact; আজকের দিনে একে কিছুতেই 'না' বলবার পথ নেই—আমরা উপবাসী রয়েছি সত্যই, কিন্তু তাই বলেই কি এই কথা মানতেই হবে যে, এ অধিকার পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই একটা সত্যের জোরে? এবং সেই সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতেই হবে? লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এ একটা fact, কিন্তু একেই যদি মানুষে চরম সত্য মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত ত আজকের দিনে নীচে জলের উপর এবং ঊর্ধ্বে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিত কালে যা fact তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাসের ১লা তারিখে যে লোকটা তার বিদ্যের জোরে আমার সারা মাসের মাইনে গাঁট কেটে নিয়ে ছেলেপুলে সমেত আমাকে অনাহারে রাখলে, কিংবা মাথায় একটা বাড়ি মেরে সমস্ত কেড়ে নিয়ে রাস্তার ওপরে চাটের দোকানে বসে

ভোজ লাগালে—এ ঘটনা সত্য হলেও কোন সত্য অধিকারে বলতে পারব না, কিংবা এ দুটো মহাবিদ্যে শেখবার জন্য তাদের শরণাপন্ন হতে হবে এও স্বীকার করতে পারব না। তা ছাড়া গাঁটকাটা কিছুতেই বলে দেবে না পয়সা কোথায় রাখলে কেটে নেওয়া যায় না, অথবা ঠেঙাড়েও শিখিয়ে দেবে না কি করে তার মাথায় উল্টে লাঠি মেরে আত্মরক্ষা করা যায়। এ যদি বা শিখতেই হয়, ত সে অন্য কোথাও—অন্ততঃ তাদের কাছে নয়। কবি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্যবিদ্যার অধিকারে। হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেই রকমই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্যবিদ্যা, অতএব শেখা চাই-ই, এ-কথা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না। গ্রীস একদিন পৃথিবীর রত্ন-ভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল, রোমও তাই করেছিল। আফগানেরাও বড় কম করেনি, কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকেনি। দুর্য্যোধন একদিন শকুনির বিদ্যার জোরে জয়ী হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে দীর্ঘকাল ধরে বনে-জঙ্গলে উপবাস করতে বাধ্য করেছিল, সেদিন দুর্য্যোধনের পাত্র ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার ভোগের অন্নে কোথাও একটি তিলও কম পড়েনি, কিন্তু তাকেই সত্য বলে মেনে নিলে যুধিষ্ঠিরকে ফিরে এসে সারাজীবন কেবল পাশাখেলা শিখেই কাটাতে হ'তো। সুতরাং সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়। তা ছাড়া, জয় কি কেবল নির্ভর করে বিজেতার উপরেই? আফগান যখন হিন্দুস্থান জয় করেছিল, সে কি তার নিজের গুণে? হিন্দুস্থান দেশ হারিয়েছিল তার নিজের দোষে। সেই ত্রুটি সংশোধন করার বিদ্যে তার নিজের মধ্যেই ছিল, বিজেতা আফগানের কাছে শেখবার কিছুই ছিল না। আবার এমন দৃষ্টান্তও ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য নয় যখন বিজেতাই পরাজিতের কাছে কি বিদ্যা, কি ধর্ম্ম, কি সভ্যতা, কি ভদ্রতা সমস্তই শিক্ষা করে আর একদিন মানুষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কে বলেছে, সত্যকার বিদ্যা যদি কিছু তার থাকে তা শিখতে হবে না? কে বলেছে. তার দ্বার পশ্চিম-মুখো থাকায় তাকে অহিন্দু বলে বয়কট করতে হবে? কি

পদার্থবিদ্যা, কি রসায়ন-শাস্ত্র, কি ধনবিজ্ঞান—এ-সকল পশ্চিমী বিদ্যে শেখবার আবশ্যক নেই বলে কে বিবাদ করেচে? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যের উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভান করার ওপর, শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের উপর। এতকাল এই তামাসায় যোগ দিয়ে পাগলের মত সবাই নেচে বেড়াচ্ছিল, এখন হঠাৎ জন-কয়েক লোকের চৈতন্য হওয়ায় তারা পেছিয়ে দাঁড়িয়ে এই ফাঁকিটাকে কেবল আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে—এই ত দেখি আসলে মতভেদের কারণ।

এই বস্তুটাকেই একটু বিশদ করে দেখবার চেষ্টা করা যাক। পশ্চিমের পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময়, এতখানি এতটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি। মানুষ মারবার নব নব কৌশল এরা যত আবিষ্কার করেছে, ততই আনন্দে দম্ভে এদের বুক ভরে উঠেছে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে, বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম, সহরকে সহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বার করেছে এবং আরও কত বার করত এই যুদ্ধটা আরও কিছুদিন অগ্রসর হলে। সৌভাগ্য এবং সভ্যতার বোধ করি এদের এই একটিমাত্র মাপকাঠি—কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। এ যে দেখতে না পায় সে অন্ধ এবং এই বিদ্যাটা অপরকে এরা শেখাতে পারে, কিংবা শেখাবার সুযোগ দিতে পারে, অতিবড় কবি-কল্পনাতেও এ আমি ভাবতে পারি না। কথা উঠতে পারে, মানবের কল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয়নি? হয়েছে বই কি। কিন্তু সে নিতান্তই by-product-এর মত বলা যেতে পারে। হোক by-product, কিন্তু সে যখন মানবের হিতার্থে, তখন সেই বিদ্যা-গুলো আয়ত্ত করেও ত আমরা মানুষ হতে পারি? হয়ত পারি। কিন্তু ঠিক ও উপায়ে নয়। পশ্চিমের সভ্যতার অহঙ্কার অভ্রভেদী। আমাদের এবং আমাদের মত আরও অনেক দুর্ভাগা জাতির কাঁধে যখনই ওরা চেপে থাকে, তখনই ঘরে-বাইরে এই কৈফিয়ৎ দেয় যে, এগুলো দেখতে-শুনতে মানুষের মত হলেও ঠিক মানুষ নয়। অন্ততঃ সাবালক মানুষ নয়, ছেলেমানুষ। বেলজিয়ম যখন রবারের

জন্য নিগ্রোদেরই দেশে গিয়ে নিগ্রোদেরই হাত কেটে দিত, তখনও সেই অজুহাতই তারা দিয়েছিল যে, এরা আমাদের হুকুম মানতে চায় না। এরা অসভ্য। অতএব আমরা গায়ে পড়ে এদের সভ্য করবার, মানুষ করবার ভার যখন নিয়েছি, তখন মানুষ এদের করতেই হবে। অতএব শিক্ষার জন্য এদের কঠোর শাস্তি দেওয়া একান্তই আবশ্যক। তথাস্তু বলা ছাড়া ওর যে আর কি জবাব আছে আমি জানি না। আমাদের, অর্থাৎ ভারতবাসীর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলেও ইংরাজ ঠিক এই জবাবটাই দিয়ে আসছে যে, এরা অর্ধ-সভ্য—ছেলে-মানুষ। এদের দেশে প্রচুর অন্ন, কিন্তু পাছে অবোধ শিশুর মত বেশী খেয়ে পীড়িত হয়ে পড়ে, তাই এদের মুখের গ্রাস নিজেদের দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—সে এদেরই ভালোর জন্যে। আবার টাকাকড়িগুলো পাছে অপব্যয় করে নষ্ট করে ফেলে, তাই সে সমস্ত দয়া করে আমরাই খরচ করে দিচ্ছি ; সেও এদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত। এমনি সব ভাল করার কত কি অফুরন্ত কাহিনী ডেকে হেঁকে প্রচার করেছেন—কত কষ্ট করে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এদের মানুষ করতে এসেছি ;—কারণ মানুষ করার sacred duty যে আমাদেরই ওপরে। কিন্তু আঃ—গেলাম ! By law established হয়ে এই ইণ্ডিয়ানগুলোকে মানুষ করতে হয়রান হয়ে মোলাম !

ভগবান জানেন কবে আবার By law disestablished হবে ! কবে আমরা মানুষ হয়ে এদের দুশ্চিন্তা-মুক্ত করতে পারব ! দেড়শ বছর ধরে তালিম দেওয়া চলছে, কিন্তু মানুষ আর হলাম না। কবে যে হতে পারব সেও ওরাই জানে, আর জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু ঐ দেড়শ বছরেও যদি ঐ মোহ আমাদের ঘুচে না থাকে, যে এদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সত্যিই একদিন মানুষ হয়ে উঠব, সত্যি সত্যিই আমাদের মানুষ করে, নিজেদের মৃত্যুবাণ স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে তুলে দিতে এরা ব্যাকুল, তা হলে আমি বলি আমাদের কোনকালে মানুষ না হওয়াই উচিত। ভগবান যেন কোন দিন এই দুর্ভাগাদের পরে প্রসন্ন না হন।

বস্তুতঃ এ কথা বোঝা কি এতই কঠিন যে বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে উঠে, তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই,

আর কারও নয়,—পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে ? তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্ব্বনাশের জন্যেই তৈরী করিয়ে দেবে ? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকিল, মোক্তার, মুন্সেফ, হুকুম-মত জেলে দিতে ডেপুটি, সবডেপুটি ধরে আনতে থানার ছোট-বড় পিয়াদা, ইস্কুলে ডুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষপীড়িত মাস্টার, কলেজে ভারতের হীনতা বর্ব্বরতার লেক্‌চার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, অফিসে খাতা লিখতে জীর্ণ-শীর্ণ কেরানী,—তার শিক্ষা-বিধান এর বেশী দিতে পারে এও যে আশা করতে পারে, সে যে পারে না কি আমি তাই শুধু ভাবি। অথচ কবি বলেছেন, বাঁচবার বিদ্যা কিংবা মানুষ হবার বিদ্যা আছে কেবল শুক্রাচার্য্যের হাতে, আজ তার বাড়ি পশ্চিমে। সুতরাং মানুষ হতে যদি চাই তার আশ্রমে আজ আমাদের দৌড়াতেই হবে, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। অমৃতলোকের লোক হয়েও কচকে তার শিষ্যত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল। হয়েছিল সত্য, কিন্তু বিদ্যা ত কম সহজে আদায় করতে পারেনি, গুরুদেবের ভোজ্য পদার্থ পর্য্যন্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু দিনকাল এখন বদলে গেছে,—আমাদের দুরদৃষ্টে যদি গুরুদেবের ভোজনপর্ব্ব পর্য্যন্ত হয়েই নাটক সমাপ্ত হয়ে যায়, তামাসার বাকী আর কিছু থাকবে না।

কিন্তু আমাদেরই বা এত দুঃখ, এত বেদনা কেন? কবি বলেছেন, সেটা একেবারে নিছক আমাদের নিজেরই অপরাধ। আমি কিন্তু এই উক্তিটাকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পারি নে। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানব-জীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস আছে যা তার অদৃষ্ট, যে বস্তু তার দৃষ্টির বাহিরে, এবং যার ওপর তার কোন হাত নেই। তেমনি একটা সমগ্র জাতিরও দুঃখের মূলে তার দোষ ছাড়াও এমন বস্তু আছে যা তার সাধ্যের অতীত, যা তার দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বোধ হয় সম্পূর্ণ অসত্য বলে এ-কথা উড়িয়ে দেবেন না। দুঃখ ও হীনতার মূলে আমাদের অদৃষ্ট বস্তুও অনেকটা দায়ী, যার ওপর আমাদের কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু কবি

এ-কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে উপমাচ্ছলে একটা গল্প বলেছেন। গল্পটা এই—

"মনে কর এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে, তার কৌতূহলেই অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি করে। অন্য ছেলেটি ভালমানুষ, সে ভক্তি-ভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোনদিকে কেমন করে ঘোরাচ্ছে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে উর্ধ্বস্বরে বাঁশী বাজিয়ে দৌড় মারল। গাড়ি চালাবার সখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁসই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়, তিনি স্বয়ং যে রথের রথী, ছেলেও সেই রথেরই রথী, এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালমানুষ ছেলেটি দেখলে ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ড ভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়া গাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে 'মরণং ধ্রুবম্,' তখনও সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বললে, আমার আর কিছুতে দরকার নেই।"

এই গল্পের সার্থকতা যে কি আমি বুঝতে পারিনি। ছেলে দুটি কে তা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু এক ছেলের প্রতি আর এক ছেলের অকারণ দৌরাত্ম দেখে যে বাপ প্রসন্ন হন তিনি যে কিরূপ বাপ তা বোঝা যায় না। তবে এ-কথা বেশ বোঝা যায়, এমন বাপের পায়ের দিকে যে ছেলে তাকিয়ে থাকে,—তা তিনি যত বড় রথেরই রথী হোন, তাঁর 'মরণং ধ্রুবম্'।

অতঃপর কবি এই দুটি ছেলের জীবন-বৃত্তান্তও দিয়েছেন। মোটর হাঁকানো ছেলেটি ত ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের ক্লাসে প্রমোশন পেলে, কিন্তু যে ছেলেটি 'মরণং ধ্রুবম্' সে তার ম্যাজিক ও তন্ত্র-মন্ত্র নিয়েই পড়ে রইল। এই তন্ত্র-মন্ত্রের 'পরে কঠোর কটাক্ষ কবি

পূর্ব্বেই করেছেন। তাঁর 'অচলায়তনে' এ নিয়ে হাসি-তামাসা অনেক হয়ে গেছে, যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা এর মীমাংসা করবেন, কিন্তু আমার মনে হয় এখানে এ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্ববস্তুর পেছনে যে কোন একটা অজ্ঞেয় শক্তি আছে মানব ইতিহাসে এ একটা প্রাচীন তথ্য। এবং আজ বিংশ শতাব্দীতেও কূল-কিনারা তার তেমনি অজ্ঞাত। এই অজ্ঞেয় শক্তিকে প্রসন্ন করে কাজ আদায়ের চেষ্টা মানুষ চিরদিন করে আসছে,—আজও তার উপায় বার হয়নি ; অথচ আজও তার অবসান নেই। এই উপায় আবিষ্কারের পথে কি করে যে প্রার্থনা একদিন ম্যাজিকে অর্থাৎ মন্ত্র-তন্ত্রে এবং ম্যাজিক আর একদিন প্রার্থনায় চেহারা বদলে দাঁড়ায়, এ তর্ক তুলে পুঁথি বাড়াতে আমার সাধ নেই। ঈশ্বরের ধারণার অভিব্যক্তির ইতিহাসে এই অংশটা বিজ্ঞানের পরিণতির প্রশ্নে আমার অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

সে যাই হোক, মোটর-হাঁকানো ছেলেটির উন্নতির হেতুবাদ এবং সেই পায়ের দিকে তাকানো ভাল ছেলেটির দুঃখের বিবরণ কবি এইখানে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যথা,—

"পূর্ব্বদেশে আমরা যে সময় রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকচি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়াচ্চি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখার ভার দিচ্চি শীতলা দেবীর 'পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ-উচ্চাটন মন্ত্র আওড়াতে বলেচি, ঠিক সেই সময় পশ্চিম মহাদেশে ভলটেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শুনেচি নাকি মন্ত্র-গুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য ? ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, নিশ্চয় মেরে ফেলা যায় কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই। ইউরোপের কোণে-কানাচে যাদুমন্ত্রের 'পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এইজন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে এবং আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।"

কবির এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তা হলে বলার আর কিছু নেই। আমাদের সব মরাই উচিত, এমন কি সেঁকো বিষ খেতেও কারো আপত্তি করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু এই কি সত্য ? ভল্‌টেয়ার

বেশীদিনের লোক নন, তাঁর মত পণ্ডিত ও জ্ঞানী তখন সে দেশে বড় সুলভ ছিল না, অতএব এ-কথা তাঁর মুখে কিছুই অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তখনকার দিনে অজ্ঞান ও বর্ব্বরতায় কি এ দেশটা এতখানিই নীচের ধাপে নেবে গিয়েছিল যে, ঠিক এমনি কথা বলবার লোক এখানে কেউ ছিল না বলে, "বাপু, ভূতের ওঝা না ডাকিয়ে বৈদ্যের বাড়ী যাও। মারতে চাও ত অন্য পথ অবলম্বন কর, কেবল ঘরে বসে নিরালায় মারণ মন্ত্র জপ করলেই কার্য্য সিদ্ধ হবে না ?" ইউরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করি নে, কিংবা যে হাতী পাঁকে পড়ে গেছে, তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভূতের ওঝা ও মারণ-উচ্চাটন মন্ত্র-তন্ত্রের ইঙ্গিতও নির্ব্বিবাদে হজম করতে পারি নে। 'গোরা' বলে বাঙলা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে ; কবি যদি একবার সেখানে পড়ে দেখেন তো দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন,—"নিন্দা পাপ, মিথ্যা আরও পাপ, এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে।"

কবি বলেছেন, যাদুমন্ত্রের পরিণতিই হচ্ছে বিজ্ঞানে। কোনও একটা বস্তু কত দিক থেকে যে পরিণত হয়ে ওঠে সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এই কি ঠিক যে ইউরোপ তার যাদুবিদ্যার নালা এক লাফে ডিঙ্গিয়ে গেল, আর আমরা দেশ-শুদ্ধ লোক মিলে ঘাড়-মোড় ভেঙ্গে সেই পাঁকেই চিরকাল পুঁতে রইলাম! বাইরের দিকে বিশ্ববস্তু যে একটা প্রকাণ্ড কল, এর অখণ্ড অব্যাহত নিয়মের শৃঙ্খল যে যাদু-বিদ্যায় ভাঙ্গে না, সংসারে যা-কিছু ঘটে তারই একটা হেতু আছে, এবং সেই হেতু কঠোর আইন-কানুনে বাঁধা, অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ জনক-জননী বিশ্ব-জগতে কার্য্যকারণের সত্য ও নিত্য সম্বন্ধের ধারণা কি এই দুর্ভাগ্য পূর্ব্বদেশে কারও ছিল না ? এবং এই তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা কি পশ্চিম হতে আমদানি না করতে পারলে আমাদের ভাগ্যে মারণ-উচ্চাটন মন্ত্র-তন্ত্রের বেশী আর কিছুই মিলতে পারে না ? পশ্চিমের বিদ্যার অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি আমাদের নিজেদের প্রতি কেবল অনাস্থাই এনে দিয়ে থাকে, আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ—

সংস্থান, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সকলের প্রতি যদি শুধু অশ্রদ্ধাই জন্মিয়ে দিয়ে থাকে, ত মনে হয়, লুব্ধচিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্য্যের পানে আমাদের না তাকানই ভাল। বস্তুতঃ, এই ত নাস্তিকতা! আমি পূর্ব্বেই বলেছি, যে-শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হয়ে উঠতেপারে—অন্ততঃ তাদের মানুষের ধারণা যা, তা তারা আমাদের দেয়নি, দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। এই সুদীর্ঘকাল পশ্চিমের সংসর্গেও যে আমরা কি হয়ে আছি, মাত্র সেইটুকুই কি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নয়? পেয়েছি কেবল এই শিক্ষা—যাতে নিজেদের সর্ব্ববিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা-কিছু সমস্তের 'পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। আর তাদের ভিতরের দ্বার এমন অবরুদ্ধ বলেই অবনতিও আজ আমাদের এত গভীর! সেটা তো জানবার পথ নেই, তাই শুধু তাদের বাইরের সাজসজ্জা দেখে একদিকে নিজেদের প্রতি যেমন ঘৃণা, অন্য দিকে তাদের প্রতিও ভক্তির আবেগ একেবারে শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। তাই, একদিন আমাদের দেশের একদল লোক নির্ব্বিচারে ঠিক করেছিলেন, ঠিক ওদের মত হতে না পারলে আর আমাদের মুক্তি নেই! ওদের জাতিভেদ নেই—অতএব সেটা ঘোচানো চাই, ওদের স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—অতএব সেটা না হলেই নয়, তাদের খাওয়া দাওয়ার বাচ-বিচার নেই—সুতরাং ওটা না তুললেই আর রক্ষা নেই, তাদের মন্দির নেই—অতএব আমাদের গির্জ্জার ব্যবস্থা চাই, তারা ভাড়া করে ধর্ম্ম প্রচারক রাখে, সুতরাং আমাদেরও ওটা অত্যাবশ্যক—এমনি কত কি! কেবল গায়ের চামড়াটা বদলাবার ফন্দি তাঁরা খুঁজে পাননি, নইলে আজ তাদের চেনাও যেতে না। অথচ, আমি এর দোষ-গুণের বিচার করছি নে, আমি সরল চিত্তে বলছি কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করবার আমার লেশমাত্র অভিরুচি নেই, আমি কেবল এই mentality-টাই আপনাদের গোচর করবার প্রয়াস করচি! এই যে বিদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও স্বদেশের প্রতি নিদারুণ বিরাগ, এ শুধু সম্ভবপর হয়েছিল তাদের অন্দরের পথটা চিরদিন বন্ধ ছিল বলে। তাই এদের সংসর্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের চোখে ওদের বাইরের মোহটা এমনি পেয়ে বসেছিল যে, এ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে তাদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব

ঘটেনি যে, বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, কেবল সেইটুকুর হুবহু নকল করলেই তাঁরাও অমনি মানুষ হয়ে ওদের অন্দরে পংক্তিভোজনে সরাসরি বসে যেতে পারবেন। সংসারে যা-কিছু অজ্ঞাত, গোপন, যার ভিতরে প্রবেশের পথ নেই, তার প্রতি বাইরের লোকের লোভের অবধি থাকে না। তাই এ-কথা তাঁদের স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নিতে কোথাও কিছুমাত্র বাধেনি যে, মানুষ হবার সত্যকার সজীব মন্ত্রটি কেবল ওদের এই নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটিতেই চাপা দেওয়া আছে, কোনমতে ওর সন্ধান না পেলে আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করবার দ্বিতীয় পন্থা নেই। এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার আজ দিন এসেছে।

শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। সে শুধু দেহের গঠনে নয়, সে অন্তরের আত্মীয়। এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিরোধ-বিসম্বাদ চলেছে,—ওদের শিক্ষা অত্যন্ত মহার্ঘ্য, অত বড় বড় বাড়ি কি হবে? কি হবে টানা পাখায়? কাজ কি আবার টেবিল চেয়ারে,—দূর করে দাও মোটা মাইনের বিলিতী প্রফেসার—তার খরচ যোগাতেই যে দেশের বাপ-মা পাগল হয়ে গেল,—এমনি আরও কত শত। এর কোনটাই মিথ্যে নয়, কিন্তু এও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, যখন ভাবি পশ্চিম ও পূর্ব্বের শিক্ষার সংঘর্ষ ঠিক কোন্‌খানে। এদের সত্য মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথায়? একি কেবল গোটা-কতক সাজ-গোজ বদলালেই হবে? টেবিল চেয়ারের বদলে লম্বা লম্বা মাদুর পেতে, ইলেকট্রিক ফ্যানের পরিবর্ত্তে তালপাখা এনে, কিংবা মোটা মাইনের প্রফেসারের বদলে রোগা মাইনের দেশী অধ্যাপক আমদানি করে কিংবা বড় জোর বিদেশী ভাষার মিডিয়ামের স্থানে স্বদেশী ভাষায় লেক্‌চারের আইন করলেই দুঃখ দূর হবে? দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না, যতক্ষণ না সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যাতে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হতে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মত, ভিক্ষুকের মত কিছুতেই হবে না। হলেও সে শুধু একটা গোঁজামিল হবে,—তাতে কল্যাণ নেই, গৌরব নেই, দেশকে সে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে,

কোনদিন মনুষ্যত্ব দেবে না।

আমার এ-সব কথার কথা নয়,—উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশী লেক্‌চার নয়—সত্য সত্যই যা আমি সত্য বলে বুঝেছি তাই কেবল আপনাদের কাছে বলছি। মানুষের এক প্রকার শিক্ষা আছে, যা কেবল নিছক ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার খাতিরে মানুষে অর্জ্জন করতে চায়। যে mentality থেকে আমাদের এদেশে কেউ কেউ ইংরিজী ভাষাটা সাহেবের গলায় বলাটাই চরম উন্নতি জ্ঞান করে, এবং এই mentality-রই এক ধাপ নীচের লোকগুলো জাহাজে এবং রেলগাড়িতে সাহেবী পোষাক ছাড়া কিছুতেই বেড়াতে চায় না। এবং এই জিনিসটা এত ইতর, এত ক্ষুদ্র যে, এ কেন হয়, এর কি উদ্দেশ্য এ বিষয় আলোচনা করতেও ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই ছদ্মবেশের হীনতা, এই আপনার কাছ থেকে আপনাকে লুকোবার পাপ, এবং গভীর লাঞ্ছনা আপনারা অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে এ কথা কেন যে উত্থাপিত করলাম তা বুঝতে আপনাদের বাকী থাকবে না।

এইখানে জাপানের কথা স্মরণ করে কেউ বলতে পারেন, এই যদি সত্য তবে জাপান আজ এমন হ'লো কিসের জোরে? তার চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার ইতিহাসটা একবার ভেবে দেখ! আমি ভেবে দেখেছি। পশ্চিমের শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্বের জোরেই যদি সে আজ বড় হয়ে থাকে, তবে বড়ত্বটাও বেশ মেপে দেখেছি আমরা শুক্রাচার্য্যেরই মাপকাঠি দিয়ে। কিন্তু মানবত্ব বিকাশের সেই কি শেষ মানদণ্ড? জাতীয় জীবনে এই দু'শো পাঁচশো বছরের ঘটনাই কি তার চরম ইতিহাস?

আমি জাপানের ইতিহাস জানি নে। তার কি ছিল এবং কি হয়েছে। এ-বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, কিন্তু এই তার পার্থিব উন্নতির মূলে, পশ্চিমের সভ্যতার পদতলে যদি তার আত্মসমর্পণের সূচনাই করে থাকে ত তারস্বরে আনন্দধ্বনি করবার বোধ হয় বেশী কারণ নেই। এবং এমন দুর্দ্দিন যদি কখনো ভারতের ভাগ্যে ঘটে—সে বিগত জীবনের সমস্ত tradition বিস্মৃত হয়ে ঠিক অতখানি উন্নত হয়েই ওঠে, এক কালো চামড়া ছাড়া পশ্চিমের সঙ্গে তার কোন প্রভেদই না থাকে ত ভারতের ভাগ্যবিধাতা উপরে বসে সেদিন

হাসবেন কি নিজে চুল ছিঁড়বেন বলা কঠিন।

কোন বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়েই হয় না—হবার জো-ই নেই। তাদের যে বিদ্যাটার প্রতি আমাদের এত লোভ, তা তাদের মাথায় হাত বুলিয়েই শিখে নিই, বা পায়ে তেল মাখিয়ে অর্জ্জন করি—এর ফল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী যদি না দেশের প্রতিভার ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠে, এর মূলে যদি না জাতির অতীতের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করে এসে থাকে। এই ফুল-সমেত বৃক্ষশাখা, তা সে বর্ণে ও গন্ধে যত দামীই হোক, একদিন শুখোবেই শুখোবে, কোন কৌশলেই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এই সত্যটা আজ আমাদের একান্তই বোঝবার দিন এসেচে যে, ঠকিয়ে-মজিয়েই হোক বা কেড়ে-বিকড়েই হোক্, নানা দেশ থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠে। তার অতিরিক্ত যা সে শুধুই ভার, নিছক আবর্জ্জনা। পরের দেখে আমরাও যেন ওই ঐশ্বর্য্যের প্রতি লুব্ধ হয়ে না উঠি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতীত আমাদের এমন শিক্ষাই দিয়েছিল, আজ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে থাকি ত সে পরম দুর্ভাগ্য। ঐ যে ট্রাম, ঐ যে মোটর পথের উপর দিয়ে বায়ুবেগে ছুটেছে, ঐ যে ঘরে ঘরে electric পাখা ঘুরচে, ঐ যে সহরের আলোর মালার আদিঅন্ত নেই, ঐ যে শত-সহস্র বিদেশী সভ্যতার তোড় জোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেছি, ওর কোনটাই কি আমাদের যথার্থ সম্পদ? বিগত যুদ্ধের দিনের মত আবার যদি কোনদিন ওর আমদানীর মূলে শুকিয়ে যায় ত ভোজবাজির মত ওদের অস্তিত্ব এ-দেশ থেকে উঠে যেতে বিলম্ব হবে না। ও-সকল আমরা সৃষ্টি করিনি, করতেও জানি নে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা। আর ও-সকল আমাদের না হলেও নয়, অথচ, ওর কোনটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠেনি। এই যে দেখা-দেখি প্রয়োজন, এ যদি আমরা গড়তেও না পারি, ছাড়তেও না পারি, তা হলে দুষ্ট-ক্ষুধার মত ও কেবল আমাদের একদিকে প্রলুব্ধ এবং অন্যদিকে পীড়িতই করতে থাকবে। কিন্তু পশ্চিম ওদের সৃষ্টি

করেছে নিজের গরজ থেকে। তাদের সভ্যতায় ও-সকল চাই-ই। ঐ যে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ, ওই যে গোলাগুলি-কামান-বন্দুক গ্যাসের নল, ওই যে উড়ো এবং ডুবো জাহাজ ও সমস্তই ওদের সভ্যতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই কোনটাই ওদের বোঝা নয়, তাই ওদের পরিণতি, ওদের নিত্য নব আবির্ভাব দেশের প্রতিভার ভিতর থেকেই বিকশিত হয়ে উঠেচে। দূর থেকে আমরা লোভ করতেও পারি, নিতান্ত নিরীহ গোছের বাবুয়ানীর সরঞ্জাম কিনেও আনতে পারি, কিন্তু বাণিজ্য-জাহাজই বল, আর মোটর-গাড়িই বল, যত না সে নিজেদের প্রয়োজনে, নিজের দেশে, নিজের জিনিসের মধ্যে দিয়ে জন্মলাভ করে, ততক্ষণ যেমন করে এবং যত টাকা দিয়েই না তাদের সংগ্রহ করে আনি, সে আমাদের সত্যকারের ঐশ্বর্য নয়। তাই ম্যানচেস্টারের সূক্ষ্ম বস্ত্র, গ্লাসগো লিনেন, এবং মসলিন, স্কটল্যাণ্ডের পশমী শীতবস্ত্র,—তা সে আমাদের যত শীতই নিবারণ করুক এবং দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুক, কোনটাই আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়। নিছক আবর্জ্জনা।

কিন্তু আমি একটু সরে গেছি। আমি বলছিলাম যে মানুষ কেবল সত্যকারের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করতে পারে এবং সৃষ্টি করা ছাড়া সে কখনো সত্যকারের সম্পদও পায় না। কিন্তু পরের কাছে শিখে মানুষ বড় জোর সেইটুকুই তৈরী করতে পারে, কিন্তু তার বেশী সে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করাটা শক্তি—সেটা দেখা যায় না, এমন কি পশ্চিমের দ্বারস্থ হয়েও না! এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস,—আত্মনির্ভরতা। কিন্তু যে শিক্ষা আমাদের আত্মস্থ হতে দেয় না, অতীতের গৌরব কাহিনী মুছে দিয়ে আত্ম-সম্মানে অবিশ্রাম আঘাত করে, কানের কাছে কেবলি শোনাতেথাকে, আমাদের পিতা-পিতামহেরা কেবল ভূতের ওঝা আর মন্ত্র-তন্ত্র, দৈবজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের কার্য্যকারণের সম্বন্ধ-জ্ঞান বা বিশ্বজগতের অব্যাহত নিয়মের ধারণাও ছিল না—তাই আমাদের এ দুর্দ্দশা, তা হলে সে শিক্ষায় যত মজাই থাক্, তার সঙ্গে অবাধ কোলাকুলি একটু দেখে শুনে করাই ভাল।

পশ্চিমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ মারবার শত-কোটী মন্ত্র-তন্ত্র, পরের দেশে তার মুখের গ্রাস অপহরণ করার ততোধিক

কলকারখানা, এ সমস্তই প্রয়োজনে তার নিজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে,—কিন্তু ঠিক ঐ-সকল আমাদের দেশের সভ্যতার আদর্শে প্রয়োজন কি-না আমি জানি না। কিন্তু কবি বলেছেন, এই সকল মহৎ কার্য্য করেছে তারা নিশ্চয় কোন একটি সত্যের জোরে। অতএব এটা আমাদের শেখা চাই, কারণ বিদ্যাটা তাদের সত্য। এবং পরক্ষণেই বলেছেন, কিন্তু শুধু ত বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানীও আছে সুতরাং শয়তানীর যোগেই ওদের মরণ।

হতেও পারে। কিন্তু যে লোক শুধু মারণ-উচ্চাটন বিদ্যে শিখে মন্ত্র জপতে শুরু করেছে, তার কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা শয়তানী নির্ণয় করা কঠিন। কবি আমাদের মুখে একটা কথা গুঁজে দিয়ে বলেছেন—

"ঐ কথাটাই ত আমরা বার বার বলচি! ভেদবুদ্ধিটা যাদের (অর্থাৎ পশ্চিমের) এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এতবড় হাঁ করেচে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কারবার চলতে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে, এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা বিষের মত পরিহার করা চাই।"

এমন কথা যদি কেউ বলেও থাকে ত খুব বেশী অন্যায় করেছে আমার মনে হয় না। Physics, Chemistry হিন্দু কি ম্লেচ্ছ এ কথা কেউ বলে না। বিদ্যার জাত নেই এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে Culture জিনিসটার জাত নেই এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। এবং ওদের শিক্ষা যদি কেউ বিষের মত পরিহারের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে, ত সে কেবল এইজন্যেই, বিদ্যার জন্যে নয়। আর এই যদি ঠিক হয় যে, তারা কেবল অবিদ্যাকেই মানে এবং আমরা মানি বিদ্যাকে তা হলে এ দুটোর সমন্বয়ের উপায় বইয়ের মধ্যে, প্রবন্ধের মধ্যে, শ্লোক তুলে তুলে হতেও পারে, কিন্তু একটাকে আর একটার গিলে না খেয়ে বাস্তব জগতে যে কিভাবে সমন্বয় হতে পারে আমি জানি নে। যাদের গেলবার মত বড় হাঁ আছে তারা গিলবেই—মনু বা উপনিষদের দোহাই মানবে না। অন্ততঃ এতকাল যে মানেনি সে ঠিক।

পশ্চিমে এতবড় লঙ্কাকাণ্ডের পরেও যে আজ সেই ল্যাজটার ওপরে মোড়কে মোড়কে সন্ধি-পত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চলছে, এবং এত মারের পরেও যে তার নাড়ী বেশ তাজা আছে, তাতে আশ্চর্য্য হবার আছে কি? এই মহাযুদ্ধ যারা যথার্থ বাধিয়েছিল তাদের দু'পক্ষই চমৎকার সুস্থ দেহে ও বহাল-তবিয়তে বেঁচে আছে। যারা মরবার তারা মরেছে; এবং ফের যদি আবশ্যক হয়, তাদেরই আবার মরবার জন্যে জড়ো করা হবে।

সুতরাং এদের মধ্যে আজ যদি কেউ শোকাকুল-চিত্তে কবিকে প্রশ্ন করে থাকে, 'ভারতের বাণী কই'? তা হলে সন্দেহ হয় তারা কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছে; এবং এইজন্যেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করে ঘরে ডেকে এনে নিভৃতে 'মা গৃধঃ' মন্ত্র দিয়ে বশ করা যাবে,—এ ভরসা কবির থাকলেও আমার নেই। কারণ, বাঘের কানে 'বিষ্ণু মন্ত্র' ফুঁকলে বৈষ্ণব হয় কি না আমি ভেবে পাই নে।

আরও একটা কথা। পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূলমন্ত্র হচ্ছে standard of living বড় করা। আমাদের দেশের মূল নীতির সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করবার স্থান আমার নেই, কিন্তু ওদের সমাজ-নীতির যেমন interpretationই দেওয়া যাক, তার আসল কথা হচ্ছে, ধনী হওয়ার। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধনবিজ্ঞান,—এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয়ও আছে এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এ ধনী হওয়ার অর্থ ত কেবল সংগ্রহ করাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি ধনহীন করে তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। নইলে, শুধু নিজে ধনী হওয়ার কোন মানেই থাকে না। সুতরাং কোন একটা সমস্ত মহাদেশ যদি কেবল ধনী হতেই চায় ত অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করেই পারে না। তবু এই একটা কথা নিত্য নিয়ত মনে রাখলে দুরূহ সমস্যার আপনি মীমাংসা হয়ে যায়। এই তার মেদ-মজ্জাগত সংস্কার, এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর পরেই তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। এরই জন্যে তার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সাধনা নিয়োজিত। আজ আমার কথায়, আমাদের ঋষিবাক্যে সে কি তার সমস্ত civilisation-এর কেন্দ্র নড়িয়ে দেবে? আমাদের সংসর্গে তার বহুযুগ কেটে গেল, কিন্তু

আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগতে দেয়নি। আপনাকে এমনি সতর্ক, এমনি স্বতন্ত্র, এমনি শুচি করে রেখেছে যে, কোনদিন এর ছায়াটুকু মাড়ায়নি। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এ-দেশের রাজার মাথায় কোহিনুর থেকে পাতালের তলে কয়লা পর্যন্ত, যেনানে যা-কিছু আছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায়নি। এটা বোঝা যায়, কারণ, এই তার সত্য, এই তার সভ্যতার মূল শিকড়। এই দিয়েই সে তার সমাজ-দেহের সমস্ত সভ্যতার রস শোষণ করে, কিন্তু আজ খামোকা যদি সে ভারতের আধিভৌতিক সত্যবস্তুর বদলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-পদার্থের inquiry করে থাকে ত আনন্দ করব কি হুঁসিয়ার হব—চিন্তার কথা।

ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে,—এই মূলে। আমাদের ঋষিবাক্য যত ভালই হোক তারা নেবে না, কারণ তাতে তাদের প্রয়োজন নেই। সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা আমাদের দেবে না—কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু সত্য। আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সেটুকু না নেওয়াই ভাল। বাকীটুকু যদি আমাদের সভ্যতার অনুকূল না হয়, সে শুধু ব্যর্থ নয়, আবর্জ্জনা। তাদের মত পরকে মারতে যদি না চাই, পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই যদি সভ্যতার শেষ না মনে করি ত মারণ মন্ত্র যত সত্যই হোক তার প্রতি নির্লোভ হওয়াই ভাল।

আর একটা কথা বলেই আমি এবার প্রবন্ধ শেষ করব। সময়ের অভাবে অনেক বিষয়ই বলা হ'লো না,—কিন্তু এই অবান্তর কথাটা না বলেও থাকতে পারলাম না যে, বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়, শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ দুটো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জ্জন করা নয়। এমনও হতে পারে, বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা উল্টো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তেলে জলে মেশে না, এ দু'টো পদার্থও একেবারে উল্টো, তবু তেলের সেজ জ্বালতে যে মানুষ জল ঢালে সে কেবল তেলটাকেই নিঃশেষে পুড়িয়ে নিতে। যারা এ তত্ত্ব জানে না, তাদের একটু ধৈর্য্য থাকা ভাল।

শিক্ষা ও সেবা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শিক্ষাই মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য করে। কেবল সন্তানকে খাওয়া পরা দেওয়া পিতার কার্য নয়, তাদের মানুষ করে গড়ে তোলাই প্রকৃত পিতার কাজ। কিন্তু শিক্ষা বলতে গেলে জগতের নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনকে বুঝায়; তর্ক-শাস্ত্রের কূট প্রশ্নের সমাধান করা নয়; সে সব অসার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে শুধু অমূল্য মস্তিষ্কের অপব্যবহার করা হয় মাত্র। কিরূপে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপকর্ষ ঘটেছে তা আমি আমার 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিশদভাবে দেখিয়েছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষার কথা উঠিলেই অনেক হয়তো দর্শন উপনিষদের কথা তুলবেন। অতীতের গৌরব-কাহিনী নিয়ে থাকলে চলবে না। বর্তমানে আমাদের অবস্থা কতদূর হীন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়, তাহার প্রতিকার সাধনকল্পে আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করা চাই। আমরা সর্বস্ব হারাতে বসেছি, ভিটে মাটি বিকিয়ে যেতে বসেছে, এখন শুধু আমরা অমুক রাজা-উজীরের ছেলে ছিলাম বলে লোকের কাছে অসার আভিজাত্য-গৌরব রক্ষায় যত্নবান হলে কিছু ফল হবে না। অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে আমাদের জড়ভরত হলে চলবে না; আলস্য পরিত্যাগ করতেই হবে। সারা জগৎ যখন কর্মে ব্যাপৃত, তখন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা আমাদের সাজে কি? বাঙ্গালী জাতিও মানুষ, আমাদেরও সমস্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি আছে, কেবল যথাযথ অনুশীলন অভাবে আমরা জগতের কাছে হেয়, নগণ্য ও সকলের নিম্নে অবস্থিত। কোন গ্রন্থকার বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন,—"এদের সমস্ত গুণই আছে, কেবল সেইগুলির যথাযথ অনুশীলন করবার জন্য তাদের মধ্যে একজন ঠিকমত চালকের দরকার।"

ডঃ মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমার ছাত্রেরা, আমা অপেক্ষা ন্যূন নন। এত অল্প বয়সে তাঁরা যে সম্মানের অধিকারী হয়েছেন, এতে আমার প্রাণ যে কিরূপ আনন্দিত হয়েছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। জার্মানীতে পেঁাছিলে বড় বড় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যেরূপভাবে তাঁদের সম্বর্ধনা করেন, তা তাঁদের লিখিত চিঠি থেকে বিশেষভাবে অবগত হয়েছি। নিউটনের 'ল-অফ্-গ্র্যাভিটেশনের' মত 'ঘোষের ল'-বলে একটা নিয়ম জগতে শীঘ্রই প্রচারিত হবে। তা এখন জার্মান ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তারপর জ্ঞানেন্দ্র-নাথের একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লণ্ডনে ফ্যারাডে সোসাইটিতে পঠিত হলে তথাকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনেকে মনে করতে পারেন যে, এ প্রকার কৃতিত্বলাভ কেবল ইউরোপের জল-হাওয়ার গুণে হয়েছে; কিন্তু তা নয়, তাঁরা এখান থেকে শিক্ষালাভ করে বিদেশে গিয়েছেন, বাঙলার জল-হাওয়ায় তাঁরা মানুষ হয়েছেন। যখন তাঁরা কলকাতায় ছিলেন, এখানকার সায়ান্স কলেজের নাম দিয়ে লণ্ডন ও আমেরিকার বিখ্যাত মাসিক পত্রে অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধও পাঠিয়েছিলেন। বাঙ্গালীরও মস্তিষ্ক আছে, তারা শুধু পরের চিন্তিত বিষয় নিয়েই নাড়াচাড়া করে না, স্বাধীনভাবে ভাবতেও জানে।

যাক্ এখন সেবা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলি। সেবার কথা উঠলেই আমাদের সময়কার ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে। এখনকার ছেলেরা সেবা বিষয়ে তখনকার ছেলেদের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর। আমাদের সময় দেখেছি, যদি কোন ছাত্র ছাত্রাবাসে বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হত তবে সকল ছাত্র তাকে ত্যাগ করত, কিম্বা মেথর মুদ্দফরাসের জিম্মায় তাকে হাসপাতালে বাস করতে হত। আর এখনকার ছাত্রেরা পীড়িতের সেবার্থে পালা করে রাত্রি যাপন করে, বন্যাপীড়িত দুঃস্থ নরনারীর সেবায় প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করতে শিখেছে। এ সব দৃশ্য দেখলে সত্যই প্রাণে কেমন একটা আনন্দ হয়। সেই সব সেবাপরায়ণ ছাত্রদের দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে ইচ্ছা হয়।

আজকাল একটা সুর উঠেছে, ইউরোপের যা কিছু সবই

পরিত্যাজ্য। কথাটা একটু তলিয়ে বুঝলেই আমাদের ভুলটা ধরা পড়ে। তাদের মধ্যে অনেক সৎকাজ দেখতে পাই যা আমাদের সর্বতোভাবে শিক্ষা করা উচিত। এক লণ্ডন শহরে ৬০/৭০টি হাসপাতাল আছে; সবগুলি দেশের স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর কলকাতায় ত মোটে ছয়টি কি সাতটি হাসপাতাল তাও আবার গভর্ণমেণ্টের সাহায্য চলে।

আমাদের দেশে কত অনাথ বালক প্রতি বৎসরে হয় অকালে বিনষ্ট হচ্ছে, নয়তো পশুর মত জীবন যাপন করছে। লণ্ডনেই তো কয়টা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের আশ্রম রয়েছে। এঁদের কেবল পালন করা নয়, যাতে কুপথে না যায় তার জন্য শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। ব্যবসা ব্যাণিজ্যাদির দ্বারা এই বালকেরা যাতে নিজেদের ও জাতিকে সমৃদ্ধশালী করতে পারে তারও বিপুল আয়োজন। মূক-বধিরদের শিক্ষা দিবার তো কথাই নাই, এমন কি কুকুরদের জন্যও সেবাশ্রম আছে।

তারপর দেখুন শিলং, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানের কুষ্ঠাশ্রমের কথা। সে সকলগুলিই তো খ্রীষ্টান মিশনারিদের। ফাদার ডেমিএন্ (Father Damien) তাদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। কুষ্ঠরোগীরা আমাদের জাত ভাই, তাদের সেবার ভার নিলেন বিদেশী শ্বেতাঙ্গরা। আর আমরা কি করেছি? পরিচয় দিতে হলে তো এক দেওঘরে যোগেন্দ্র বসু প্রভৃতির প্রযত্নে গড়া একটি মাত্র কুষ্ঠাশ্রমের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটিও হাসপাতাল বা সেবাশ্রম নাই, বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর ওদের প্রায় সবগুলিই—Public charity বা সাধারণের দান দ্বারা পরিচালিত। যখন তাদের অর্থের অনটন হয়, তখন তারা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, আর অমনি এক তাড়া অজ্ঞাত হস্তের নোট কিম্বা চেক এসে হাজির হয় কিম্বা কোন ছদ্ম ভিক্ষুক বেশধারী লোক এসে টাকা দিয়ে ছুটে পালায়, পাছে লোকে তার নাম জানতে পারে এই ভয়ে। এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে অর্থদান করতে আমরা কয়জন শিখেছি, আর কয়জনই বা মানব সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে শিখেছি।

বিবেকানন্দ ঠিক বলেছিলেন—আমাদের এমন একদল স্বেচ্ছা-

সেবক দরকার যারা আত্মসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণভরে সকলের ও দেশের সেবা করবে। শ্বেতাঙ্গরা জড়বাদী হোক, কিন্তু তাদের কাছে শেখবার অনেক জিনিষ আছে। মানুষ যদি মানুষের প্রেম বন্ধনে না বাঁধল, যদি তার সেবা করে ধন্য না হল—তবে শুধু প্রাণহীন আধ্যাত্মিকতার আলোচনায় ফল কি ?

বিদ্যালয়-সমাজ

অনাথনাথ বসু

আজ আপনাদের একটি নূতন সমাজের কথা শুনাইব। আবহমানকাল হইতে আমাদের দেশে বিচিত্র জাতি ও ধর্ম্মের কল্যাণে নানা বিচিত্র সমাজের উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহাদের কথা আপনারা অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু আমি যে সমাজের কথা বলিব সে সমাজ বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার কারণ এই নহে যে ইহা আত্মগোপন করিয়া আছে; আমার আলোচ্য এই সমাজ গুপ্তসমিতি নহে বরং ইহা এতই সুপরিচিত ও সুব্যক্ত যে ইহাকে আমরা লক্ষ্যই করি না, ইহার সমাজরূপ আমাদের চোখে পড়ে না।

আমরা সকলেই শিক্ষাব্রতী, বিদ্যালয় লইয়া আমাদের কারবার। সুতরাং যেমন সাধারণ ব্যবসায়ে মাঝে মাঝে Stock অর্থাৎ সঞ্চিত পণ্যের হিসাব-নিকাশ করিলে ব্যবসায়ের প্রকৃত রূপটি চোখে পড়ে এবং কাজ বোঝা যায়, তেমনি আমাদের কারবারেরও হিসাব-নিকাশ করিলে আমাদের কাজ করা সহজতর হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের স্বরূপ, তাহার আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আলোচনা করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না? অবশ্য এরূপ আলোচনায় ইতিহাস বা অংক বা অন্য কোন অধ্যাপনীয় বিষয় কেমন করিয়া ভাল করিরা পড়ান যাইতে পারে তাহার কোন ইঙ্গিত মিলিবে না। এ কথাটী পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখা ভাল তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোনরূপ অনুতাপের কারণ ঘটিবে না। আমার আলোচনা মূলতঃ শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে, শিক্ষার ফিলজফি লইয়া।

আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন "ফিলজফি" লইয়া আলোচনার লাভ কি? যিনি কর্ম্মী তিনি বলিবেন কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে "ফিলজফি" লইয়া মাথা ঘামাইতে পারি এমন অবসর কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতেছি। আমি জানি 'ফিলজফি' কথাটাই অনেকের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু সে ভয়ের কোন

কারণ নাই ; আমি যদি বলি আমাদের সকলেরই একটা না একটা ফিলজফি আছে এবং আমরা সকলেই ছোট বড় ফিলজফার, দার্শনিক, তাহা হইলে অনেকেই হয়ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু কথাটা একান্তই সত্য সুতরাং বিস্ময় অকারণ।

একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় জীবনে চলিবার, জীবনকে দেখিবার সকলেরই একটি না একটি বিশেষ ভঙ্গী আছে ; সকল কর্ম্মে ও চিন্তায় সেই ভঙ্গীর প্রভাব আছে। জীবনকে দেখিবার সেই বিশেষ রীতিকে, জীবনপথে চলিবার সেই বিশিষ্ট গতিচ্ছন্দকেই আমি 'ফিলজফি' আখ্যা দিয়াছি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা সুসংহত ও সহজ লক্ষ্য নহে। তাহা ছাড়া অনেক স্থলেই একই জীবনে একাধিক ভঙ্গী, একাধিক গতিচ্ছন্দ চোখে পড়ে। আমাদের জীবনের যত কিছু দুঃখ তাহার মূল ঐখানেই। "সূত্রে মণিগণা ইব" যে ফিলজফি আমাদের জীবনের সকল কর্ম্ম ও চিন্তা একসূত্রে বিধৃত করিয়া রাখিবে তাহা না থাকায়, আমাদের জীবনে একটিমাত্র ফিলজফি কার্য্যকরী না হওয়ায় জীবনটায় জট পাকাইয়া যায়। আমরা এক ভাবি আর করি ; এক পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ আর একটা পথ ধরিয়া বসি। সুতরাং জীবনযাত্রা ব্যাহত, ছন্দোহীন হইয়া পড়ে।

এত গেল সাধারণ জীবন সম্বন্ধে, এখন তাহা লইয়া আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু যেমন জীবনকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে জীবন সম্বন্ধে একটা ফিলজফি থাকা প্রয়োজন তেমনি শিক্ষাদান ব্যাপারকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষার একটা ফিলজফি থাকা একান্তই প্রয়োজন।

আমার মনে হয় আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ সব চেয়ে প্রয়োজন হইয়াছে একটা সুসংহত, সুসংবদ্ধ ফিলজফি। শিক্ষার সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূলে রহিয়াছে এরূপ একটি ফিলজফির অভাব। তাহার জন্যই আজ যে শিক্ষা দিতেছে সে জানে না কেন সে শিক্ষা দেয়, যে শিক্ষা পাইতেছে সে বোঝে না যে কেন সে শিক্ষা লাভ করে। ফিলজফির বিশেষ কাজ জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ, হিসাব-নিকাশ, কেন বাঁচি, কেমন করিয়া বাঁচি এ সকল প্রশ্নের উত্তর ফিলজফি দেয় বা তাহার দেওয়া উচিত। তেমনি শিক্ষার ফিলজফির

উদ্দেশ্য শিক্ষাবিষয়ে এরূপ প্রশ্নের সুসংবদ্ধ উত্তর দান। কেন পড়াইব, কি পড়াইব, কেমন ভাবে পড়াইব এসকল প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার ফিলজফিই দিতে পারে। যদি সে ফিলজফির অভাব হয়, যদি আমাদের মনে শিক্ষা ব্যাপারের সমগ্র রূপটি না থাকে তাহা হইলেই পদে পদে বাধা আসে। কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া সম্ভব হয় না। তখন নিজের মন হইতে প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া পরের উপর উত্তরের জন্য বরাত দিই। সত্য বলিতে হইলে আমাদের মধ্যে অনেককেই স্বীকার করিতে হয় যে অমুক বিষয়টি যে পড়াই তাহার একমাত্র যুক্তিযুক্ত কারণ কর্তৃপক্ষের আদেশ। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" ; প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আবার অর্থকরী বিদ্যার যুক্তি চলে না। কিন্তু এমন করিয়া ত' কর্ত্তব্য শেষ হয় না ; পরের কাছে জবাবদিহী না-ই করিতে হইল কিন্তু নিজের কাছে এ জবাবদিহী চলে না। ফলে মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া ওঠে, সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টা অর্থহীন, বোঝা হইয়া দাঁড়ায় ; আনন্দ চলিয়া যায়। অবশ্য সুদীর্ঘদিনের অভ্যাসে মন পঙ্গু হইয়া যায়, যে গোপন প্রশ্ন একদিন মনের কোণে অলক্ষ্যে খোঁচা দিত অভ্যাসের দ্বারা তাহা জীর্ণ হইয়া যায় ; তখন "সুখের চেয়ে স্বস্তি" ভাল এই নীতি পালন করিয়া অভ্যস্ত পথে সহজভাবে চলি। কিন্তু নিজের প্রতিও শিক্ষার্থীদের প্রতি কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়।

শিক্ষকদের মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় artist (শিল্পী) ও technician (কারিগর) ; একদল যাঁহারা শিক্ষা ব্যাপারটাকে আর্টরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর একদল যাঁহারা তাহাকে একটা বিশেষ technique-এর অন্তর্গত করিয়াছেন। Artist ও technician-এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। Technician-কে ঠিক শিল্পী বলা চলে না। তিনি শুধু শিল্প-সাধনাকে বাহিরের বস্তুতে পরিণত করিয়া, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার বাহ্য কৌশলটি আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার মধ্যে অন্তরের কোন প্রেরণা নাই ; তাহার মধ্যে মূলতঃ অনুচিকীর্ষাই রহিয়াছে ; তাঁহার কাজকে সৃষ্টি বলা চলে না। তাহার পিছনে কোন ফিলজফি নাই। কিন্তু যিনি আর্টিষ্ট তাঁহার প্রেরণা ভিতরের, তিনি যাহা করেন তাহা ভাল হউক্ মন্দ হউক্ সেটা সৃষ্টি-ব্যাপার। সে

সৃষ্টির মধ্যে স্বাধীনতা আছে, আনন্দ আছে, পুরাতনের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নূতন কিছু করিবার প্রয়াস আছে। তাঁহার সৃষ্টির মূলে জীবনের একটি বিশেষ ফিলজফি আছে।

কারিগরের কাজ সহজ, শিল্পী হইতে গেলে অনেক ঝঞ্ঝাট। সুতরাং অনেক কারিগরী করাটাইকে সুবিধা মনে করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ কারিগর অনেক পাওয়া যাইবে। বোধ করি আমাদের মধ্যে অনেকেই সেই দলে পড়িব। কিন্তু কারিগরী করিলে বেতনটা সহজে যদিও মেলে কিন্তু আত্মপ্রসাদ, সৃজনরসাস্বাদ পাওয়া যায় না, মনের খোরাক জোটে না।

আজকাল শিক্ষকদের শিক্ষায় method of teaching অর্থাৎ অধ্যাপনা-প্রণালীর উপর জোর দেওয়া হইতেছে। এ যেন কেমন করিয়া হাতিয়ার চালাইতে হয় তাহারই শিক্ষা। সে শিক্ষার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি কিন্তু তাহার চেয়েও প্রয়োজন হাতিয়ারের তত্ত্বানুসন্ধান করা কাজের ফিলজফি খুঁজিয়া পাওয়া। হাতিয়ারও ভাল করিয়া আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে হইলে তাহার তত্ত্ব জানিতে হয়। সে তত্ত্ব না জানিলে অসুবিধা এই হয় যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটিলে সাধারণের বাহিরে একটু কিছু হইলে হাতিয়ার অচল হইয়া পড়ে। অবস্থার ইতর-বিশেষ যন্ত্রচালনারও ইতর বিশেষ ঘটে; যে অন্ধভাবে যন্ত্রকেই চিনিয়াছে সে কেমন করিয়া নিপুণভাবে সে পার্থক্য বিচার করিতে পারিবে? তাহার জন্য প্রয়োজন যন্ত্রতত্ত্বজ্ঞান।

Method শিক্ষা করা শিক্ষকতার ক্ষেত্রে কারিগরি করা। সেই কারিগরীর পিছনে তত্ত্ববোধ থাকা চাই, শিক্ষার ফিলজফি চাই। কেমন করিয়া কাজটা করিব তাহা জানিবার পূর্বে, অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গেই, জানা চাই কেন কাজ করিব, কি উদ্দেশ্যে করিব। এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাইলেই তখন কেমন করিয়া কাজটি সুসম্পন্ন করিব সে প্রশ্ন উঠিবে।

শিক্ষা ব্যাপারটাকে দুইদিক দিয়া দেখা চলে। এক, ব্যক্তির দৃষ্টি লইয়া; দুই, সমাজের দিক দিয়া। শিক্ষাতাত্ত্বিকগণকেও এইভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে; একদল, যাঁহারা শিক্ষাকে ব্যক্তিগত ব্যাপার রূপে ধরিয়া লইয়া সেই ভাবে বিচার করেন;

আর একদল, যাঁহারা তাহাকে সামাজিক ব্যাপাররূপে ধরিয়া লইয়া আলোচনা করেন। যাঁহারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী তাহারা বলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন। আবার যাঁহারা সমাজকে বড় করিয়া দেখিয়া বলেন, সমাজের সুচিরসঞ্চিত আধ্যাত্মিক সম্পদে অধিকার দান করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ; কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর-বিরোধী সত্তা নহে ; সুতরাং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীকেও স্বীকার করিতে হয় যে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সমাজ-নিরপেক্ষ নহে ; এবং সমাজ-বাদীকেও স্বীকার করিতে হয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষাপ্রণালী গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। এক নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছাড়া আর সকলেই বোধ করি একথা অল্পবিস্তরভাবে স্বীকার করেন। সম্প্রতি আর একদল চরম সমাজবাদী বা রাষ্ট্রবাদী দেখা দিয়াছেন ; তাঁহাদের মতে ব্যক্তির রাষ্ট্রাতিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নাই। আমাদের দেশে এখনও সে মত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই সুতরাং সে মতের আলাচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদটা কিছু আলোচনা করিতে চাহি, কারণ আমাদের জাতীয় জীবনে সেই মতবাদের প্রভাব নানা ভাবে রহিয়াছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব বেশীদিনকার নহে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ইহার যে রূপ আমরা দেখিতেছি তাহার জন্ম য়ুরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ঐতিহাসিক হয়ত এই জন্মকাহিনী আরো পুরাতন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতির অন্যতম প্রধান তত্ত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি। ডারইউন যখন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়া যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest) ও জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence) এই দুই নীতি ঘোষণা করিলেন প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতির জন্ম হইল তখন। ধীরে ধীরে সেই নীতি জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নহে সমাজবিজ্ঞানেও আপন প্রভাব বিস্তার করিল। নানা কারণে তখনকার য়ুরোপের অর্থনৈতিক আবহাওয়াও ছিল এই নীতির অনুকুল। তাহা ছাড়া এই সময়েই

গণতন্ত্রবাদ প্রবল হইয়া দেখা দেয়। একদিক দিয়া গণতন্ত্রবাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতির বিরোধ রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি য়ুরোপের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

গণতান্ত্রিক আদর্শের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতিও য়ুরোপ হইতে আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া যে শাসক-সম্প্রদায়ের স্পর্শে এই দুই নীতি আমাদের জাতীয়জীবনে আত্ম-প্রকাশ করে তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নীতির পরিপোষণা করিতেন। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি সহজেই এদেশে সমাদর লাভ করিয়াছিল। আমরা আজকাল যে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক আবহাওয়ায় বাস করিতেছি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি বলবান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইহার কি ফল হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার কি ফল হইয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

আপনারা সকলেই শিক্ষার তিরস্কার ও পুরস্কারের ব্যবস্থার সহিত পরিচিত আছেন ; যে ছাত্র ভাল তাহাকে আমরা পুরস্কার দিই, যে ভাল নহে তাহাকে তিরস্কার করি। এই ভাবে শিক্ষায় আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতির প্রবর্তন করিয়াছি। ইহা খুবই স্বাভাবিক ; বাহিরের সমাজ যখন সেই নীতি অনুসরণ করিতেছে তখন শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাহার প্রভাব আসিয়া পেঁীছাইবে তাহাতে বিচিত্র কি ? আমি অবশ্য বাছাই-এর অপক্ষপাতী নহি সংসারই ত বাছাই করিয়া লয় ; জীবনে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন কিছু পরিমাণে হয়ই ; কিন্তু সেই উদ্বর্ত্তনের ফলে যদি অপেক্ষাকৃত অযোগ্যের সমূহ ক্ষতি হয় তাহা হইলেই সমাজদেহ সেই নীতির দ্বারা কণ্টকিত হইয়া ওঠে।

চারিদিকে পুরস্কারবিতরণী সভার ঘণ্টা দেখিয়া মনে হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি একান্ত উগ্রভাবেই শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৃত্তিপরীক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার দেখিলে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। পুরস্কার দিবার সময় আমরা ভাবিয়া দেখি না যে এই ভাবে বহুতমের যে ক্ষতি করিতেছি তাহা পূরণ করিবার কোন আয়োজনই আমরা করি না। যে

ভাগ্যবান পুরস্কার লাভ করেন তাহাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে গিয়া আমরা সুব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন ধিক্কারের দ্বারা অন্য বহু ছাত্রের প্রতি অবিচার করি। যে ক্ষুদ্র শক্তি অংকুরিত হইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল আমাদের অযত্নে ও অবহেলায় তাহা আপনার উপর বিশ্বাস হারাইয়া অকালেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। অথচ এরূপ অল্পশক্তি লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে তাহারাই ত' সমাজের সংখ্যা-বহুল। যে শক্তিমান্ তাহার শক্তি কর্ম্মে নিয়োজিত করা যত বড় সমস্যা তাহার চেয়েও বড় সমস্যা সংখ্যাবহুল অল্প শক্তি জনসাধারণের সেই অল্প পরিমাণ শক্তি কি ভাবে কর্মে নিয়োজিত করিয়া সফল করিয়া তুলিতে পারা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে আমি অস্বীকার করি না প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি কিছু ফল দেয় কিন্তু সেটা যখন অসংযত উগ্র হইয়া দেখা দেয়, তখন সমাজের অকল্যাণ ঘটে। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা, তাহার পরিণতিও তাহাই। এককালে ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে, ব্যক্তি ও সমাজকে আমরা পরস্পর-বিরোধী সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং য়ুরোপের আদর্শে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেই সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। পাশ্চাত্য জীবনে তাহার উগ্রপ্রকাশের ফলে আমরা সেখানকার সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির যে রূপ দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় কথাটা ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। আমেরিকায় Social planning বলিয়া একটি কথা আজকাল শোনা যাইতেছে ; তাহার অর্থ করা যাইতে পারে সমাজ গঠন। সে দেশের মনীষীগণ বলিতেছেন একটা হিসাব করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া সমাজকে নূতন করিয়া পত্তন করিতে হইবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মিথ্যা দাবী দ্বারা মুগ্ধ হইয়া উচ্ছৃংখলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারাকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না।

ইহা ত গেল এক পক্ষের কথা ; অপর পক্ষের কথাও শোনা যাউক। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলিবেন সংহত সমাজের ব্যক্তির প্রতি অবিচারের কথা ভুলিলে চলিবে না। অনেক সময়েই সামাজিক বিধিবিধান ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই মতের মধ্যে কিছু পরিমাণ সত্য যে আছে তাহা অস্বীকার করিবার

উপায় নাই। যেখানে সামাজিক বিধান ঐশী অধিকারের দাবী করিয়া বসে সেইখানেই দুঃখের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে ইহার উদহরণ না দিলেও চলিবে।

মোটের উপর আমরা দুইটী চরমপন্থার কোনটিই স্বীকার না করিয়া মধ্যপথ গ্রহণ করিব। আমরা বলিব ব্যক্তির প্রতিও আমাদের কর্ত্তব্য আছে সমাজের প্রতিও আমাদের কর্ত্তব্য আছে এবং এই উভয় কর্ত্তব্যের মধ্যে কোনটাকেই ফেলা যায় না।

আমার মনে হয় প্রাচীন ভারতে ব্যষ্টির ও সমষ্টির এই আপাত-প্রতীয়মান বিরোধ সমাধানের একটা চেষ্টা হইয়াছিল চতুরাশ্রম পরিকল্পনায়। সকলেই জানেন আপনার প্রতি ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অধিকার ও যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য প্রথম আশ্রম নির্দিষ্ট ছিল। পরবর্ত্তী আশ্রম পুরোপুরি সামাজিক কর্তব্য পূর্ণ করিবার জন্য বীত হইত। তাহার পর ধীরে ধীরে ব্যক্তি আপনার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের কর্মে আপনাকে নিয়োজিত করিত। শেষ আশ্রমে যতীধর্ম্মী ব্যক্তি সমাজের বাহিরে গিয়া পড়িত; সমাজের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য তখন শেষ হইয়া গিয়াছে তখন তাহার চেষ্টা আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান।

আমার মনে হয় না ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র কোথাও এত সুন্দর ভাবে ব্যক্তির ও সমাজের মিলন বিধানের আয়োজন করা হইয়াছিল।

চতুরাশ্রমের কথা আমরা আজ ভুলিয়াছি; যে সমাজে তাহা প্রচলিত ছিল যে সমাজ ধ্বংস হইয়া গিাছে, সে যুগ, সে কাল চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার কথা লইয়া দুঃখ করিলে চলে না।

তবে যেমন করিয়াই হোক্ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে মিলনসাধন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আজ যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। একদিকে জীর্ণ বিধস্তপ্রায় প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পড়িতে আপনার অধিকার আঁকড়াইয়া রহিয়াছে; সকলেই তাহার শাসন অস্বীকার করিতেছে কিন্তু তবুও বনিয়াদি ঘরের রিক্তবিত্ত বৃদ্ধের মত সমাজ তাহার প্রাচীন গৌরব ভুলিতে না পারিয়া আহত অভিমানে বৃথা আস্ফালন করিতেছে এবং শাসন

জারি করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর একদিকে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার চলিতেছে, সেখানে কোন সংযম নাই, কোন শৃঙ্খলা নাই, বহুর প্রতি কর্ত্তব্য স্বীকার ও পালন করিবার চেষ্টা নাই।

একথা বোধকরি আজ কেহই অস্বীকার করিবেন না যে এখন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে সকল চেয়ে বড় সমস্যা ভাবী সমাজের গঠন। সে সমাজ কিরূপ হইবে, তাহাতে প্রাচীনের কতখানি থাকিবে, নূতন কি কি আনিতে হইবে সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সে সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে যে সে সমাজ সকলের সহযোগিতায় বহুর কল্যাণে সার্থক হইবে; বহুকে বঞ্চিত করিয়া একের কল্যাণ সাধন সে সমাজের আদর্শ হইবে না। সে সমাজে ব্যষ্টির ও সমষ্টির মিলন সাধিত হইবে। ভাবী ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে আমার এই মতের সঙ্গে আশা করি কাহারও মতদ্বৈধ হইবে না।

যদি জাতীয় জীবনের এই আদর্শ স্বীকার করি তাহা হইলে সেই সঙ্গেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে আমাদের শিক্ষার আদর্শও এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে। শিক্ষার আদর্শকে সমাজ গঠনের আদর্শের পরিপোষক করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার ফলে শিক্ষাপ্রণালীর কি রূপান্তর ঘটিবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শিক্ষা ব্যাপারে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে কি ভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করি।

যে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিল তাহার অবস্থা আলোচনা করিলে সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ ভাল করিয়া বোঝা যায়। বিদ্যালাভ করিলে উপার্জ্জনক্ষম হওয়া যায় এ কথাটার বিচার এ ক্ষেত্রে না করিলেও চলিবে। যে বিদ্যালাভ করিয়াছে শিক্ষা সমাপনান্তে সে কোন কোন্ অধিকার লাভ করিল সেটাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমেই চোখে পড়ে অধীতবিদ্য ব্যক্তি সমাজে তাহার স্থান লাভ করে; এতদিন একহিসাবে সে কিছু পরিমাণে সমাজের বাহিরে ছিল, বিদ্যা লাভ করিয়া সে যেন নূতন করিয়া সমাজে প্রবেশ অধিকার পাইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ও তাহারই ভিতর দিয়া সমগ্র মানবসমাজের সকল সম্পদের অধিকার লাভ করিল। পারি-পার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া চলিতে শিখিল;

সামাজিক কর্ত্তব্য পূর্ণ করিবার যোগ্যতা ও দায়িত্ব লাভ করিল। তাহারই সঙ্গে সে শিখিল কেমন করিয়া তাহার নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করিতে হয়; তাহার নিজের যে বিশেষত্ব আছে কেমন করিয়া তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়।

আমি অবশ্য আদর্শ শিক্ষাপ্রণালীর কথা ভাবিয়াই বলিতেছি। দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহার দ্বারা হয়ত ইহার মধ্যে উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা আমার আলোচনার বিষয় নহে।

ক্ষুদ্র শিশু যে ভাবে শিক্ষা আরম্ভ করে তাহার মধ্যেও আমরা সমাজের ও ব্যক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই। যে আবহাওয়ার মধ্যে সে জন্মলাভ করিয়াছে তাহারই সহিত বোঝাপড়া করা, তাহার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়াই তাহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, তাহার শিক্ষা। কথা বলা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সকল চেষ্টার মধ্যে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়। আপনার যে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহার পরিধি বিস্তার করাই যেন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। সেই ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ছাড়াইয়া যেদিন সে বাহিরের জগতের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পাইল সেইদিনই তাহার নবজীবনে দীক্ষা হইল।

শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া; সমাজকে বাদ দিয়া শিক্ষা চলে না। এ সম্বন্ধে আমি প্রসিদ্ধ শিক্ষাতাত্ত্বিক John Dewey-র মত উদ্ধৃত করিতে চাই। তিনি বলিতেছেন—

"All education proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the race. This process begins unconsciously almost at birth, and is continually shaping the individual's powers, saturating his consciousness, forming his habits, training his ideas, and arousing his feelings and emotions. Through this unconscious education the individual gradually comes to share in the intellectual and moral resources which humanity has succeeded in getting together. He becomes an inheritor of the

funded capital of civilisation."

ইহার সারমর্ম্ম এই যে ব্যক্তির সামাজিক বোধে দীক্ষার সঙ্গেই শিক্ষার পত্তন হয়। শৈশবে অলক্ষ্যে এই দীক্ষার ক্রিয়া চলে, ক্রমে সেই ক্রিয়া যখন সুলক্ষ্য ও সুসংবন্ধ ভাবে হয় তখনই সাধারণতঃ আমরা শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝি তাহা আরম্ভ হয়। ডিউই বলিতেছেন, বাল্যে সামাজিক বোধের সহিত ঘাত প্রতিঘাতে অলক্ষ্যে শিশুর শক্তি গঠিত হয়, তাহার অভ্যাস নিরূপিত হয়, তাহার মন বিকশিত হইয়া ওঠে, মতামত গড়িয়া ওঠে, মনের ভাব, অনুভূতি ও বেদনাগুলির গতি নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ভাবেই ধীরে ধীরে শিশু মানবসমাজের আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকার লাভ করে।

আমাদের দেশে শিক্ষা ও দীক্ষা এই দুইটি শব্দ প্রায়ই একত্রে ব্যবহৃত হয়। ইহার কারণ রহিয়াছে; শিক্ষা ও দীক্ষার সম্পর্ক অতি নিকট। দীক্ষার পূর্ব্বে রহিয়াছে শিক্ষা ও শিক্ষার অন্তে রহিয়াছে দীক্ষা। এককথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনে দীক্ষাদান; শিক্ষা না থাকিলে দীক্ষা হইতে পারে না।

এই দীক্ষা একদিকে যেমন ব্যক্তিগত হিসাবে পূর্ণতর জীবনে দীক্ষা আর একদিকে তেমনি সামাজিক জীবনে পূর্ণতর সার্থকতা লাভের দীক্ষা।

আমার এই কথা হইতে বোঝা যাইবে যে আমি ব্যক্তিত্বের বিকাশের পরিপন্থী শিক্ষার পক্ষপাতী নহে। কারণ, শিক্ষার যেমন একটা সামাজিক দিক আছে তেমনি ব্যক্তিগত দিকও আছে; তাহার মূল্য কম নহে। শিক্ষার আরম্ভ ত' ব্যক্তিকে, তাহার দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলিকে লইয়া। এক হিসাবে সামাজিক অবস্থা সেই বৃত্তিগুলির বিকাশের সহায়ক মাত্র। তাহাকে শিশু বৃত্তিগুলির ও বুদ্ধির শান পাথর বলাও চলে; তাহার স্পর্শে আসিয়া সেগুলি তীক্ষ্ন, কার্য্যক্ষম হইয়া ওঠে। তবে যেমন মাটিতে ক্ষুর শান দেওয়া চলে না তেমনি সামাজিক পারিপার্শ্বিক ব্যতীত শিক্ষা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না।

ব্যক্তিত্বের বিকাশের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ আমাদের দিতে হইবে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে কোনমতে খর্ব্ব করিলে চলিবে না। কি ভাবে

শিশু তাহার নিজের গতিতে নিজের ছন্দে জীবন চলিতে পারে সেই শিক্ষা দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। তাহার জন্যে সকল প্রকার আয়োজন আমাদের করিতে হইবে। একথা ভুলিলে চলিবে না যে যে-ভাবী সমাজ আমরা গঠন করিতে চাইতেছি তাহার প্রত্যেক লোকটিকেই স্বাধীন চিন্তাশীল, স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে। যে চিরদিন পরের কথা শুনিয়া চলিতে অভ্যস্ত সে স্বাধীনতা রক্ষণ করিতে পারে না। ভাবী সমাজের একটি কাল্পনিক আদর্শ মনে রাখিয়া তাহারই ছাঁচে সকলকে গড়িয়া তোলা অন্যায়, অসম্ভব। কে জানে সে সমাজ ঠিক কি রূপ ধারণ করিবে। বহতা নদীর মত সমাজ চিরদিনই গতি পরিবর্ত্তন করিয়া চলে। ইহাও প্রাণের লক্ষণ। মানুষের সব চেয়ে কঠিন কাজ পরিবর্ত্তনের সহিত তাল রাখিয়া চলা। এই চলার জন্য প্রয়োজন,—জাগ্রত, বলিষ্ঠ, চলিষ্ণু মন, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি। বাহিরের বিধি-নিষেধের দ্বারা যে মানুষ নিয়ত প্রতিপদে শাসিত হইতেছে তাহার পক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা অসম্ভব। ভুল করিতে করিতেই মানুষ শেখে, ভুল করিতে যে মানুষ ভয় পায়, বুঝিতে হইবে তাহার মনে জড়তা আসিয়াছে। মনের সেই জড়তা ও ক্ষুদ্রতা দূর করিতে হইলে ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে দিতে হইবে। কি করিয়া বলিব যে আজ বিশ বৎসর পরে সমাজে বাস করিতে হইলে কোন্ গুণ-গুলির প্রয়োজন সুতরাং আজ হইতে তাহাদেরই অনুশীলন করিতে হইবে। সেদিন একটা বিশেষ অবস্থায় কোন বিশেষ ভাবে চলিতে হইবে তাহার বিচার আমি আজ কি করিয়া করিতে পারি। সে বিচার করিবে যে শিশু তাহাকে আজ আমি বড় জোর স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করিতে শিখাইতে পারি। আজকার সমাজের প্রশ্নগুলি সমাধান করিতে শিখাইয়া, আজকের সমাজের সহিত বোঝাপড়া করিতে শিখাইয়া ভাবী সমাজের সহিত বোঝাপড়ার ভার তাহারই উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সুতরাং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দাবী ও সমাজের দাবী এই উভয় দাবী মিটাইয়াই আমাদের শিক্ষাপ্রণালী গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে

করিতেই শিক্ষার আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে Dewey বলিয়াছেন—

"The only true education comes through the stimulation of the child's powers by the demand of the social situation in which he finds himself. Through these demands he is stimulated to act as a member of a unity to emerge from his original narrowness of action and feeling, and to conceive of himself from the standpoint of the welfare of the group to which he belongs."

একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়িলে শিশুর সহজাত শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। Dewey-র মতে প্রকৃত শিক্ষা অন্য কোন ভাবে হয় না।

সুইস মনস্তাত্ত্বিক (Jean Piaget) শিশুমনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন শিশু আমিত্বের যে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করাই তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় সমস্যা। সে সমস্যার সমাধান অনুকূল সামাজিক আবেষ্টনের সৃষ্টি।

আমাদের দেশেও কথা আছে "কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে।" নিজের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিব বাস্তবিকই আবেষ্টনের সহিত বোঝাপড়া করিয়া যে শিক্ষালাভ হয় অন্য কোন উপায়ে সে শিক্ষা পাওয়া যায় না।

সুতরাং শিক্ষার জন্য সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হইতেছে অনুকূল আবেষ্টনের সৃষ্টি ; যে আবেষ্টনের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে শিশু-চিত্তের সমস্ত সুপ্ত শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে, তাহার মন শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। ইহার জন্য বিদ্যালয়-সমাজ সৃষ্টি করিতে হইবে। বিদ্যালয়কে আশ্রয় করিয়া যে সমাজ আমরা সৃষ্টি করিব তাহারই আবহাওয়ায়, তাহার সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইবে।

বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার আর একটি কারণ আমাদের উদ্দেশ্য ভারতের ভাবী সমাজ পত্তন। সে ভাবী সমাজের অধিকার লাভ করিবার শিক্ষা আরম্ভ হইবে

ক্ষুদ্রতর বিদ্যালয়-সমাজের অধিকার লাভ করিয়া। সেই ক্ষুদ্রতর বিদ্যালয় সমাজে চলিতে চলিতেই শিশু একদিন বৃহত্তর সমাজে চলিতে শিখিবে। যে সামাজিকতা-বোধ জাগ্রত করিতে পারিলে ভারতের সেই ভাবী সমাজ সকলের সহযোগিতায় বহুর কল্যাণে সার্থক হইয়া উঠিবে। সেই সামাজিকতা-বোধের প্রথম জাগরণ ও পরীক্ষা আরম্ভ হইবে বিদ্যালয়-সমাজে।

কিন্তু বিদ্যালয়ে সমাজ সৃষ্টি করিবার কোন্ আয়োজন আমরা করিয়াছি? আজ বিদ্যালয় বলিতে, একটা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম (Syllabus) এবং সেই পাঠ্যক্রম পালন করিবার জন্য কতকগুলি ছাত্রছাত্রী ও কয়েকজন শিক্ষক ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। বোধ করি একথার মধ্যে বিশেষ অত্যুক্তি নাই। বিদ্যালয়ের কোন জীবন নাই—আধ্যাত্মিক সত্তা নাই। পুঁথির উপর আজিকার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

আমি যে দেশে প্রচলিত প্রবচনের কথা বলিয়াছি তাহাতে ত পড়িয়া শেখার কথার উল্লেখ নাই। কিন্তু আমরা আজ জোর দিয়াছি সেই পড়ারই উপর। বিদ্যাকেই আমরা বড় করিয়া দেখিয়াছি।

কিন্তু বিদ্যা ত সাধ্য নহে, সাধন মাত্র। বিদ্যাদ্বারা জীবন সার্থক করিতে পারা যায় তাই বিদ্যার প্রয়োজন নতুবা নিছক বিদ্যা কোন কাজেই আসে না। বিদ্যাকে সমাজ ও জীবন হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে বিদ্যা ও জীবনের মধ্যে একটি সুগভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। বিদ্যা ব্যর্থ হইয়া যায়। বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগেই বিদ্যার সার্থকতা।

প্রাচীন ভারতের বিদ্যালয়গুলি "আচার্য্যকুল" নামে পরিচিত হইত ও শিক্ষকগণ "আচার্য্য" নামে অভিহিত হইতেন। এই দুইটি শব্দের মধ্যে শিক্ষাতত্ত্বের দুইটি গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং সেই শব্দ দুইটি বিশ্লেষণ করা যাউক।

প্রথমে "আচার্য্য" কথাটা লই। শিক্ষক আচার্য্য, যিনি আচার শিক্ষা দেন, যিনি শিষ্যকে সত্য আচারে দীক্ষিত করেন। ইহার মধ্যে কোথাও "বিদ্যা" শব্দের উল্লেখ নাই। তবে কি মনে করিব সেখানে কোনরূপ বিদ্যাচর্চ্চা হইত না? সে ধারণা মোটেই সত্য নহে। উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থে শিষ্যের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির

তালিকা পাওয়া যায়। তাহা পড়িলে মনে হয় সেখানে যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যার চর্চা ছিল। কিন্তু আচার্যগণ জীবনে বিদ্যার স্থান বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই "আচার" অর্থাৎ জীবনে চলিবার ছন্দকে বড় করিয়া দেখিয়া বিদ্যাকে গৌণ করিয়াছিলেন। "আচার" কথাটা অধুনা-প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থ ধরিলে চলিবে না। ইহার মূলগত অর্থ "চলা" অর্থাৎ গতিচ্ছন্দ।

বিদ্যার চেয়ে জীবন যে বড় সেই জন্যই তাঁহারা জীবনকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। বিদ্যা ত' উপলক্ষ্য, আচারই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের লক্ষ্য আচারকে সংহত, সংস্কৃত ও সুন্দর করিয়া তুলিতে সাহায্য করা।

যেখানে আচারকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান করা হয় সেটাকে বিদ্যালয় না বলিয়া আচার্যকুল বলিতে হয়।

"আচার্যকুল" শব্দের আর একটি গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে ; কুল বলিতে ক্ষুদ্র গোষ্ঠি বা সমাজ বোঝায়। প্রাচীন ভারতের আচার্যগণ জানিতেন সমাজে বাস করিয়াই সমাজ বাস করিতে শিক্ষালাভ করা যায়। আচার্যকুলকে তাঁহারা তাই ক্ষুদ্র অথচ সম্পূর্ণাঙ্গ সমাজে পরিণত করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের তপোবনের যে চিত্র আমরা পুরাতন গ্রন্থগুলিতে পাই তাহা হইতে মনে হয় তপোবনস্থ সমাজ সম্পূর্ণাঙ্গ ছিল। সেখানে আচার্যগণ সপরিবারে বাস করিতেন ; শিষ্যগণ সেখানে আসিয়া আচার্যের পরিবারে যোগ দিত এবং পারিবারিক ও সামাজিক সকল কর্ত্তব্যের অধিকার লাভ করিত। তাহারা গাভীর পরিচর্য্যা করিত, কৃষিকার্যে গুরুর সহায়তা করিত, আবার শাস্ত্রাধ্যয়ন করিত।

তপোবনের এই যে ছবি আমরা পাই তাহা সম্পূর্ণাঙ্গ একটি সমাজের ছবি।

আজ আমরা তপোবন রচনা করিতে পারিব না ; কিন্তু সেখানে শিক্ষার আদর্শ প্রচলিত ছিল, সে আদর্শ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

আপনারা মনে করিবেন না আমি বিদ্যালাভকে ছোট করিতেছি। আমার মতে বিদ্যালাভকে শিক্ষা প্রণালীতে তাহার ন্যায্য স্থান দিতে হইবে। একথা আজ বলা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে যে বিদ্যাদান

শিক্ষায়তনগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। বরং সেটা অন্য একটা কিছুর by-product অর্থাৎ গৌণফল স্বরূপ মনে করিলে বিদ্যা-দান ও লাভ ব্যাপারটি সহজতর হয় এবং লব্ধবিদ্যা জীবনে কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারে। আমার মতে আচার অর্থাৎ জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ বিদ্যালয়গুলির একটি আধ্যাত্মিক সত্তা সৃষ্টি করিতে হইবে।

যদি এমন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় যেখানে ছেলেমেয়েরা আপনা হইতেই জীবনে চলিবার ছন্দ আয়ত্ত করিতে পারিবে, আচার গঠন করিয়া তুলিতে পারিবে, নিজেকে সংযত ও শাসন করিতে শিখিবে, এবং সে শেখার মধ্যে আনন্দ লাভ করিবে, যেখানে পরস্পরের সহযোগিতায় ভাবী সমাজের নাগরিকতার অধিকার অর্জ্জন করিতে শিখিবে তবেই বিদ্যা ও জীবনের সমন্বয় ঘটিবে, জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও চিন্তার মিলন সাধিত হইবে। জীবনের প্রকৃত দীক্ষা মিলিবে!

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় অনুকূল সামাজিক আবেষ্টনের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে। পুঁথির নকল আবেষ্টনের মধ্যে সে শিক্ষা হইতে পারে না।

ইহার জন্য প্রয়োজন অনুকূল আবেষ্টনের অর্থাৎ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র সমাজের। তাহাকেই আমি বিদ্যালয়-সমাজ আখ্যা দিয়াছি।

এইখানে Dewey-র আর একটি মত উদ্ধৃত করিয়া দিই।

"The school is primarily a social institution. Education being a social process, the school is simply that form of community life in which all those agencies are concentrated that will be most effective in bringing the child to share in the inherited resources of the race, and to use his own powers for social ends."

অর্থাৎ শিক্ষাদান মূলতঃ সামাজিক প্রক্রিয়া এবং বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

শিশুকে তাহার অধিকার দান করিবার জন্য ও সমাজের সেবায়

তাহার নিয়োজিত করিবার জন্য যে অনুষ্ঠানগুলি সকল চেয়ে কার্য্যকরী, বিদ্যালয়ে তাহাদেরই সমাবেশ করিয়া ক্ষুদ্র সমাজ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এই সঙ্গে তিনি বলিতেছেন Education is a process of living and not a preparation for future living. অর্থাৎ শিক্ষালাভ জীবন-যাত্রার বিশেষ একটি প্রণালী মাত্র ; ভাবী জীবনের জন্য তৈয়ারি হওয়াকে শিক্ষালাভ বলা চলে না।

তাঁহার এই উক্তিটির একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন ; অনেকে মনে করেন ভাবীকালের জন্য তৈয়ারি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এক হিসাবে ইহা সত্য। কিন্তু যদি বলা যায় আজ ডাঙ্গায় বসিয়া হাত পা ছুঁড়িতে শিখিব তাহার কারণ এই শিক্ষার দ্বারা একদিন জলে সাঁতার কাটিতে পারিব তাহা হইলে কি ঠিক হয় ? যে আজ জীবন-ধারণ করিতে শিখিল না সে ভবিষ্যতে কেমন করিয়া জীবনের পথে চলিতে পারিবে ? ভাবীকালের প্রয়োজন সাধনের জন্য সাঁতার কাটিতে শিখিতে হইলে আজই জলে নামা প্রয়োজন। তেমনি করিয়া ভাবীকালে সমাজে বাস করিতে শিখিতে হইলে আজই সমাজে প্রবেশ করিতে হইবে।

শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের উপযোগী সেই সমাজকেই আমি বিদ্যালয়-সমাজ নামে অভিহিত করিয়াছি। সেখানে দীক্ষা লাভ করিয়াই শিশু ভাবী বৃহত্তর সমাজে দীক্ষা লাভ করিবে। বিদ্যালয়-সমাজ বাহিরের বৃহত্তর সমাজে ক্ষুদ্রতর, সংস্কৃত সংস্করণ। সংস্কৃত কারণ বাহিরে পরিণত বয়স্কের সমাজে যে সকল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে সেগুলির সবটাই অপরিণত-চিত্ত শিশুর বিকাশের পক্ষে কল্যাণকর হয়। সুতরাং তাহার সমাজ পূর্ণভাবে বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছায়া নহে। তবে দুই সমাজের মধ্যে নাড়ির যোগ আছে। যে যোগ বিচ্ছিন্ন করিলে বিদ্যালয়-সমাজ প্রাণহীন হইয়া পড়িবে।

বিদ্যালর-সমাজ সম্পূর্ণাঙ্গ ; বিদ্যাচর্চ্চা সেখানে অন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্যতম। সেখানে উৎসব আছে, আনন্দের আয়োজন আছে, কর্ত্তব্যে দীক্ষা আছে, সৃষ্টি করিবার শিক্ষা আছে। জীর্ণ পুঁথির জীর্ণতর পত্রগুলি পরিপাক করাই তাহার একমাত্র

উদ্দেশ্য নহে।

সেই বিদ্যালয়-সমাজের নাগরিকতার অধিকার লাভ করিয়া শিশু জীবনকে অখণ্ডভাবে দেখিতে ও বিকশিত করিতে শেখ। এবং শিক্ষার সাহায্যেই ভবিষ্যতে একদিন বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করিয়া সহজেই আপনার স্থান করিয়া লইতে পারে।

আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে আমরা কি সেই সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছি?

শিক্ষার আদর্শ

রাজশেখর বসু

আমার শোবার ঘরের পাশে একটা বকুল গাছ আছে, এক জোড়া বুলবুলি আর গোটাকতক শালিক চড়াই তাতে রাত্রিযাপন করে। চৈত্র মাসে নূতন পাতা গজাবার পর তারা প্রায় সকলেই বিতাড়িত হয়, দুটো কাগ এসে গাছে বাসা বাঁধে। নিশ্চয় একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী। কিছুদিন পরে দেখি, বাসার খড়কুটোর মধ্যে একটা কদাকার বাচ্চা প্রকাণ্ড হাঁ করছে, তার মা নিজের ঠোঁট দিয়ে সন্তানের লাল মুখের ভিতর খাবার পুরে দিচ্ছে। শিশু কাগ ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে, তার মুখের ব্যাদান আর রক্তিমা কমে আসে, সে নিজের ঠোঁট দিয়ে মায়ের মুখে থেকে খাবার তুলে নেয়। আরও কিছুদিন পরে দেখি, কিশোর কাগ বাসা ছেড়ে ডালের উপর বসেছে, তার মা তাকে ঠেলা দিচ্ছে, বাচ্চা ভয়ে কা কা করছে, পাখা নাড়ছে, দু পায়ের আঙুল দিয়ে ডাল আঁকড়ে আছে। তারপর তরুণ কাগ হঠাৎ শাখাচ্যুত হয়ে ঝটপট করছে, তার মা নিজের দেহ দিয়ে তাকে সামলাচ্ছে। একজন সাঁতারপটু লোক ছোট ছেলেকে যেমন করে সাঁতার শেখায়, কাগের মা তেমনি করে নিজের বাচ্চাকে উড়তে শেখাচ্ছে।

পাখির যা প্রাথমিক শিক্ষা, ওড়া আর আহার সংগ্রহ, তা সে নিজের মায়ের কাছ থেকেই পায়। বাকী যা কিছু সবই তার সহজ প্রবৃত্তি (instinct) আর অভিজ্ঞতার ফল। মাছ ব্যাঙ সাপ ইত্যাদি নিম্নতর প্রাণী পিতামাতার উপর আরও কম নির্ভর করে, তাদের জীবিকার্জনের সামর্থ্য জন্মগত।

আদিম মানুষ পিতা মাতা আর গোষ্ঠীবর্গের কাছ থেকে জীবন যাপনের উপযোগী সকলপ্রকার শিক্ষা পায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন বেড়েছে, শিক্ষার ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল হয়েছে। আত্মীয়স্বজনের কাছে যা শেখা যায় তা এখন পর্যাপ্ত

নয়, সমাজ আর রাষ্ট্রই নানাপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ইতর প্রাণী আর আদিম মানুষ পিতামাতা ইত্যাদির কাছে যা শেখে তা যতই সামান্য হক, তাদের জীবনযাত্রার পক্ষে পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট। আধুনিক সভ্য মানুষের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাও কি পর্যাপ্ত? অন্য দেশ সম্বন্ধে আলোচনা না করে আমাদের দেশের কথাই বলছি।

প্রচলিত শিক্ষাকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। (১) সামান্য শিক্ষা, যা সকলের পক্ষেই আবশ্যক এবং পরবর্তী শিক্ষার ভিত্তি স্বরূপ গণ্য হয়। (২) বিশেষ শিক্ষা, যা শিক্ষার্থীর রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে নির্ধারিত হয়। (৩) বৃত্তিমুখী শিক্ষা, যার উদ্দেশ্য জীবিকার্জনের উপযোগী কোনও কর্মে জ্ঞান ও পটুতা লাভ।

(১) সামান্য শিক্ষা।—আমাদের দেশে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য যেসব বিষয় নির্দিষ্ট আছে সেগুলিকেই সামান্য শিক্ষার অঙ্গ বলা যেতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী তালিমও সামান্য শিক্ষা, যদিও তার অঙ্গগুলি কিছু অন্যরকম। নিরক্ষর লোকেও জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, কেউ কেউ কোটিপতি ধনী বা সাধু মহাত্মাও হতে পারে, তথাপি বিদ্যার প্রয়োজন চিরকালই স্বীকৃত হয়েছে। এককালে লেখাপড়া বললে বোঝাত ন্যূনতম বিদ্যা অর্থাৎ নামমাত্র লেখা আর পড়া, আর একটু অঙ্ক করা। ইংরেজীতে এরই নাম three R's, reading. writing and rithmetic। এই লেখাপড়া কখনই যথেষ্ট গণ্য হয়নি, শাস্ত্র (অর্থাৎ সুশৃঙ্খল কেতাবী বিদ্যা) না পড়লে মানুষ অন্ধবৎ হয়, একথা বিষ্ণুশর্মা হিতোপদেশ গ্রন্থে বলেছেন—

অনেকসংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকং।
সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ।

অনেক সংশয়ের উচ্ছেদক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রদর্শক সকলের লোচনস্বরূপ শাস্ত্রজ্ঞান যার নেই সে অন্ধই।

এদেশে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত যেসব বিষয়ে পড়ানো হয় তার বার বার পরিবর্তন হয়েছে, তথাপি এইগুলিকে প্রধান অঙ্গ বলা যেতে পারে।—মাতৃভাষা, ইংরেজী, সংস্কৃত, ভারতের ইতিহাস

ও শাসনতন্ত্র, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান ইত্যাদি। এইসব বিদ্যার অল্পমাত্র জ্ঞানও যার নেই সে 'অন্ধ এব', অর্থাৎ তাকে অশিক্ষিত বলা যেতে পারে।

(২) বিশেষ শিক্ষা।—উল্লিখিত সামান্য শিক্ষায় সকলে তৃপ্ত হয় না, অনেকে কয়েকটি বিদ্যা ভাল করে আয়ত্ত করতে চায়। এই বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন নাও হতে পারে। অনেকে কেবল শখ বা জ্ঞানলাভের জন্যই বিদ্যাবিশেষের চর্চা করেন। হাই-কোর্টের জজ ব্যারিস্টার ইত্যাদির মধ্যে গণিত বিজ্ঞান আর সংস্কৃতে উচ্চ উপাধিধারী লোক বিরল নন। এরা যে বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন তা বিচার সংক্রান্ত কাজের পক্ষে অনাবশ্যক।

এক শ্রেণীর বিদ্যাকে ইংরেজীতে বলা হয় humanities। এই সংজ্ঞাটির অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে, লাটিন গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য এর একটি প্রধান অঙ্গ। কয়েকটি আধুনিক বিদ্যাও এর অন্তর্গত, কিন্তু পরীক্ষা-ও-প্রযুক্তি-মূলক বিজ্ঞান (experimental and applied science) নয়। কলেজের পাঠ্য বিষয়কে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, আর্টস্ ও সায়েন্স। সায়েন্সের প্রতিশব্দ আছে—বিজ্ঞান। খবরের কাগজে আর্টস্ স্থানে কলা দেখতে পাই, কিন্তু এই অনুবাদ অন্ধ নকল। আর্টস্ বললে যেসব কলেজী বিদ্যা বোঝায় তাদের কলা নাম দিলে উপহাস করা হয়। আর্টস্ আর হিউম্যানিটিজকে যুক্তভাবে সাহিত্যাদিবর্গ বলা যেতে পারে। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য এবং ইতিহাস জীবনচরিত দর্শন সমাজ সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় সাহিত্যাদির অন্তর্গত।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে কলেজের উচ্চতর শ্রেণীতে বিজ্ঞানেব চাইতে সাহিত্যাদিবর্গের ছাত্র বেশী দেখা যেত। তখন বিজ্ঞ লোকেরা বলতেন, সায়েন্স তো ছেলেখেলা, আসল বিদ্যা হচ্ছে ইংরেজী সাহিত্য, তাব পরে ফিলসফি। এখন রুচির পরিবর্তন হয়েছে, বিজ্ঞানের ছাত্রই আজকাল বেশী। এই পরিবর্তনের কারণ, সাহিত্যাদি শিখলে জীবিকার্জনের যত সম্ভাবনা, বিজ্ঞান শিখলে তার চাইতে বেশী। ভারত সরকার শিল্পবর্ধনের ব্যাপক পরিকল্পনা করেছেন, তার ফলে বিজ্ঞানীর চাকরি পাবার সম্ভাবনা বেড়ে গেছে।

অর্থবিদ্যা (economics), বাণিজ্য (commerce) প্রভৃতি বিশেষ বিদ্যাও আজকাল জনপ্রিয় হয়েছে, শিখলে জীবিকার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

(৩) বৃত্তিমুখী শিক্ষা।—এই শ্রেণীর শিক্ষা হাতেকলমে না শিখলে সম্পূর্ণ হয় না। আইন আর এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বৃত্তিমুখী কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। ডাক্তারি শিক্ষার পদ্ধতিকেই প্রকৃতপক্ষে বৃত্তিমুখী বলা চলে। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র রোগীর সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসেন, চিকিৎসা কার্যেও সাহায্য করেন, সেজন্য তাঁর বৃত্তির উপযোগী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়। চার্টার্ড অ্যাকাউ-ণ্ট্যাণ্ট পদের শিক্ষার্থীও ভবিষ্যৎ মক্কেল শ্রেণীর সম্পর্কে আসেন, সেজন্য তার শিক্ষাও যথার্থ বৃত্তিমুখী। আইন শিক্ষার্থীকে যদি বাদী-প্রতিবাদীর সম্পর্কে আনা হত এবং মকদ্দমা চালাবার কিছু ভার দেওয়া হত, এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার্থীকে দিয়ে যদি নূতন ব্রিজ, বাঁধ বা কারখানার প্ল্যান এস্টিমেট আর তদারকের কাজ কিছু কিছু করানো হত, তবেই তাঁদের শিক্ষা যথার্থ বৃত্তিমুখী হত।

মানুষের শৈশব যার আরম্ভ হয় এবং জীবিকানির্বাহের উপযোগী কর্মে নিয়োগ পর্যন্ত যা চলে, তাতে যথাসম্ভব শরীর আর মনের উৎকর্ষ এবং অর্থোপার্জনের যোগ্যতা লাভ হয়, সেই সমগ্র শিক্ষাই পর্যাপ্ত শিক্ষা। এরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য—সকল লোকের সামর্থ্য অনুযায়ী বিদ্যা আর জীবিকার বিধান। শুনতে পাই সোভিএট রাষ্ট্রে সমস্ত প্রজার জন্য এই ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেখানে কর্ম নির্বাচনে প্রজার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কতটা গ্রাহ্য হয় জানি না। ভারতে এবং অন্যান্য সকল দেশে অল্প-সংখ্যক প্রজাই সরকারি কাজ পায়, বাকী সকলকেই নিজের চেষ্টায় জীবিকার যোগাড় করতে হয়। আমাদের দেশে সকলে কাজ পায় না, সেজন্য বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে!

বন্দে মাতরম্ স্তোত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশকে ধরণীং ভরণীং বলেছেন, অর্থাৎ বঙ্গমাতা তাঁর সন্তানগণকে ধারণ করেন, ভরণও করেন। এখন নানা কারণে আমাদের মাতৃভূমির ধারণ ও ভরণের ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। সকল প্রজার উপযুক্ত পর্যাপ্ত শিক্ষা আর জীবিকার সংস্থান শীঘ্র সম্ভাব্য না হলেও কল্যাণ রাষ্ট্র বা ওয়েল-

ফেয়ার স্টেটের লক্ষ্য তাই হওয়া উচিত।

শিক্ষা যদি পর্যাপ্ত বা বৃত্তিমুখী নাও হয় তথাপি জীবিকার্জনের উপযোগী হতে পারে। যাঁরা কেবল সাহিত্যাদি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন তাঁরাও রাষ্ট্রের অতি উচ্চ পদ পেতে পারেন, সরকারী বিভাগের অধিকর্তা, রাজনীতিক, অধ্যাপক, লেখক, সম্পাদক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হতে পারেন। যাঁরা বিজ্ঞানাদি বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করেন অথবা বৃত্তিমুখী শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের জীবিকার ক্ষেত্র অবশ্য আরও বিস্তৃত।

আমাদের শিক্ষালাভের তিনটি পর্যায় আছে—(১) পাঠশালা ও স্কুল, (২) কলেজ (৩) বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া, প্রায়োগিক (technical) ও বৃত্তিমুখী শিক্ষার জন্য কতকগুলি পৃথক শিক্ষালয় আছে, যেমন মেডিক্যাল, এঞ্জিনিয়ারিং ও ল কলেজ, চারু ও কারু শিল্প বা arts and crafts-এর শিক্ষালয়, সংগীত শিক্ষালয় ইত্যাদি। এই প্রকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত।

ইংরেজী ইউনিভার্সিটি শব্দের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দ রচিত হয়েছে। এই বৃহৎ শব্দটির বদলে একটি ছোট নাম চালাতে পারলে সকলেরই সুবিধা হয়। বিদ্যামণ্ডল, বিদ্যাচক্র, বিদ্যাকুল, এইরকম কিছু চালানো যায় না কি?

নামের আদিতে বিশ্ব থাকলেও তার মানে এ নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবতীয় বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষণীয় বিষয় আর শিক্ষার্থীর বাহুল্য হলে সকল ক্ষেত্রে ফল ভাল হয় না। প্রাচীনকালের কুলপতি বিপ্রর্ষিরা তাঁদের আশ্রমে নাকি দশ সহস্র মুনিকে পালন করতেন আর শিক্ষা দিতেন। নালন্দা প্রভৃতি বিহারেও অসংখ্য বিদ্যার্থী থাকত। তিন-চারশ বৎসর আগেও বিদ্যার্থীর সংখ্যা কম ছিল, মেধাবী লোকে চেষ্টা করলে সর্ববিদ্যাবিশারদ হতে পারত। কিন্তু এখন বিদ্যার (বিশেষত বিজ্ঞানের) শাখা প্রশাখা অত্যন্ত বেড়ে গেছে, আজকাল সর্বজ্ঞ বা বহুজ্ঞের চাইতে বিশেষজ্ঞের আদর বেশী। ইংরেজীতে একটি পরিহাস আছে—বিশেষজ্ঞ তাঁকেই বলে যিনি অল্প বিষয় সম্বন্ধে বিস্তর জানেন। অতএব গণিতের পদ্ধতি অনুসারে বলা চলে—শূন্য

বিষয় সম্বন্ধে যাঁর অনন্ত জ্ঞান আছে তিনিই চরম বিশেষজ্ঞ।

সেকালের অসংখ্য বিদ্যার্থী সমন্বিত ঋষিকুল বা বিহারের অনুরূপ ব্যবস্থা এখন অচল। যেখানে কয়েকটি বিদ্যার প্রকৃষ্ট চর্চার ব্যবস্থা আছে সেই বিদ্যামণ্ডলই প্রশস্ত। অতিকায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যাঁরা প্রধান তাঁরা যদি প্রশাসন বা পরিচালন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তবে অধ্যাপনা উপেক্ষিত হবে।

পাশ্চাত্য দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার খ্যাতি আছে। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা আয়ুর্বেদ চর্চার জন্য, উজ্জয়িনী জ্যোতিষের জন্য, মিথিলা জনক রাজার কালে আধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য এবং পরবর্তীকালে ন্যায়শাস্ত্র চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানকালে আমাদের দেশেও বিভিন্ন বিদ্যামণ্ডলের বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়। সকল বিশ্ববিদ্যালয় একই ছাঁচে গড়ে উঠলে ফল ভাল হবে না।

বিশ্বভারতী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। শুনতে পাই সেখানকার শিক্ষার ব্যবস্থা কি রকম হওয়া উচিত তা নিয়ে প্রবল মতভেদ আছে। এক দল নাকি বলেন, সেকেলে আশ্রমিক ব্যবস্থা চলবে না, এখন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি মেনে নিতে হবে। আর একদল বলেন, গুরুদেবের যে আদর্শ ছিল, তিনি যে রীতি চালিয়ে গেছেন তা থেকে কিছুমাত্র স্খলন হলে বিশ্বভারতী পণ্ড হবে।

প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ আর তাঁর প্রবর্তিত রীতির অনুসরণ করলে বিশ্বভারতীর অগ্রগতি ব্যাহত হবে—এই ধারণার কারণ দেখি না। কলিকাতা প্রভৃতি অতিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যা শেখানো হয়, উচ্চ বিজ্ঞানাদি শেখাবার যে রকম ব্যবস্থা আছে, বিশ্বভারতীতে ঠিক সে রকম না হলে ক্ষতি কি? কবিগুরুর জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আর বিশ্বভারতীতে যা শিক্ষণীয় ছিল তা প্রধানত সাহিত্যাদি বিদ্য—হিউম্যানিটিজ ও আর্টস্, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাসাদি, তা ছাড়া চিত্র সংগীত ইত্যাদি চারুকলা আর কয়েকটি কারুকলা। শিক্ষার সেই বৈশিষ্ট্য আর পরিধি বজায় রেখেই বিশ্বভারতীর অগ্রগতি ও বিবৃদ্ধি হতে পারে। পূর্বে যে সামান্য শিক্ষার কথা বলেছি (যা সকলের পক্ষেই

অপরিহার্য) তারই অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞান শিক্ষার সীমা যদি আই এস-সি শ্রেণী পর্যন্তই রাখা হয় এবং বহুবিধ বিজ্ঞান চর্চার আয়োজন যদি নাও হয় তাতেই বা ক্ষতি কি ? যেসব ছাত্র উচ্চতর বিজ্ঞান অথবা চিকিৎসা বাস্তুবিদ্য যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি প্রয়োগিক বা বৃত্তিমুখী বিদ্যা শিখতে চায় তারা কলকাতায় বা অন্যত্র শিক্ষালাভ করতে পারে। Liberal education বা উদার শিক্ষা বা polite learning বা ভব্য শিক্ষা বললে যা বোঝায় তাই বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য হতে পারে। কবিগুরুর যা একান্ত কাম্য ছিল—বিভিন্ন দেশের মনীষীদের চিন্তার আদান-প্রদান, বিশ্বভারতী যদি সেই মিলনের ক্ষেত্র হয় তা হলেও তার প্রতিষ্ঠা সার্থক হবে।

গাছতলায় বা ফাঁকা জায়গায় বিনা চেয়ার টেবিলে পঠন-পাঠনের পদ্ধতি যথাসম্ভব বজায় রাখলে বিশ্বভারতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। প্রাসাদের বদলে আটচালাতেও উচ্চ শিক্ষা চলতে পারে। বাহ্য আড়ম্বরের চাইতে বিদ্বান কুশলী ও সন্তুষ্ট অধ্যাপকবর্গের প্রয়োজন অনেক বেশী। পণ্ডিত নেহেরু সম্প্রতি-এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সকল বিদ্যাস্থান সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা

বিনয় কুমার সরকার

গ্রীক সমাজ এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সঙ্গমভূমিতে অবস্থিত হইয়া যতদিন জীবিতভাবে বিস্তৃত ও বিকাশ লাভ করিতেছিল ততদিন এক এক স্থানে এবং এক এক সময়ে এক এক সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিল। গ্রীসদেশের আদিমবাসিগণের অথবা মিশর-বাসিগণের এবং পারস্যের করদরাজ্য সমূহের সহিত সংঘর্ষণে এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের চিন্তা ও কর্ম্মের আদান-প্রদানে গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাজ্য সকল মানবের সভ্যতা-ভাণ্ডারে নিজ নিজ দাতব্য দান করিয়াছে। এজন্য গ্রীকগণের সভ্যতা সময়ের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক শক্তিপুঞ্জের গুণে রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের চিহ্ন তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে লক্ষিত হয়। সমাজের কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্যকেই অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য সাধনো-পায় শিক্ষা পরিপালিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে গ্রীস এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপ সকল ইউরোপা-গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আর্য্যগণের স্থায়ী আবাসভূমি হইয়াছে। নূতন স্থানে নূতন ধর্ম্ম, নূতন সমাজ, এবং নূতন দেশ গঠিত হইয়াছে। ভূমধ্য সাগর হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত গ্রীক বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিশেষ সভ্যতার গণ্ডী বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় "বর্ব্বর" সমাজসমূহের আঘাত পাইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ সকল নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য ভাষা, সাহিত্য, উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় ঐক্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। নানা জাতি এবং নানা দেশ দেখিয়া তাহাদের চিন্তার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থানে স্থানে বিশ্বের নিগূঢ় তত্ত্বসম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা হইয়াছে। মিলেটাস, সামস্, ইলিয়া প্রভৃতি স্থানে সৃষ্টি ও জীবন লইয়া দর্শনবাদ উদ্ভূত হইয়াছে বটে; কিন্তু এখনও তাহাদের সমাজে ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে ভক্তির হ্রাস

হয় নাই। হোমার ও হীসিয়ডের কাব্য গ্রন্থসমূহ এখনও ধর্ম্ম-শাস্ত্ররূপে বিবেচিত হইতেছে। ইতিমধ্যে গ্রীকভাষাভাষিগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য রচিত হইয়াছে। বীরকাহিনী ও মহাকাব্য ব্যতীত সাধারণ কাব্য হৃদয়োচ্ছ্বাস, শোকগীতি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক গান প্রভৃতিতেও গ্রীক চিত্ত স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। লেখক বা গায়কগণ যে কোন দেশ বা উপনিবেশ বা দ্বীপবাসীই হউন না কেন, সকলেই সমস্ত হেলেনী জাতির আদরের ও সম্মানের পাত্র। আর্কিলোকাস, স্যাফো, সোলন, লিয়াগ্রস, সাইমনাইদিস প্রভৃতি কবিগণকে অলিম্পিয়া, কোরিন্থ, ডেল্‌ফি প্রভৃতি স্থানের জাতীয় উৎসব সকল গ্রীকজগৎবিশ্রুত করিয়াছে। ফিনিসীয়গণ ইহাদিগকে লিখিতে শিখাইয়াছে এবং পোত নির্ম্মাণ করিতে শিখাইয়াছে। মিসরীয়েরা অনেক ব্যবহারিক শিল্প শিখাইয়াছে। যদিও এখন পর্য্যন্ত গ্রীক জাতির পরীক্ষা আরম্ভ হয় নাই বলা যাইতে পারে, পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার দাবী করিবার অধিকারী ইহারা এখনও হয় নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে চিন্তার ও কর্ম্মের যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা যে শক্তির বশবর্তী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে চালিত হইয়াছে তাহা এক বিশাল সভ্যতাস্রষ্টাজাতির শৈশবব্যবস্থার নিন্দনীয় পরিচায়ক নহে।

এথেন্স এখনও তাহার নিজ পথে বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। থীব্‌স্‌ প্রভৃতি অন্যান্য সমাজ এখন অতি সামান্য অবস্থায় রহিয়াছে। হেলেনী জাতির মধ্যে যাঁহারা ভবিষ্যতে আদর্শে, রাষ্ট্রকার্য্যে অথবা শিক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাঁহাদের এখনও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। সিসিলিতে উপনিবেশ স্থাপন এখনও সমাপ্ত হয় নাই। এই সময়ে স্পার্টার সমাজ ও রাষ্ট্রবিশেষ উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছে। স্পার্টা এখন কাব্য, সঙ্গীত ও সাহিত্যের কেন্দ্র। বিদেশ হইতে কবি ও গায়ক আসিয়া স্পার্টায় বাস করিতেছেন, এবং স্পার্টাবাসিগণ এখন যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ভবিষ্যতে তাহার উন্নতি অথবা পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিলেই চলে। সুতরাং স্পার্টার শিক্ষা প্রণালী গ্রীকগণের প্রথম অবস্থার নিদর্শন।

হেলট ও পীরিকাই প্রভৃতি অসংখ্য দাসগণের মধ্যে অবস্থিত হইয়া এবং চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতাবৃত থাকিয়া স্পার্টার ক্ষুদ্র ডোরীয়

সমাজকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য অনেক বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকিতে হইত। সর্ব্বদা বিদ্রোহদমন ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত বলিয়া সংযম ও নিয়ম পালনই একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তিকে সামরিক জীবন গঠন করিতে হইত। কাহারই ব্যক্তিগত বিকাশের সুবিধা বা আদেশ ছিল না। এই কারণে স্পার্টার রাষ্ট্রনীতিসংস্থাপক লাইকার্গাস যে শাসনপ্রণালী প্রচলন করিয়াছিলেন তাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক আইনও বলা যায়, অথবা শিক্ষাসম্বন্ধীয় আইনও বলা যায়। রাষ্ট্রই শিক্ষালয় ছিল এবং রাষ্ট্রের উন্নতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। কাজে-কাজেই প্রজাশাসনপদ্ধতি মানিতে যাইয়া সকলকেই শিক্ষার নিয়ম পালন করিতে হইত। চিরকালই সকলকে তত্ত্বাবধায়কদের অধীনে ছাত্রের মত ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় থাকিতে হইত। স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার অথবা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অথবা নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার বন্দোবস্ত ছিল না। এমন কি সামরিক জীবনের অনুপযুক্ত হইলে কাহারও বাঁচিবারই অধিকার ছিল না। অতি শৈশব কাল হইতেই বালকবালিকাগণকে সাধারণ আয়তনে বাস করিয়া রাজপুরুষগণের অধীনে ব্যায়াম মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শারীরিক উৎকর্ষ সাধনোপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে হইত। আয়তনে ভোজনের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে যথোচিত অন্ন অথবা অর্থ সাহায্য করিতে হইত। পরিবারের অথবা জনক জননীর সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল না। প্রথম হইতেই যশ ও আত্মসম্মানের আকাংক্ষা হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দেওয়া হইত। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক সাহসোদ্দীপক ও চিত্তোন্মাদক সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইত।

সকলকে দলবদ্ধ হইয়া কোরাসে নৃত্য গীতাদি সম্পন্ন করিতে হইত। স্বাধীনভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কেহই বিদ্যাচর্চ্চা করিতে পাইত না। গ্রীসের সর্ব্বত্র নূতন ছন্দ, নূতন বাদ্যযন্ত্র, নূতন সুর আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং একদেশ হইতে আর একদেশে প্রবর্ত্তিত হইত। কিন্তু এখানে অতিপুরাকালে যে যন্ত্র, যে প্রথা, ও যে ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার আর উন্নতি সাধিত হয় নাই। লাই-কার্গাস হোমারের কাব্য সকল আনাইয়াছিলেন এবং তার্পেন্দার

হোমারের কয়েক অংশ স্বীয় সঙ্গীত কাব্যের সহিত মিলাইয়া দিয়াছিলেন। স্পার্টার সঙ্গীত বিদ্যা চিরকাল এই অবস্থাতেই বর্ত্তমান ছিল। এখানে নাট্য আদৌ প্রবেশ করে নাই। আল্‌কমান, আলেটাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণের গীত, সুর, তাল ও যন্ত্র বাদ্যকারগণ বংশানুক্রমে বজায় রাখিয়াছিল।

এরূপ শিক্ষার সমস্ত খরচ রাজকোষ হইতে নির্ব্বাহিত হইত। আর বস্তুতঃ এই শিক্ষায় কোন ব্যয়ই হইত না। শিক্ষকগণ স্বয়ং সেনাবিভাগের কর্ম্মচারী—আইরেন নামে অভিহিত। ছাত্রাবাস প্রকাণ্ড সৈনিকাগার। বেশভূষা, আহার, শয়ন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই আইরেনগণ ছাত্রগণের প্রতি কঠোর আদেশ করিতেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর বিবাহ করিবার নিয়ম ছিল বটে ; কিন্তু গৃহবাসের অধিকার ছিল না। আবার ছাত্রাবস্থার মত নাগরিক অবস্থায়ও সাধারণের সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া দলবদ্ধ ভাবে বাস করিতে হইত।

এই সর্ব্বব্যাপী কঠোরতা, নিয়মপালনও শাসনাধীনতার মধ্যে হৃদয়ের কোমল ভাবের আইনতঃ কোন স্থান ছিল না। ছাত্রাবাসে থাকিতে থাকিতে আইরেনগণের সহিত ছাত্রগণের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইত। এই সম্বন্ধই জীবনের মধ্যে একটু মধুরতার রেখা পাত করিত।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই নিয়ম ছিল। তাহাদিগকে বলিষ্ঠ ও সাহসী পুত্রগণের জননী করিবার জন্য তাহাদিগের প্রতি শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছিল। তাহাদিগকে প্রকাশ্য ভাবে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া কুস্তী করিতে হইত, দৌড়াদৌড়ি করিতে হইত এবং নৃত্যগীত করিতে হইত। কিন্তু পুরুষের ন্যায় তাহারা সাধারণ আয়তনে ভোজন না করিয়া নিজ গৃহেই ভোজন করিত।

সর্ব্বদা বিদ্রোহিগণের মধ্যে থাকিয়া এবং বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া স্বদেশ ও সমাজের রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দলে দলে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে উপযুক্ত হইবার জন্য এইরূপ শিক্ষারই প্রয়োজন হইয়াছিল।

কিন্তু ইহাতে শারীরিক বলেরই উপাসনা করা হইয়াছে। স্পার্টাবাসিগণ বাণিজ্যক্ষেত্রে, রাজনৈতিক চিন্তায়, সাহিত্য এবং দর্শনে

কিছুই প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের আদৌ বিকাশ হয় নাই। নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনে তাহারা নাবালক ছিল বলিলেই চলে। এবং এমন কি বাল্যকাল হইতেই পরস্বহরণ করিতে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত ছিল।

তাহারা পারস্যসম্রাটের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিল এবং থার্ম্মপলির যুদ্ধে চিরস্মরণীয় রহিয়াছে। মৃত্যু নিশ্চিত বুঝিয়াও লেওনিদাস এবং তাঁহার তিন শত পদাতিক হপ্‌লাইট্‌ যুদ্ধক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে জীবন দান করিতে যে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের আশৈশব জাগরিত কর্ত্তব্যবোধের ফলে। স্পার্টার বীরত্ব সমসাময়িক প্রবাদরূপে পরিণত হইয়াছিল। এমন কি থুসি-দিদিস. প্লেটো, এরিষ্টটল, জেনোফন, প্লুটার্ক প্রভৃতি চিন্তাবীরগণ তাঁহাদের শাসনপ্রণালী, সংযমপ্রিয়তা, নিয়মাধীনতা এবং সাধারণ স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ নীতির প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ তাহাদের শিক্ষানীতি কি ভাবে বিবেচিত হইত এবং তাহারা গ্রীক সমাজে কিরূপ স্থান অধিকার করিত, থুসিদিদিস তাহার এক বিবরণ দান করিয়াছেন। কোরিন্থীয়গণ স্পার্টাবাসি-গণকে এথেন্সের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য তাহাদের দোষ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিল—"তোমরা সর্ব্বদাই একই পথে চলিয়া থাক। নিয়মানুসারে তোমরা পরিবর্ত্তন করিতে পার না। তোমাদের যাহা কিছু আছে তাহাই রক্ষা করিবার জন্য তোমরা ব্যস্ত। নূতন কিছু উদ্ভাবন করিবার তোমাদের প্রবৃত্তি হয় না, শক্তিও নাই। অবস্থা বুঝিয়া তোমরা ব্যবস্থা করিতে পার না, যথাসময়ে তোমরা কার্য্য করিতে পার না। শেষ মুহূর্ত্তে কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাক। এবং শক্তিমান হইয়াও দুর্ব্বলের মত সন্দেহ কর। তোমরা আশান্বিত ও উৎসাহিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পার না। তোমরা অসাধারণ ধীশক্তি অথবা কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেশের অনিষ্টকারক বলিয়া মনে কর।"

প্রজাতন্ত্র ও স্বরাজ স্থাপন, বাণিজ্য বিস্তার, স্বদেশোদ্ধার, স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, শিল্প, সাহিত্য ও জড় বিজ্ঞানের পুষ্টি সাধন, সাম্রাজ্য স্থাপন, গৃহবিবাদ, রাজনৈতিক শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন, দর্শন চর্চ্চা প্রভৃতি যাহা কিছু গ্রীকগণের নিকট হইতে মনুষ্য

সমাজ লাভ করিয়াছে সমস্তই খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ঘটিয়াছে। এবং এই সমস্ত বিষয়ের এথেন্সের প্রাধান্য ছিল।

এই সময়ের মধ্যে এথেন্সেই গ্রীসের অন্তরতম গ্রীস। সুতরাং এথেন্সের শিক্ষা প্রণালী গ্রীকগণের উন্নত অবস্থার নিদর্শন।

এথেন্সের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক চরমোন্নতির সময়ে যখন সমস্ত গ্রীক সমাজে গৃহবিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল সেই সময়ে স্পার্টার সহিত প্রথম যুদ্ধে মৃত এথিনীয় সৈন্যগণের সমাধি উপলক্ষে সকল নাগরিকগণকে লক্ষ্য করিয়া পেরিক্লীস যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ স্বরূপ থুসিদিদিস লিখিয়াছেন—"আমাদের শত্রুপক্ষীয়গণ শৈশব হইতে কঠোর পরিশ্রম করে, এবং ইহাই তাহাদের একমাত্র শিক্ষা। কিন্তু আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি—কঠোরতার সহিত জীবন যাপন করি না। অথচ তাহাদের মত আমরা কষ্টসহিষ্ণু। * * * আমরা সৌন্দর্য্য ভাল বাসি, অথচ আমাদের বাহুবলের এবং চারিত্র শক্তির অবনতি হয় না। * * * আমরা রাষ্ট্রকর্ম্মে উদাসীন ব্যক্তিকে দোষী মনে করি না, তাহাদের জীবন নিষ্ফল ও নিরর্থক মনে করি। * * * এথিনীয়গণ আপনাদিগকে নানাবিধ বিচিত্র কর্ম্মের উপযোগী করিতে বিশেষ পারদর্শী। * * * এথেন্স হেলারের শিক্ষালয় ও সভ্যতার কেন্দ্র।"

বাস্তবিক এথেন্সের শিক্ষা প্রণালী স্পার্টার শিক্ষা প্রণালী হইতে সর্ব্বতোভাবেই উদার ও প্রশস্ত ছিল। এখানে সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। পারিবারিক জীবনের লোপ হয় নাই। প্রথম হইতেই এথিনীয়গণ পৃথিবীর সকল ভাব ও শক্তির দ্বারা চরিত্র গঠনের বন্দোবস্ত করিয়াছিল! এজন্য সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশের জন্য তাহারা প্রস্তুত থাকিত। এবং সকল বিষয় হইতেই শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করিত। এজন্য সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস, সঙ্গীত, কাব্য, বিজ্ঞান অলঙ্কার প্রভৃতি সকল বিষয়েই এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। স্পার্টার মত এথেন্সেও শারীরিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল বটে কিন্তু ইহা একমাত্র শিক্ষা ছিল না। এখানেও সঙ্গীত চর্চ্চার প্রাধান্য ছিল।

এই শিক্ষা প্রণালী সর্ব্বদা এক অবস্থায় ছিল না। সময়ের

পরিবর্ত্তনে, সমাজের সাধারণ সভ্যতার ক্রমিক বিকাশ ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক, শিক্ষালয় শিক্ষার বিষয়ের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পেরিক্লিসের আদর্শ তাঁহার জীবিত কালে কেবল আকাঙ্ক্ষা বা আশামাত্র রূপে ছিল—কার্য্যে পরিণত হয় নাই। রাজনৈতিক অবনতির পর এথেন্স বাস্তবিকই সমগ্র গ্রীক জগতের বিদ্যালয় হইয়াছিল।

ইহারা স্বভাবতঃই অনুসন্ধিৎসু এবং কর্ম্মতৎপর ছিল। স্পার্টায় যখন যোদ্ধা ও কুস্তীগীর প্রস্তুত হইতেছিল, যখন স্পার্টা-নাগরিকগণ তাহাদের চিরন্তন সামরিক প্রথা পালন করিতে যাইয়া আষ্টে পৃষ্ঠে বদ্ধ হইয়া জগতের অভিনব নিত্য নূতন সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অবসর পাইত না, সেই সময়ে তাহাদেরই স্বজাতীয় আইয়োনীয় শ্রেণী আটিকার সমুদ্রকুলোপবর্ত্তী স্থানে ধীরে ধীরে চিন্তা ও কর্ম্মের বিপ্লব করিবার সূচনা করিতেছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ হওয়ায় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক শক্তির নূতন সমাবেশ ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া এথেন্সের নেতৃবর্গ শাসনকর্ম্মে সাধারণের অধিকার প্রদানে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সোলন ও ক্লীস্হেনীস্ এথেন্স নগরে প্রজাতন্ত্র শাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

প্রথম হইতেই এথেনীয় সমাজে শিক্ষার অত্যন্ত আদর ছিল। সন্তানগণের শিক্ষা সম্বন্ধে পিতা মাতা, ধাত্রী, দাস, সকলেই উদ্বিগ্ন থাকিত। এবং সোলনের নিয়মানুসারে পিতা পুত্রের শিক্ষা প্রদান বিষয়ে উদাসীন থাকিলে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের অর্জ্জনে কোন দাবী করিতে পারিত না। শিক্ষক ও শিক্ষালয় গ্রীকসমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করিত। এ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল বলিয়া এথিনীয়েরা যখন জার্ক্সেসের হস্তে দেশ সমর্পণ করিয়া ট্রীজনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল সেই সময়ে ট্রীজনবাসীরা ব্যবস্থাপক সভায় স্থির করিয়া অতিথিগণের অল্পবয়স্ক বালকদিগের শিক্ষকের বেতন দান করিয়াছিলেন।

এথেন্সের কোন বিদ্যালয় রাজকোষ হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইত না, অথবা শিক্ষার সহায়তা করিবার সরকার হইতে কোন খরচ হইত না। অথচ দরকার হইলেই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যুদ্ধে

যাইতে হইত। কাজে কাজেই প্রত্যেককে নিজ নিজ সুবিধানুসারে সাধ্যমত উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে হইত। অভিভাবকগণ শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন, শিক্ষকেরা ছাত্রদত্ত বেতনের উপর নির্ভর করিতেন এবং নিজব্যয়ে বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ, সাজসজ্জা, বেঞ্চ, টুল, চেয়ার শিক্ষার উপকরণ প্রভৃতির সংস্থান করিতেন।

বিদ্যালয়সমূহ সরকারের অধীনে ছিল না বটে, তাহাদিগকে সরকারের নিয়মানুসারে শাসন পালন করিতে হইত। সোলন বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে বিধি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহতে শিক্ষণীয় বিষয় অথবা শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কোন নিয়ম করেন নাই। তিনি বালক ও ছাত্রদিগের নৈতিক চরিত্রের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাহাদের দৈনিক জীবন কখন কোথায় কিভাবে চালাইতে হইবে কেবল এই বিষয়েই অনুশাসন করিয়াছেন। অভিভাবকেরাও ছাত্রদিগকে সংযম ও নিয়ম পালন শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টিত হইতেন। এইজন্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিবার সময় গুরুমহাশয়কে নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেন। কাজে কাজেই এই সকল বিদ্যালয়ে অতি কঠোর নিয়ম পালিত হইত। পরবর্ত্তী যুগে যখন সোফিষ্টদের প্রভাবে সংযম পালন বিষয়ে ছাত্রদিগের শৈথিল্য জন্মিয়াছিল তখন আরিষ্ট ফেনিস ছাত্রদিগের অবনতি দেখিয়া এই সময়কার অবস্থা স্মরণ করিয়াছিলেন—"বালকগণ তখন নগ্নমস্তক ও নগ্নপদে বিদ্যালয়ে আসিত। শৃঙ্খলার সহিত যাওয়া আসা করিত। শিক্ষা সম্বন্ধে অনিয়ম করিলে অতিশয় নিপীড়িত হইত।"

বিদ্যালয় সমূহের মাসিক বেতন অতি অল্প ছিল বলিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই শিক্ষালাভের সুবিধা ছিল। কিন্তু বালিকাগণ স্পার্টায় যেরূপ বালকদিগের সহিত একই শিক্ষা পাইত এখানে সেরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। এথেন্সে স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা ছিল না। বালিকারা লোকসমাগমে বাহির হইতে পাইত না।

দাস এবং মজুরেরা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইত। বৃদ্ধ দাসেরা বালকদিগকে বিদ্যালয়ে লইয়া যাইত এবং সকল বিষয়ে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিত। কর্ম্মঠ দাসগণ প্রভুসমাজের অভাব মোচন করিবার জন্য শারীরিক পরিশ্রম করিত।

নাগরিকদিগের সন্তানেরা দিনের মধ্যে একবার ব্যায়াম বিদ্যালয়ের এবং একবার সঙ্গীত বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত। প্রত্যুষে উঠিয়া কিঞ্চিৎ ভোজনের পর পেডাগগ অর্থাৎ শিক্ষক শ্লেট, পুস্তক এবং বীণা হস্তে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইত। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মানসিক ও শারীরিক অনুশীলনের পর স্নানাহারের সময় ছিল। অপরাহ্নে পুনরায় দাস সমভিব্যাহারে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে যাইত। অনেক সময়ে ধনীব্যক্তির ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে না যাইয়া নিজগৃহেই পেডাগগ দাসের কাছে লিখিতে পড়িতে এবং গণনা করিতে শিখিত।

সকল গ্রীকেরা এবং এমন কি আরিষ্টটল প্লেটো সঙ্গীত বিদ্যার এত আদর করিতেন যে ইহাকে নৈতিক শিক্ষার অঙ্গ মনে করিতেন। শারীরিক ব্যায়াম যেমন বাহ্য অঙ্গের সৌসাদৃশ্য প্রদান করে সঙ্গীতও তেমনি অন্তরঙ্গের সৌষ্ঠব প্রদান করে তাঁহাদের এরূপ ধারণা ছিল। থেমিষ্টক্লীস সঙ্গীতপারদর্শী ছিলেন না বলিয়া তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল মনে হইত। সমপাঠীরা পরে যখন ঠাট্টা করিত তখন তিনি বলিতেন "আমি কখনও বাদ্য বাজাইতে শিখি নাই বটে কিন্তু সামান্য নগরীকে মহৎ করিবার শিক্ষা পাইয়াছি।" শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে একে একে নিকটে আনিয়া বংশী অথবা বীণা বাজাইতে শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্রেরা যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা করিত। এইরূপে সঙ্গীতে পারদর্শিতা জন্মিলেই বিখ্যাত গীতিকাব্যলেখকদিগের রচনাসমূহ ছাত্রদিকের পরিচিত করিয়া দেওয়া হইত। এবং সোলনের পদ্যাকারে রচিত অবস্থাও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া মুখস্থ করান হইত।

সঙ্গীত বিদ্য বলিলে গ্রীসে কাব্যসাহিত্যও বুঝাইত এবং এথেন্স প্রথম হইতেই কাব্যসাহিত্যের আদর ছিল। সোলনের নিয়মে উৎসবোপলক্ষে হোমারের কাব্য সকলগীত হইত। হোমার, হীসিয়দ, আর্কিয়াস্ প্রভৃতি কবিগণের কাব্যসমূহ পিসিষ্ট্রেটাস অনেক পণ্ডিত সমবেত করিয়া স্থায়ী পুস্তকরূপে লিখিয়াছিলেন, এবং এই সমস্ত পুস্তকগুলি এক সর্ব্বসাধারণীয় লাইব্রেরী বা পুস্তাকাগারে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পেরিক্লীস্, ইউরিপিদিস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যখন পঠদ্দশায় ছিলেন তখন লিখন পদ্ধতি অতিমাত্রায় প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং কেবল উৎকৃষ্ট গ্রন্থই প্রকাশিত হইত। হোমারের মহাকাব্য-

সমূহ ও হ্যীসিয়দের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ হইতে ছাত্রদিগকে লিখিতে পড়িতে এবং আবৃত্তি করিতে হইত। পারসীক যুদ্ধে মৃত বীর-দিগের উদ্দেশ্য সাইমনাইদিসের শোকোচ্ছাস সমূহ এবং পিন্দারের বীরগাথা সমূহ বাদ্যযন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করিতে হইত। এবং যখন ফ্রিনিকাস ও ইস্কীলাসের নাট্যসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল তখন এই সমুদয়ও পাঠ্যের মধ্যে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এবং ছাত্র-দিগকে বিদ্যালয়ের মধ্যে অভিনয় করিত হইত। লিখন, শ্রুতিলিপি, পাঠ, আবৃত্তি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরল ব্যবহারিক গণিত শিক্ষা দেওয়া হইত। ওজন ও মাপ করিবার পদ্ধতি, তুলাদণ্ডের ব্যবহার, পঞ্জিকার দিনগণনা করা এবং ব্যবসায়ের উপযোগী নিত্যপ্রয়োজনী গণনা ও বাজার হিসাব এই শিক্ষার অঙ্গ ছিল।

ব্যায়াম শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে সাধারণ জিমনাশিয়ামের ব্যায়াম ভূমিতে যাইতে হইত অথবা শিক্ষকদের নিজগৃহের প্যালিস্ট্রা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতে হইত। উলঙ্গভাবে মুক্ত উদ্যানে ব্যায়াম করা হইত। শিক্ষকেরা ছাত্রদিগের শরীরের সাধারণ গঠন ও অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া এক এক জনকে এক এক রূপ ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। প্রথম অবস্থায় সামান্য সামান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন শিক্ষা দেওয়া হইত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কষ্টসাধ্য ক্রীড়ার আরম্ভ হইত। কুস্তী, হাতাহাতি, ঘুঁসোঘুঁসি, দৌড়াদৌড়ি, উল্লম্ফন, বর্শা বল্লম নিক্ষেপণ প্রভৃতি পরিশ্রমজনক ব্যায়াম অনুশীলন করা হইত। উৎসবাদির জন্য নৃত্য করিতে হইত এবং যুদ্ধকার্য্যের জন্য অশ্বধাবন শিক্ষা করিতে হইত। তদ্ব্যতীত সন্তরণ ও নৌচালন শারীরিক শিক্ষার বিষয় ছিল।

চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্যন্ত এরূপ ভাবে প্যালিস্ট্রাতে ব্যায়ামশিক্ষা এবং সঙ্গীত বিদ্যালয়ে কাব্য ও সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া দরিদ্রের সন্তানেরা ব্যবসায় আরম্ভ করিত। এবং ধনী ছাত্রগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চেষ্টিত হইত। কিন্তু এই যুগে উচ্চ শিক্ষার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না। কাজে কাজেই উচ্চশিক্ষাপ্রার্থী ছাত্রেরা পুরাতন বিদ্যালয়েই আরও কিয়ৎ কাল কাটাইত অথবা গৃহে বসিয়া থাকিত এবং শারীরিক অনুশীলন সমূহে যোগদান করিত। যখন সোফিস্টদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় নাই তখন

নিম্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই ধনী উন্নত ছাত্রদিগের জন্য কয়েকটি শ্রেণীর পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া উচ্চ অঙ্গের ভাষা ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই প্রত্যেককে সমর-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে হইত। এই বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে সরকারের আয়ত্ত ছিল। এখানে নাগরিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে দুই বৎসর কাল প্রকৃত সামরিক শিক্ষা এবং আইন শিক্ষা করিত হইত। এই অবস্থায় ছাত্রদিগকে পেডাগণের অধীনে থাকিতে হইত না।

মোটের উপর ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এবং পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে মিল্টিয়াদিস, আরিষ্টাইদিস্, থেমিষ্টক্লীস, পেরিক্লীস, ইস্কীলদ, ও ইউরিপিদিস্ প্রভৃতি কর্ম্ম ও চিন্তাবীরগণ যেরূপ শিক্ষাবেষ্টনীর মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তাহাতে শারীরিক অনুশীলন প্রধান অঙ্গ ছিল। সাহিত্য শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বিদেশীয় ভাষা অথবা ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হইত না। উৎসব সমূহে যোগদান করিয়া, ধর্ম্মকাব্য সমূহ পাঠ করিয়া এবং রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয় দেখিয়া যতদূর ধর্ম্মশিক্ষা হইত তাহার বেশী কিছু হইত না। ব্যায়াম শিক্ষাই করুক অথবা সঙ্গীত শিক্ষাই করুক, প্রত্যেককে সংযমী হইতে হইত। উচ্চ বিদ্যালয় ভিন্ন সকল বিদ্যালয়ই স্বাধীন ছিল, কিন্তু অনেক বিষয়ে এরিওপেগাসে অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার নিয়ম পালন করিতে হইত।

শিক্ষা-প্রসঙ্গ

সৈয়দ মুজতবা আলি

কিছুকাল আগে বোম্বায়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন এদেশের সবচেয়ে বড় কর্তব্য আপামরজনসাধারণের ভিতর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা এবং বেকার-সমস্যার নিরঙ্কুশ সমাধান করা।

এ অতি সত্য কথা -এমন কি পৃথিবীর বর্বরতম দেশও এ-তত্ত্ব মেনে নেবে। কিন্তু প্রশ্ন, শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করা যায় কী প্রকারে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে :—

'যত টাকা জমাইছিলাম
শুঁটকি মাছ খাইয়া
সকল টাকা লইয়া গেল
গুলবদনীর মাইয়া।'

যত রকমের খাজনা হতে পারে, যত প্রকারের ন্যায্য অন্যায্য ট্যাক্স হতে পারে সবই ত চাঁদপানা মুখ করে দিচ্ছি। সরকারের হাতে সে-টাকা জমা হচ্ছে এবং তার বেবাক খরচ হয়ে যাচ্ছে এ-খাতে ও-খাতে সে-খাতে, অর্থাৎ গুলবদনীর মাইয়াই সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তার শতাংশের এক অংশও উদ্বৃত্ত থাকছে না।

কাজেই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলি কী করে, পুরনোগুলিই বা চালু রাখি কোন্ কৌশলে?

কিন্তু আমার মনে হয় পুরনো স্কুল চালু রাখা আর নূতন স্কুল খোলাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধান কর্ম নয়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, কোন বিশেষ গ্রামে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে একটি ভাল পাঠশালা উত্তমরূপে চালু আছে, প্রতি বৎসর দশ বারোটি ছেলে শেষ পরীক্ষা পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বৃত্তিও পাচ্ছে, কিন্তু তবুও যে-কোনও সময় আপনি সে-গ্রামে গিয়ে যদি হিসেব নেন, কটি ছেলে লিখতে পড়তে পারে, তবে দেখবেন

দশ-বারোটির বেশী না; বাদবাকী আর সবই লেখাপড়া ভুলে গিয়েছে এবং যে দশ-বারোটি কেঁদে-ককিয়ে পড়তে পারে তারাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে। অবশ্য আমি এস্থলে সাধারণ চাষা-মজুরের কথাই ভাবছি—মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তশালী পরিবারের কথা উঠছে না।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন—আমরা চাষার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাবি আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-কথা ভাবি নে, তারা পরীক্ষায় পাস করার পর পড়বে কী! তারা যে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায় তার একমাত্র কারণ তাদের কাছে পড়বার মত কিছু থাকে না।

ইয়োরোপের চাষা মজুর আমাদের মত গরিব নয়। তারা যে নিরক্ষর হয়ে যায় না, তার একমাত্র কারণ তারা খবরের-কাগজ পড়ে এবং মেয়েরা ক্যাথলিক হলে প্রেয়ার বুক আর প্রটেস্টাণ্ট হলে বাইবেল পড়ে। অবসর-সময়ে হয়ত একখানা নভেল কিংবা ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে, কাজ না থাকলে হয়ত তারা চিঠি-চাপাটিও লেখে, কিন্তু এগুলো আসল কারণ নয়—আসল কারণ খবরের কাগজ, প্রেয়ার বুক এবং বাইবেল।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চাষা খেতে পায় না, সে খবরের কাগজ কিনবার পয়সা পাবে কোথায়?

তাই দেখতে পাবেন, যে-চাষা কোন গতিকে তার ছেলেকে পাঠশালা পাসের সময় একখানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত কিনে দিতে পেরেছিল তার বাড়িতে তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে। এই আংশিক বাঁচাওটা কিন্তু প্রধানত বাংলা দেশে। হিন্দীভাষীদের তুলসী রামায়ণ পড়ে সে-লাভ হয় না, কারণ তুলসীদাসের ভাষা আর আধুনিক হিন্দীতে প্রচুর তফাত। তুলসীদাসের ভাষা দিয়ে আজকের দিনে চিঠি লেখা যায় না—কাশীরাম কিংবা কৃত্তিবাসের ভাষার সঙ্গে কিন্তু আধুনিক বাংলার খুব বেশী পার্থক্য নেই।

তাই দেখতে পাবেন মুসলমান চাষা পাঠশালা পাসের পর শিগগিরই নিরক্ষর হয়ে যায়, কারণ সে রামায়ণ মহাভারত পড়ে না এবং বাংলা ভাষায় এ-রকম ধরণের সহজ সরল মুসলমানী ধর্মপুস্তক নেই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতিটা কী রকম তার

খবর আমার জানা নেই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করলে আমরা শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিস্তর হদিস পাব।

তা হলে ওষুধ কী?

যে-উত্তর সকলের প্রথম মনে আসবে সে হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি বসানো। কিন্তু অত টাকা যোগাবে কোন্ গৌরী সেন? সরকার ত দেউলে। তা হলে?

এইখানে এসে আমিও আটকা পড়ে যাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নূতন ইস্কুল খোলার চেয়েও বড় কাজ, পড়ার জিনিস সাক্ষর ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া—বিনি পয়সায় কিংবা অতি অল্প দামে।

আমি বহু বৎসর ধরে এ-সমস্যা নিয়ে মনে তোলপাড় করেছি, বহু গুণীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, দেশ-বিদেশে উন্নত অনুন্নত সমাজে অনুসন্ধান করেছি—তারা এ-সমস্যার সমাধান কী প্রকারে করে, কিন্তু কোন ভাল ওষুধ এখনও খুঁজে পাই নি। আমার পাঠকেরা যদি এ-সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত আমাকে জানান, তবে তার আলোচনা করলে আমরা লাভবান হব সন্দেহ নেই।

অন্য এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের কর্তব্য ছাত্রদের 'স্পিরিচুয়াল' ডিরেক্শান্ দেওয়া।

আমার মনে হয়, এইমাত্র আমরা যে-সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলুম সে সমস্যারই এ আরেকটা দিক।

'স্পিরিচুয়াল' বলতে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ নিশ্চয় 'রিলিজিয়ান' বলতে চান নি—তাহলে হাঙ্গামা অনেকখানি কমে যেত—তাই মোটামুটি ধরা যেতে পারে, তিনি আমার প্রয়োজনের দিকটাতেই ইঙ্গিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্ম ছাত্রকে তার দেশের বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্যে আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনের অধিক সুস্বাদু আহার্য রয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, অধ্যাপকেরা যদি ছাত্রকে ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করতে পারেন,

সে-বৈদগ্ধ্যের উত্তম উত্তম বস্তুর রসাস্বাদ করাতে শেখান, তবে ছাত্র নিজের থেকেই তার প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ধন চিনে নিতে পারবে। সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়, তখন ছাত্রদের সামনে গন্ধমাদন রাখা ছাড়া উপায় নেই—যে যার বিশল্যকরণী বেছে নেবে।

কিন্তু সমস্যা তৎসত্ত্বেও গুরুতর। ছেলেদের পড়তে দেব কী? ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সংস্কৃত-পালিতে, তিন ভাগ ইংরেজীতে, আর মেরে কেটে দুভাগ বাংলায়। অথচ আজকের দিনে সব ছেলেকে ত আর জোর করে বি. এ. অনার্স অবধি সংস্কৃত পড়াতে পারি নে। এবং তাতেই বা কী লাভ? কজন সংস্কৃত অনার্স গ্রাজুয়েটকে অবসর সময়ে সংস্কৃত বইয়ের পাতা ওল্টাতে আপনি আমি দেখেছি? সংস্কৃত গড় গড় করে পড়া শিখতে হলে টোল ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অতএব মাতৃভাষাতেই আমাদের বৈদগ্ধ্যচর্চা করতে হবে!

এবং সেখানেই চিত্তির। আজ যদি আপনি বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, নৃত্যনাট্য-সঙ্গীতশাস্ত্র বাংলা অনুবাদে পড়তে চান তবে একবার ঘুরে আসুন কলেজ স্কোয়ারে বইয়ের দোকানগুলোতে। যে-সব বইয়ের বাংলা অনুবাদ হয়ে গিয়েছে সেগুলোই যোগাড় করতে গিয়ে আপনাকে চোখের জলে নাকের জলে হতে হবে।

আর কত শত সহস্র পুস্তক যে আপনার পড়তে ইচ্ছা হবে, অথচ অনুবাদ নেই তার হিসেব করবে কে?

হিন্দীওয়ালাদের ত আরও বিপদ। আমাদের চেয়ে ওদের অনুবাদ -সাহিত্য অনেক বেশী কম-জোর; এই দিল্লির কনট সার্কাসে আমি হিন্দী বইয়ের দোকানে সার্কাসের ঘোড়ার মতই চক্কর লাগাই— আজ পর্যন্ত কোন সংস্কৃত বইয়ের উত্তম হিন্দী অনুবাদ চোখে পড়ল না, যেটি বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।

মারাঠী ভাষায় তবু কিছু আছে, গুজরাতীতে তারও কম। আসামীতে প্রায় কিছুই নেই, ওড়িয়ার খবর জানি নে—তবে যেহেতু শিক্ষিত আসাম এবং উড়িষ্যা-সন্তান মাত্রই বাংলা পড়তে পারেন তাই তাঁদের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

মোদ্দা কথায় ফিরে যাই। রাধাকৃষ্ণণ ত দায় চাপিয়েছেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর অর্থাৎ অধ্যাপকদের উপর। কিন্তু হায়, তাঁদের ত দরদ নেই এসব জিনিসের প্রতি। আর স্বয়ং রাধাকৃষ্ণণের যদি দরদ থাকত তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে উপরাষ্ট্রপতি হতে গেলেন কেন ??

শিক্ষকের দুর্দ্দশা

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আমরা যতটুকু শিক্ষালাভ করি, তাহার খানিকটা পাই পিতামাতা প্রভৃতি বাড়ীর লোকের নিকট, কতকটা পাই বিদ্যালয় হইতে আর কতকটা পাই বন্ধু প্রতিবাসী প্রভৃতির নিকট হইতে। বিদ্যালয় হইতে যদিও আমরা প্রধানতঃ পুস্তকগত বিদ্যা আহরণ করিয়া থাকি, তবুও সেটা খুব উচ্চ দরের জিনিস নয়, এ কথাটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। পুস্তকের অন্তর্গত কথাগুলি যেন প্রাণহীন—যতক্ষণ না সুযোগ্য শিক্ষক স্বকীয় প্রতিভার সাহায্যে সেগুলিকে জীবন্ত করিয়া ছাত্রের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন, ততক্ষণ তাহার দ্বারা ছাত্রের বিশেষ কোনও উপকার হয় না। কাজেই দেখা যাইতেছে, বিদ্যালয়-গত শিক্ষার মূল্য প্রধানতঃ শিক্ষকের যোগ্যতার উপর নির্ভর করিতেছে।

দু একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা পরিস্ফুট করিতেছি। আজকাল নিম্ন বিদ্যালয় সমূহে বাংলা ভাষায় উদ্ভিদ বিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি শিখাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু যে প্রণালীতে এই সকল বিজ্ঞান অধীত হওয়া আবশ্যক, তাহার কিছুই হইতেছে না—তাহার একমাত্র কারণ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। শিক্ষক নিজে কখনও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন নাই—প্রকৃত শিক্ষা জিনিসটা কি, বর্ত্তমান কালে শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে কি লেখে, এই সকল বিষয়ে তিনি প্রায়ই অজ্ঞ। এরূপ স্থলে তিনি যে বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি না বুঝাইয়া কেবলমাত্র ছাত্রগণের গলাধঃকরণ করাইয়া দিয়াই আপনার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন বিবেচনা করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে?

বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের নৈতিক শিক্ষার আয়োজন করা উচিত—এরূপ কথা বহুকাল হইতেই শুনা যাইতেছে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমভাগ বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক পর্য্যন্ত 'গোপাল বড় সুবোধ,' 'সদা সত্য কহিবে' প্রভৃতি অমূল্য নীতি

কথায় পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহার ফলে মিথ্যা কথন প্রভৃতি পাপ দেশ হইতে লোপ পাইবার কোনও লক্ষণ দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। আসল কথা, বালক বই এর কথায় বড় একটা কান দেয় না—তাহার ভয় ভক্তি ও ঈর্ষার পাত্র (কোন্ ছেলে মাষ্টার মশায়ের শুভাদৃষ্টের ঈর্ষা না করে?) শিক্ষক মহাশয় যেরূপ আচরণ করেন, সেও তাহার অনুকরণ করিতে থাকে। যখন বালক দেখিতেছে, উপরওয়ালা কর্মচারীর ভয়ে শিক্ষক অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথা দ্বারা আপনাকে বাঁচাইতেছেন—যখন সে দেখিতেছে, শিক্ষক বিপন্নের উদ্ধারের জন্য কিছুমাত্র সাহস ও বীর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন না, যখন সে দেখিতেছে, ইতর লোকের ন্যায় মাষ্টার মহাশয়ও অর্থের কাঙাল, তখন কেমন করিয়া সে সত্য কথন, সৎসাহস এবং স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিবে?

আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালী কিরূপে উন্নত ও সংস্কৃত করা যায়, তদ্বিষয়ে অনেকের ঔৎসুক্য দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করুন, যাহাতে বিদ্যালয় সমূহে যোগ্য শিক্ষকের অসদ্ভাব না হয়। আজকাল ত দেখা যায়, বিদ্বান্ বুদ্ধিমান লোকে প্রায়ই শিক্ষক বৃত্তি অবলম্বন করিতে সম্মত হন না। অনেকে আইন পড়িবার সময় বা অন্য কোনও ব্যবসায়ের চেষ্টা করিতে করিতে কিছুদিন মাত্র শিক্ষকতা করেন। এরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। যত দিন পর্য্যন্ত না সেই কারণ-গুলি দূর হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনও আশা নাই। সংক্ষেপে কারণগুলির আলোচনা করিতেছি।

লোকে যখন একটা বৃত্তি অবলম্বন করিতে যায়, তখন মোটামুটি দুইটা জিনিসের কথা সে ভাবে, প্রথম অর্থ, দ্বিতীয় সম্মান। অর্থটা যে মানুষের কত প্রিয়, তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না, কাজেই আইন ব্যবসায়, ডাক্তারি প্রভৃতি যে সকল বৃত্তিতে যথেষ্ট অর্থার্জ্জন হয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকগণ দলে দলে সেই সকল বৃত্তি অবলম্বন করে। তবে যদি এমন কোনও বৃত্তি থাকে, যাহাতে বেশী টাকা রোজগার হয় না, কিন্তু যথেষ্ট সম্মান লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কতকগুলি ক্ষমতাবান যুবক সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। শিক্ষকের বৃত্তি এই শেষোক্ত ধরণের কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কিছুকাল

হইতে শিক্ষক তাঁহার প্রাপ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। আজকাল অর্থশালী লোকই সমাজের বরেণ্য, দরিদ্র শিক্ষক অনাদৃত ও ভগ্ন হৃদয় হইয়া এক পাশে সরিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে একটা পুরাতন গল্প বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

স্বগীয় মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় যখন স্কুল ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন, তখন কার্য্য ব্যাপদেশে এক গ্রাম্য জমিদারের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হন। জমিদারটি নামধামাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "কি কর্ম্ম করা হয়?" ভূদেববাবু উত্তর দিলেন, "আমি শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করি।" তাহাতে একটু অবজ্ঞার সহিত জমিদার বলিলেন, "ওঃ, মাষ্টারি করা হয়!" তারপর প্রশ্ন হইল, "বেতন কত?" ভূদেববাবু বলিলেন, "দেড় হাজার টাকা।" এই কথা শুনিবামাত্র জমিদার পুঙ্গবের আচরণ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া "আরে, কে আছিস্, শীঘ্র চৌকি নিয়ে আয়, পা ধোবার জল নিয়ে আয়," ইত্যাদি চীৎকারে সোরগোল করিয়া উঠিলেন।

কিন্তু ইংরাজী আমলের পূর্ব্বে আমাদের দেশে এইরূপ বেতন অনুসারে সম্মান প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না - তখন শিক্ষকের মর্য্যাদা যথোচিতরূপে রক্ষিত হইত। ব্রাহ্মণই শিক্ষকের কার্য্য করিতেন—একাধারে শিক্ষক ও ধর্ম্মযাজক হওয়ায় তাঁহার যথেষ্ট মানসম্ভ্রম ছিল। এখনকার মত তখনকার অধ্যাপকেরও 'অদ্যভক্ষ্য' অবস্থা ছিল বটে, কিন্তু সমগ্র সমাজ তাঁহার উপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার দারিদ্র্য জনিত ক্লেশ ভুলাইয়া দিত।

কেবল আমাদের দেশে নহে, পাশ্চাত্য দেশসমূহেও শিক্ষকের সম্মান হ্রাস পাইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শিক্ষকের কার্য্য ধর্ম্ম-যাজকগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল,—কাজেই এ কার্য্যের বেশ সম্মান ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কালে শিক্ষকতার সহিত যাজকতার সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—কাজেই শিক্ষকের সম্মানও লোপ পাইয়াছে। এদেশের মত সেখানেও শিক্ষকের বেতন অল্প, কাজেই বুদ্ধিমান লোকে শিক্ষক বৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহে না! আমেরিকায় (আংশিকরূপে ইংলণ্ডেও) এতদূর দাঁড়াইয়াছে যে, পুরুষ মানুষ আর স্কুলের শিক্ষকতা করিতে চাহে না—এটা ক্রমশঃ

স্ত্রীলোকের বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমেরিকায় শিক্ষকগণের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন স্ত্রীলোক। বালকগণের শিক্ষার ভার স্ত্রীলোকের উপর দিলে যে সে কার্য্য সুচারুরূপে হইতে পারে না একথা সে দেশের অনেকেই বলিতেছেন।

দেখা যাইতেছে যে ভাল শিক্ষক পাইতে হইলে সমাজে শিক্ষকের বৃত্তির মর্য্যাদা স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু কেবল সম্মানে ত আর মানুষের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না,—তাহার জন্য অর্থেরও একান্ত আবশ্যক। বেশী টাকা না হইলেও লোকের চলে, কিন্তু পরিবারের স্বাস্থ্য বজায় রাখিয়া এবং সামাজিকতা ও ভদ্রতা রক্ষা করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে যে পরিমাণ টাকা নাহিলে নয়, তাহা শিক্ষকের বেতনরূপে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমানে কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষক সে পরিমাণে বেতন পান না—অনেকের বেতন একজন কুলির মাসিক আয়ের সমান কাহারও কাহারও বা তদপেক্ষাও কম। তাহাতে একটা ফল এই হইয়াছে যে স্কুলের শিক্ষাকার্য্যে শিক্ষক সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারেন না—সকাল সন্ধ্যায় কয়েকটী অবস্থাপন্ন ছাত্রকে পড়াইয়া নিজের আয় বাড়াইতে সচেষ্ট থাকেন। শিক্ষকগণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহারা বিদ্যাচর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া টাকা রোজগারের জন্য পাঠ্য-পুস্তকের অর্থপুস্তক ও সংক্ষিপ্তসার প্রণয়নে জীবনপাত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হইবার আশায় মাষ্টার মহাশয়ের হাঁটাহাঁটির কথাটা যখন ছেলে-মহলে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার মান বৃদ্ধি হয় না।

শিক্ষকের কার্য্যের একটা মস্ত সুবিধা, তিনি অনেক ছুটি পান। কিন্তু ইচ্ছা করিলে তিনি সেই ছুটিতে আপনার রুচি অনুসারে জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারেন এবং তাহার ফলস্বরূপ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইতে পারেন। কিন্তু কয়জন শিক্ষক তাহা করিয়া থাকেন? ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে তাঁহার বেতন যথোচিত না হওয়ায় তিনি অবকাশগুলি অর্থার্জ্জনের চেষ্টাতেই ব্যয়িত করেন। অথচ ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে শিক্ষককে আজীবন ছাত্রের ন্যায় নব নব জ্ঞান আহরণ ও স্বকীয় চিন্তা বলে নূতন সত্য আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যিনি অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি অধ্যাপনারও অনুপযুক্ত। আবার এইরূপ জ্ঞানচর্চ্চা ও পূর্ণবয়স্ক

লোকের সভাসমিতিতে যোগদান শিক্ষকের নিজের বুদ্ধির উন্নতির জন্যও একান্ত আবশ্যক, কেননা, ক্রমাগত ছেলের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ছেলেদের সমান হইয়া যায়। একটা গল্প শুনিয়াছিলাম কোন দেশে নাকি এই রকম নিয়ম আছে যে একব্যক্তি বহুকাল শিক্ষকতা করিলে তাহাকে পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার অযোগ্য বিবেচনা করা হয়। গল্পটী কেহ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিলেও আমার আক্ষেপের কোনও কারণ নাই, কেন না গল্পটীর মধ্যে শিক্ষকের বুদ্ধি সম্বন্ধে যে একটু শ্লেষ নিহিত আছে, তাহার ঝাঁজটুকু তবুও রহিয়া যাইবে।

আমি এ পর্য্যন্ত শিক্ষকের জীবন কেবল কৃষ্ণবর্ণেই চিত্রিত করিলাম। কিন্তু তাঁহার জীবনে সুখও যথেষ্ট আছে। প্রথমতঃ তাঁহাকে কেরাণীর মত সদা সর্ব্বদা ওপরওয়ালার ভয়ে ত্রস্ত থাকিতে, ওপরওয়ালার মন যোগাইতে ব্যস্ত হইতে হয় না, একেবারে হয় না, বলিতেছি না, তবে কেরাণীর তুলনায় হয় না বলিলেই চলে। তিনি ক্লাসে ছেলেদের প্রভুভাবে অবস্থান করেন, ছেলেরা ভক্তি না করিলেও যথেষ্ট ভয় যে করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর সমাজে যে শিক্ষকের সম্মান একেবারে লোপ পাইয়াছে, সে কথাটাও ঠিক নহে।

দ্বিতীয়তঃ, ছেলেদের সঙ্গ বুদ্ধির উন্নতির পক্ষে ভাল না হইলেও, চরিত্রের উন্নতির সহায়ক। ছেলেদের মধ্যে উন্নত ভাব সকল যে রকম সহজেই বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়, অপরিচিত লোকের উপকারার্থ বা দেশের হিতের জন্য তাহারা যে রকম আত্মবলি দিতে পারে, বয়স্ক লোকের মধ্যে সে রকম অল্পই দেখা যায়। সংসারের স্বার্থপরতা ও কপটতা এখনও তাহাদের হৃদয় শুষ্ক করিয়া দেয় নাই। তাহারা যেন অনাঘ্রাত, সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম, বয়স্ক লোক যেন শুষ্ক মরা ফুল।

আবার শিক্ষক জানেন ছাত্রগণ তাঁহার চরিত্রের কঠোর সমালোচক-রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের ভয়ে শিক্ষককে বাধ্য হইয়া সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হইবার চেষ্টা করিতে হয়।

শিক্ষকের তৃতীয় ও প্রধান সুখ এই যে তিনি ভাবিতে পারেন আমার কাজটা অতি উচ্চ অঙ্গের, দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল বালক ও যুবকগণের চরিত্র গঠনের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। নাই

বা হইল আমার টাকাকড়ি, নাই বা সামান্য লোকে আমার জয়গান করিল, নাই বা আমার নাম খবরের কাগজে উঠিল। আমি যদি একটী বালককেও প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিতে পারি, আমার জীবন সার্থক! তপস্বীর ন্যায় নির্জ্জনে ও নীরবে সাধনা করিবার জন্যই আমার জীবন —আমি তাহাতেই সুখী। বলা-বাহুল্য, প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত, এইরূপ ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল করা।

আমার শেষ কথা এই যে, যদি শিক্ষকের বেতন তাঁহার সাংসারিক ব্যয় সংকুলানের উপযোগী করিয়া দেওয়া হয় এবং যদি সমাজ শিক্ষকের প্রাপ্য মর্য্যাদা প্রদান করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সুযোগ্য ব্যক্তিগণ শিক্ষক বৃত্তি অবলম্বন করিবেন এবং অনন্যমনা হইয়া শিক্ষা কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিবেন। তাহা হইলেই শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হইবে, নহিলে শিক্ষা সংস্কার কেবল কথার কথা রহিয়া যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

আমাদের (?) বিশ্ববিদ্যালয়ের দালানটায় বিশ্বটা এমনি করে হাত পা ছড়িয়ে সমস্ত জায়গা জুড়ে পড়ে আছে যে সেখানে বিদ্যা-বেচারী একটু দাঁড়াবারও স্থান পাচ্ছে না। তরুণমতি শিশুরা যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়িতে প্রবেশ করে' তখন থেকে তাদের তরুণ মনের ওপরে বিশ্বের বোঝাটা এম্‌নি করে' চেপে বস্‌তে থাকে যে তাতে করে' তাদের কাঁচা মন ও দেহ হয় বেঁক্‌তে থাকে, নয় ইঁচড়ে পাক্‌তে থাকে। তাই যখন তারা সেখানে পনর ষোল বছর কাটিয়ে একুশ বাইশ বছর বয়সে এসে রাজার পথে দাঁড়ায়, তখন আমরা বেশ দেখ্‌তে পাই যে ডিগ্রি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনুষ্যত্বটাও বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আর এইটে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম ও প্রধান অভিযোগ।

সবাই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয় অনেক বিষয়, কিন্তু আমরা শিখি মাত্র দুটো জিনিস। আমরা তিন চারটে ভাষা, ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য গণিত, হরেক রকমের "logy". ফিজিক্স কেমিষ্ট্রী ফিলজফি ইত্যাদি ইত্যাদি করে, অনেক বিষয় সেখানে অধ্যয়ন করি, কিন্তু তাতে আমাদের মনের জোরও বাড়ে না, বুদ্ধির জোরও বাড়ে না - জোর বাড়ে আর দুটি জিনিসের দুঃখের বিষয় দুটোই নিতান্তই দৈহিক--একটি হচ্ছে আঙুলের, আর অপরটি হচ্ছে জিহ্বার। অর্থাৎ আমরা কেউ হই লিখনপটু আর কেউ হই কথনপটু। তাই আমরা যখন স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, তখন এই যে দুটি জিনিস আমরা শিখেছি তারি চর্চ্চায় মন দি। তাই আমরা কেউ হই কেরানী আর কেউ হই উকিল ব্যারিষ্টার। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য ডাক্তার হন, কিন্তু সেটা আমাদের জাতীয় জীবনের একটা প্রক্ষিপ্ত অংশ বলেই ধর্‌তে হবে; আর আমাদের মধ্যে যে কেউ কেউ ক্বচিৎ কদাচিৎ ব্যবসা বাণিজ্যে মন দেন সেটা একেবারেই নিপাতনে সিদ্ধ; আবার তার চাইতেও ক্বচিৎ

কদাচিৎ যে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সর্বস্বান্ত হন না সেটা নিতান্তই "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" বলে-নইলে তার আর কোন কারণ নেই।

অনেকে বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলবেন যে বিদ্যাশিক্ষার কথায় ওকালতি ব্যারিষ্টারি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তুলি কেন? Art for art's sake knowledge for the sake of knowledge —এসব কথা শুনতে শুনতে ত এক-রকম শাস্ত্রবাক্যের মতোই দাঁড়িয়ে গেছে, তবুও জ্ঞানার্জ্জনের আলোচনায় অর্থ উপার্জ্জনের পন্থার কথা টেনে এনে দুর্জ্জনতার পরিচয় দেই কেন? কিন্তু পাঠক, এর একটু মানে আছে। বলছি শুনুন।

পূর্ব্বপুরুষের আমল থেকে আমাদের একটা অভ্যাস জন্মে গেছে —সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অর্থাৎ আমরা সবাই বাঁচতে চাই, কেউই মরে' যেতে চাইনে। এই সনাতন ভারতবর্ষে অনেক অনেক আধ্যাত্মিকের মতে এটা একটা নাকি মস্ত কু-অভ্যাস। কিন্তু এ অভ্যাসটা কু না সু সেটা আমরা এখানে বিচার করতে বসব না। আমরা শুধুই দেখতে পাচ্ছি যে এ অভ্যাসটা সত্য, খুবই পুরাতন, সুতরাং চাই কি সনাতন হবারও আটক নেই। মানুষের বাঁচাই দরকার প্রথমে, তারপর তার আর যা কিছু তার জ্ঞান বিজ্ঞান, ধন, ঐশ্বর্য, মহত্ত্ব গৌরব সব। সুতরাং এটা সবাই মানবেন যে আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করাটাই আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান কাজ। আর সেই জন্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-ফের্তা যুবকবৃন্দের সম্মুখে প্রথম যে কাজটা পড়ে সেটা হচ্ছে এই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। আর তাঁরা এ কাজটা কে কি রকমে হাসিল করেন তা দেখলেই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কি হয়ে বেরিয়েছেন তার একটা হিসেব বেশ পাওয়া যায়।

এই যে আমাদের অধিকাংশেরই কেরানীগিরি ওকালতি বা ব্যারিষ্টারির দিকে ঝোঁক তার একটা ভিতরের কারণ আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, এই দুটি ব্যবসায়ে আমাদের কিছু গড়ে' নিতে হয় না —কিছু তৈরী করে' তুলতে হয় না। এ দুটোর রাস্তাই একেবারে পাকা সড়ক আমাদের পিতৃপিতামহের আমলেও ছিল আবার আমাদের পৌত্র প্রপৌত্রদের আমলেও থাকবে —এখনও যেমন তখনও তেমন—রামেরও আরামলভ্য শ্যামেরও অনায়াসসেব্য। শুধু কেবল

একবার ও-রাস্তা ধরতে পারলে হয়- তারপর এখানে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার কোন দরকার নেই, নিজের মাথা খাটানোর কোন প্রয়োজন নেই, নিজের initiative-এর কোনই তোয়াক্কা রাখতে হয় না ; -অর্থাৎ মানুষের যা থাকলে মনুষ্যত্ব তার কোনও দরকার নেই—কেন না তার জোগান দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ পূর্ব্বেই বলেছি যে ডিগ্রির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনুষ্যত্বও বিক্রি হয়ে যায়। তাই আমরা যখন "মাষ্টার অব আর্টস"-এর ডিপ্লোমাখানি বুক পকেটে ফেলে সেনেট-হল থেকে বেরিয়ে এসে গোলদিঘিতে একটু হাওয়া খেতে বসি, তখন অপর পারে পারে সিটি কলেজের মাথার উপরে দু'একটি সদ্য-ফোটা সান্ধ্য তারার পানে চেয়ে চেয়ে আমাদের পরিষ্কার মালুম হয়ে যায় যে 'art for art's sake একটা কত বড় সত্য কথা।

সুতরাং আমাদের প্রথম ও প্রধান অভিযোগ হচ্ছে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মানুষকে মানুষ করে তুলতে পারে না। আর এই অভিযোগটা প্রথমে দাখিল করলে আর কোন অভিযোগ আনবার দরকারই হয় না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোঠা বাড়ীর অন্ত নেই, বিদ্বান অধ্যাপকের সংখ্যা নেই, অধ্যয়ন অধ্যাপনার সীমা নেই, সাজ-সরঞ্জামের ইয়ত্তা নেই, কিন্তু আসল জিনিস যেটা শুধু সেইটে হয়ে উঠছে না—অর্থাৎ এখানে মানুষ মানুষ হয়ে উঠছে না। গল্প শুনেছি, সেকালের পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা এই বলে বড়াই করতেন যে তাঁরা কত গাধা পিটিয়ে মানুষ করেছেন ; কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গাধা ত দূরের কথা,মানুষই মানুষ হয়ে বেরুচ্ছে না—বেরুচ্ছে হয়ে অতিমানুষ, নয় অমানুষ। সুতরাং এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটা ভীষণ রকমের গলদ কোথায় আছে—আর সেটা বাইরে নয়, এর detail এ নয়, এর উপকরণে অধিকরণে নয়—সেটা এর অত্যন্ত অন্তরে-নইলে বাইরের চুন-শুরকির এতবড় ক্ষমতা নেই যে মানুষকে অমানুষ করে' তুলতে পারে—বিশেষতঃ যখন আমরা জানি যে "অচলায়তনে"ও পঞ্চকের জন্ম হয়। সুতরাং আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়াটি আকাশে ঠিক সোজা হয়ে উঠেছে কি না তা দেখবার আমাদের ততটা দরকার নেই—আমাদের দেখতে হবে

যে এর ভিত্তিটা কোন্ সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কারণ প্রত্যেক অনুষ্ঠানের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম—একটা বিশিষ্ট সত্য আছে। যদি সেই অনুষ্ঠান তার সেই বিশিষ্ট ধর্ম্ম—বিশিষ্ট সত্যের ওপরে স্থাপিত না হয়, তবে তা কিছুতেই মানুষকে সফলতা দান করতে পারে না। কারণ সত্যেই সফলতা নিহিত-অন্যত্র নয়। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে যদিও সেটা আমরা অনেকেই মানি না বা জানি না। তাই আমরা কাব্য সমালোচনার কালে টিকি দুলিয়ে যোগশাস্ত্রের সূত্র আওড়াই —আর সাহিত্য বিচারের কালে-সাহিত্যকের রাজনৈতিক মতামতের পিণ্ডির ব্যবস্থা করি।

বিদ্যা দান করবার অধিকার ও সামর্থ্য আছে শুধু একজনের — যিনি ব্রাহ্মণ। কেউ যেন মনে না করেন যে আমি দেউড়ীর দেবতা রঘুবীর তেওয়ারী বা রন্ধনকর্ম্মের ঋষি চক্রধর মিশ্র প্রমুখ ব্রাহ্মণের কথা বলছি। আমি বলছি তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ—যিনি ব্রাহ্মণ পৈতের জোরে নয়, প্রকৃতির জোরে। কারণ জ্ঞানের চর্চ্চা জ্ঞানের আলোচনাতেই ব্রাহ্মণের আনন্দ। আর আনন্দের ভিতর দিয়ে যা দত্ত হয় সেই দানই মঙ্গলময় সেইটে সবার চাইতে সোজা গ্রহীতার পক্ষে সত্য করে পাওয়া। ছাত্রের দিক থেকে ত কিছু শেখা অনেক সময়ই কষ্টকর—তারপর শিক্ষকের দিক থেকেও যদি সে-শিক্ষাটা নিরানন্দের ভিতর দিয়েই ছাত্রের কাছে এসে পৌঁছে –তবে শিক্ষক ও ছাত্র দুজনে সারাজীবন খালি। অকৃতার্থতার ভিতর দিয়েই কাটিয়ে পরস্পর পরস্পরকে শুধু ঘৃণা করতেই শিখবে তাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ক্ষতি।

সুতরাং যে বিদ্যার মন্দির এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ওপর দাঁড়িয়ে না আছে সে মন্দিরে জ্ঞানের সত্য-বিগ্রহ আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। আর যেখানে সত্য-দেবতা আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে না পেরেছে সেখান থেকে মঙ্গলের আশা করা চিরকাল ব্যর্থই হবে। কেননা সত্য ছাড়া মঙ্গল নেই। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাগুলো খাটে। কারণ আমাদের, যে বিশ্ব-বিদ্যালয় তা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ওপরে দাঁড়িয়ে নেই—তার ভিত্তি হচ্ছে

বৈশ্যবুদ্ধির ওপরে। আর এইটেই হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল গলদ। এইটে আগে দূর না হলে, আর কিছু পরিবর্ত্তন হোক না কেন, তাতে একই ফল ফলবে, না হয় একটু উনিশ আর বিশ।

বৈশ্যের ধর্ম্ম নয় কোন কিছু নিঃশেষ করে' দান করা। তবে প্রত্যেক দানের পিছনে পিছনে তার ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির একটা হিসেব থাক্‌বেই থাক্‌বে—তা সে কথায় যতই উদার হোক না কেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টা যে বৈশ্যবুদ্ধির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সেটা আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যে সেটা প্রমাণ করতে আর বেশী বিচারতর্কের আবশ্যক করে না। এখন যতদিন এই বৈশ্যবুদ্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি থেকে না খস্‌বে ততদিন তার দেয়ালে যতই চুনকাম করা হোক্ না কেন তাতে ছাত্রজীবন একটুও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না।

পরাধীন জাতির দুঃখের অন্ত নেই। তার মধ্যে সবার চাইতে বড় দুঃখ হচ্ছে এই যে সে কারও কাছেই সম্মানের দাবী করতে পারে না। সে যখন অপরের কাছ থেকে কিছু পায় সেটাকে সে শ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে, ভালবাসার ভিতর দিয়ে পায় না; সেটাকে সে পায় অবজ্ঞার ভিতর দিয়ে—বড় জোর কৃপার ভিতর দিয়ে। আর যে-দান অবজ্ঞার দান সে দান, অমৃত নয়-সে-দান বিষ। তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দত্ত জ্ঞান মন্থন করে' অমৃত উঠ ছে না—উঠ্‌ছে বিষ। এই বিষে আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর দেহ জর্জ্জরিত! তাই যৌবনের প্রারম্ভে যখন তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে তখন তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের চোখে মুখে আমরা দেখতে পাই মৃত্যুর নিরানন্দময় ছায়া, আর বাকি একজন বেরিয়ে আসে নীলকণ্ঠ হয়ে রুদ্রমূর্ত্তি নিয়ে। সুতরাং আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কি শিখি ও কতখানি শিখি সেটা ততবড় কথা নয় যতবড় কথা হচ্ছে কার কাছে শিখি ও কেমন করে' শিখি।

এই ডেমোক্রেসির যুগে কোন কিছুই কোন একজন ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়ে উঠছে না। যে-কোন অনুষ্ঠানের পিছনেই তাই আজকাল কোন একটা বোর্ড বা কাউন্সিল বা কমিটি কর্ম্মকর্তা হয়ে

রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের যেমন একটা আত্মা আছে, তেমনি এই যে বোর্ড কাউন্সিল বা কমিটি অর্থাৎ মানুষের সমষ্টিগত অবস্থা তারও তেম্নি একটা আত্মা আছে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা যখন ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন-যন্ত্রের British character উল্লেখ করে, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে ঐ শাসনযন্ত্রের পিছনে যে একটা সমষ্টিগত মানুষের সত্তা আছে তারই কথা বলে। এটাকেই আমি বলছি সমষ্টির আত্মা। এই হিসেবে যেমন আমাদের গভর্ণমেণ্টের একটা আত্মা আছে তেমনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটা আত্মা আছে। এখন এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মা এই আত্মার মধ্যে সেই জিনিসটি একেবারেই নেই। যে-জিনিসটি মানুষকে মানুষ করে তুলবার আসল মন্ত্র -সেটি হচ্ছে ছাত্রমণ্ডলীর জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে সহানুভূতি ও প্রচুর পরিমাণে ভালবাসা। এই ভালবাসার অভাব যতদিন থাক্‌বে ততদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলী মানুষ হয়ে উঠতে কিছুতেই পারবে না। কারণ স্নেহ ভালবাসা শিশুর পক্ষে যেমন দরকার—বালক কিশোর যুবক সবার পক্ষেই তেমনি প্রয়োজনীয়। একমাত্র ভালবাসার বাতাসেই মানুষ শতদলটি পরিপূর্ণ রূপে, পরিপূর্ণ গুণে ফুটে উঠতে পারে।

সুতরাং যত উঁচু করেই হোষ্টেল গড়া হোক না কেন, যত নীচু হয়েই তার ছাদে ছাদে ইলেকট্রিক ফ্যান ঝুলুক না কেন, পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা যত বাড়িয়ে দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়াই হোক্ না কেন, যত ইংরেজী জানা সংস্কৃত পণ্ডিত বা সংস্কৃত-জানা ইংরেজী মাষ্টার নিযুক্ত করা যাক্ না কেন, যতদিন গোড়ায় ঐ মন্ত্রটির অভাব থাকবে, ততদিন আমাদের পাঠ্যাবস্থা কোন দিন সজীব হয়ে উঠে আমাদের জীবন দান করতে পারবে না। আর ঐ মন্ত্রটির চিরদিনই অভাব থাকবে যতদিন না বিশ্ববিদ্যালয়ের গোঁড়ার বৈশ্য আত্মা নবজন্ম লাভ করে' ব্রাহ্মণের আত্মায় পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু যেহেতু এ জগতে ঘরের খেয়ে বনের মোষতাড়ান সাধারণ নিয়ম নয় এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে বসে যাঁরা সুতো টান্‌ছেন তাঁরাও অসাধারণ নন, সুতরা এই, বৈশ্য-আত্মার ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশা অতি সুদূর পরাহত। সুতরাং বাকি রইল শুধু এক পন্থা-সেটা হচ্ছে

আমাদের শিক্ষার ভার বিল্‌কুল নেওয়া আমাদের নিজের হাতে। আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের নিজের হাতে নিয়ে আমরা যে ভুলভ্রান্তিই করি না কেন তার পিছনে এমন একটা জিনিস থাকবে যে তা সমস্ত ভুলভ্রান্তির ক্ষতিপূরণ করেও অনেক খানি উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। সে জিনিসটা হচ্ছে—আমাদের আপনার জনের জন্যে দরদ, আমাদের উত্তরবংশীয়দের জন্যে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ ও ভালবাসা।

(৩)

বছর বারো আগে এই বাংলাদেশে আমরা একবার আমাদের শিক্ষার ভার বাস্তবিকই আমাদের নিজের হাতে নিয়েছিলেম। কিন্তু তা সত্য হয়ে উঠল না হয়ে উঠবার কথাও নয়। কারণ আমরা সেদিন যে বিদ্যার মন্দির খাড়া করে তুলেছিলাম তার আবাহন বীণাপাণির বীণার তানে হয় নি তার উদ্বোধন হয়েছিল রুদ্রের ডমরুর ডিমি ডিমি নাদে। আর রুদ্রদেব যাই হন,—এটা আমরা সবাই জানি যে তিনি জ্ঞানের দেবতা নন।

উত্তেজনা আর উৎসাহ যে এক বস্তু নয় এটা মানবার মতো মন আর বুঝবার মতো বুদ্ধি আমাদের অনেকেরই নেই। কিন্তু তাই বলে' উৎসাহ আর উত্তেজনা এক হয়ে যায় না। এর প্রভেদ যা তা থেকেই যায় আর এর ফল যা তা পেয়েই থাকে।

উত্তেজনাটা সাময়িক কোন দুঃসাধ্য বা কষ্টসাধ্য কাজ করবার পক্ষে যতই কার্য্যকরী হোক না কেন, কোন কিছু স্থায়ী গড়বার পক্ষে এর মতো বাধা আর কিছু নেই। যে জিনিসটা এক দিনের নয়, দু'দিনের নয় কিন্তু চিরদিনের করে রাখতে চাই, সেটা চিরদিনের হয়ে থাকতে পারে শুধু তখনই যখন আমার অন্তর-দেবতার একটা সত্যের ভিতরে তার জন্ম হয়। মানুষের অন্তর-দেবতার সে সত্য, সেই সত্যই স্থিতধী-শক্তিমান সৎ। মানুষের উত্তেজনা হচ্ছে তার স্নায়বিক একটা ওলোট পালোট। এই ওলোট পালোটের মধ্যে মানুষ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কে তার অন্তরের সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে না। সুতরাং তখন তার পদে পদে সম্ভাবনা সব জিনিসকে একটা বিরাট মিথ্যার ওপরে গড়ে তোলা। আর মিথ্যার

ওপরে যা গড়া তার ধ্বজা যত উঁচু করেই খাড়া করা যাক না কেন সে ধ্বজা একদিন-না একদিন ধূলোতে লুট্‌বেই

আমরা যে জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ গড়ে তুলেছিলেম সেটা উত্তেজনার ভিতর দিয়ে। উত্তেজনার দাপটে ভিতরের সত্যটা আমাদের চোখেই পড়ে নি জাতীয় শিক্ষাকে আমরা সেদিন শিক্ষার দিকে থেকে মোটেই দেখিনি—দেখেছিলেম সেটাকে পলিটিক্সের দিক থেকে। গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ থেকে যে আমরা মানুষ হয়ে বেরুচ্ছি না সে অভাবটা আমরা সেদিন মোটেও প্রাণ দিয়ে অনুভব করিনি; সেখান থেকে সে পলিটিক্স করা চল্‌বে না—এইটে ছিল আমাদের জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের সত্যময় ভিত্তিটা। রেষারেষি করে' আমরা সেদিন যেটা গড়ে' তুল্‌লেম সেটা অবশেষে হাসাহাসিতেই শেষ হয়ে গেল। দ্বেষের ওপরে ভিত্তি করে আমরা যেটা খাড়া করেছিলেম সেটা স্থায়ী হয়ে আমাদের সফলতা দান করতে পারল না। কৃতকার্য্য হবার যে রাস্তা সেটা আছে পরের ওপরে বিদ্বেষের ভিতর দিয়ে নেই, সেটা আছে আপনজনের প্রতি ভালবাসার ভিতর দিয়ে। পরের উপরে দ্বেষে হয় মানুষের শক্তির বাজে খরচ; এক ভালবাসাই মানুষকে সক্ষম করে গুরুভার বহন করতে।

শিক্ষা-ব্যাপারের ভিতরের আসল সত্যটা আমাদের অন্তরে সেদিন সত্য হয়ে ওঠেনি বলে,' আমরা যে গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ থেকে প্রকৃত মানুষ হয়ে বেরুচ্ছি না এই অভাবটা দুঃখের সঙ্গে বেদনার সঙ্গে আপনার অন্তরে অন্তরে গভীর করে' অনুভব করতে পারিনি বলে' সেদিন আমাদের মনের সাম্‌নে সামান্য সামান্য সমস্যা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাধার মূর্ত্তি ধরে' হিমাদ্রির মতো দাঁড়িয়ে গেল। প্রশ্ন উঠ্‌ল —আমাদের গড়া স্কুল-কলেজে যদি ছেলে পাঠাই তবে ত তাদের মধ্যে হাজার-করা দুশজনের যে গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় কুড়ি ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরী পাবার আশা আছে তা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের উত্তেজনা কমার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নের বাধাটা এত বর্দ্ধিতায়তন হয়ে উঠল যে তার পাশে আমাদের জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদটা একেবারে ছোট হয়ে গেল। কিন্ত সেদিন যদি আমাদের অন্তরে নিশ্চিত মনুষ্যত্ব হারাণোর দুঃখ অনিশ্চিত কুড়ি টাকা হারানোর দুঃখের চাইতে বেশী সত্য হয়ে উঠ্‌ত, তবে আমরা সহজেই

এ কথাটা মনে করতে পার্তেম যে মানুষ যদি প্রকৃত মানুষই হয়ে ওঠে তবে মাসিক কুড়ি টাকা উপার্জ্জন ত অতি তুচ্ছ কথা, তার চাইতে অনেক বড় জিনিস সে উপার্জ্জন করতে পারবে—নিজের জন্যে বা পরের জন্যে। কারণ মানুষের মনে যুক্তিতর্ক তার অন্তরের যে সত্য সেই সত্যেরই পিছনে পিছনে চলে সেই সত্যেরই মনরাখা ও মানরাখা কথা কয়ে কয়ে। আর এইটে ছিল মূল কারণ যে জন্যে আমরা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ সেদিন খাড়া করে তুলে তা দাঁড় করিয়ে রাখতে পারলেম না।

বারো বছর আগে আমরা বাংলদেশে যেটা গড়তে গিয়ে ফেল হয়ে গেলেম, আজ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তারি আয়োজন চল্ছে। এই আয়োজনের সম্বন্ধে সবার চাইতে একটা আরামের কথা এই যে এর পিছনে কোন উত্তেজনা কর্ম্মের দেবতা হয়ে বসে নেই। সুতরাং এই অনুষ্ঠানের সফলতার আশা আজ আমরা অনেক বে ী করে কর্তে পারি। কিন্তু তবুও আজকার বিদ্যামন্দিরও যদি দেশবাসীর হৃদয়ের ওপরে, তার অন্তর-দেবতার দুঃখের ওপরে, বেদনার ওপরে গড়ে না ওঠে তবে পরিণামে এও একটা হাস্যজনক ব্যাপারেই পরিণতি লাভ করবে।

মানুষ বাস্তবিক যা পায় তার চাইতে তার পাবার আশার বন্ধন অনেক বেশী। সুতরাং আজ যদি আমরা দেশবাসীকে অঙ্ক কসে একথা বুঝিয়েও দি যে তাদের ছেলেদের মধ্যে শতকরা একজনও গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় প্রবেশ করতে পারে না, তবে তাতে যে বড় বিশেষ ফল হবে তা বোধ হয় না; যতদিন না তাদেব মধ্যে ঐ বিশ ত্রিশ টাকার লোভের চাইতে মনুষত্বের লোভ প্রবল হয়ে ওঠে। যতদিন না তাদের অন্তরে মনুষ্যত্বের মূল্য গভর্ণমেণ্টের ত্রিশ টাকার চাইতে বেশী হয়ে উঠবে -যতদিন না তারা বুঝতে শিখবে যে মানুযের মনুষ্যত্বের মূল্য দেশকালের অতীত, কিন্তু জায়গা-বিশেষের ত্রিশ টাকার মূল্য দেশকাল ও অবস্থার অধীন—যতদিন না তারা উপলব্ধি করে যে মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করলে তার কোন দিনই সংসারে ফাঁকি পড়বার আশঙ্কা নেই—ততদিন জাতীয় শিক্ষার অনুষ্ঠানকে কিছুতেই তারা বিশ্বাসের চোখে স্নেহের চোখে দেখতে পারবে না—ফলে জাতীয়-শিক্ষা যজ্ঞের হোমানল নিভে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান হয়ে থাকবে।

সুতরাং বাহিরের আয়োজনকেই পরম বলে' মনে না করে' ভিতরের আয়োজনের প্রয়োজনীয়তাও আমাদের প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে হবে। আমাদের দেশবাসীর এমন একটা মন গড়ে তুলতে হবে যে-মনে মনুষ্যত্বের প্রতি একটা দুর্ব্বার লোভ জন্মে যায়। আর এ-কাজের ভার হচ্ছে সাহিত্যের। কারণ সাহিত্য হচ্ছে একাধারেই যন্ত্র ও মন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে একটা জাতি আপনাকে ব্যক্ত করে—আর এই মন্ত্রের সাহায্যে একটা জাতি আপনাকে গড়ে' তোলে।

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমরা যখন জন্ম নিই তখন বিধাতা পুরুষ আমাদের ললাটে যে কথাটি লিখে দেন সে কথাটি এই যে, "এখন থেকে এই বিশ্বসংসারের ভার এদেরি উপরে।" আমাদের আগে থেকে যাঁরা সংসার-ক্ষেত্রে আছেন তাঁদের কাছে থেকে আমাদের সংসার আমরা বুঝে নিই, সেই বোঝাপড়ার নাম শিক্ষা।

শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের বিষয় আশয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটানো। অথচ বিষয় আমাদের এত বিপুল যে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে সমার্থক। সেইজন্যে এমন স্থানে ব'সে বোঝাপড়া করতে হবে যেখান থেকে সমস্ত জমিদারীটাকে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের মতে এমন স্থান হচ্ছে—অরণ্য। অরণ্যে থেকে অনায়াসে উপলব্ধি করি, এতখানি আকাশ আর এত কোটি জ্যোতিষ্ক আমাদের, এত উর্ব্বরা পৃথিবী আর এত বিচিত্র প্রাণী আমাদের। নগরে আকাশ নেই, বাতাস বন্দী, পাখীরা খাঁচায় ও পশুরা চিড়িয়াখানায়; নগর হ'চেছ প্রকৃতির বিকৃতি। ভারতবর্ষ নগরকে শিক্ষাপীঠ করতে দ্বিধা বোধ করছেন।

যে সংসারের দায়িত্ব আমাদের উপরে সে তো কোনো মানুষেরই সংসার নয়। সূর্য্য নক্ষত্র ওষধি বনস্পতি পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলের ভার নিতে হ'লে সকলের সঙ্গ নিতে হয়। সেইজন্যে বিশ্ব-সংসারের যথার্থ বিশ্ব-বিদ্যালয় হচেছ সেইখানে, যেখানে দিকে দিকে প্রাণ অংকুরিত পল্লবিত প্রস্ফুটিত ফলাবনমিত হচেছ, বিকীরিত প্রবাহিত ধ্বনিত নিস্পন্দিত হচেছ, ক্রমান্বয়ে মত ও সঞ্জীবিত জীর্ণ ও যৌবনান্বিত লুপ্ত ও আবির্ভূত হচেছ। নগর হয়তো মানুষের রাজধানী, কিন্তু মানুষকে জাড়য়ে যে বিশ্বপ্রকৃতি তার রাজধানী অরণ্য।

অরণ্য তো অনেক আছে,—শুধু অরণ্য হ'লেই শিক্ষাপীঠ হয় না। তার সঙ্গে কোনো মহাপুরুষের বহুকালগত স্মৃতি সংযুক্ত

থাকা চাই, কোনো মহা তপস্বীর সাধনার ইতিহাস। স্থানমাহাত্ম্য ফরমাস্ দিলে পাওয়া যায় না, বহুভাগ্যে ঘটে।

২

শান্তিনিকেতন তার স্থানমাহাত্ম্য পেয়েছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের থেকে। মহর্ষির পুণ্যস্মৃতি শান্তিনিকেতনের মধ্যে উহ্য রয়েছে; প্রত্যেকের সাধনার তলে তলে মহর্ষির সাধনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবহমান। মহর্ষির আদর্শ প্রত্যেকের মনের আড়াল থেকে মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। চোখের সাম্‌নে মহর্ষির প্রতিকৃতি রাখবার দরকার হয় না।

আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ সেই আদর্শ বহু শতাব্দীর পরে আমরা মহর্ষির মধ্যে পুনরাবিষ্কার কর্‌লুম। সন্ন্যাসের বিকৃত আদর্শ বহু শতাব্দীকাল ভারতবর্ষের মন কেড়েছিল, ভারতবর্ষের প্রকৃত আদর্শ কোথায় চাপা প'ড়ে গিয়েছিল। মহর্ষিতে আমরা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরাধিকারীকে প্রত্যক্ষ কর্‌লুম।

শান্তিনিকেতন ঠিক্ অরণ্য নয়; কিন্তু তার অবারিত আকাশ ও বহুবিস্তীর্ণ মাঠ অরণ্যের প্রতীক্ষা কর্‌ছিল; মহর্ষি অরণ্যের প্রতিষ্ঠা কর্‌লেন উদ্ভিদ্‌কে ও মানুষকে আমন্ত্রণ ক'রে।

মহর্ষিকে বাদ দিয়ে শান্তিনিকেতনের কথা ভাবা যায় না। শান্তিনিকেতনের তিনি কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠাতা নন্, অধিষ্ঠাতা। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তিনিও বাড়্‌তে থাক্‌বেন। তাঁর জীবনের গভীর শান্তি, প্রবল বিশ্বাস, উদার প্রেম প্রতি জীবনে সংক্রামিত হ'তে থাক্‌বে।

মহর্ষির মহত্ত্বই শান্তিনিকেতনের মূলধন, শান্তিনিকেতনের স্থান মাহাত্ম্য। এমন সৌভাগ্য অল্প শিক্ষায়তনেরই হয়। বর্ত্তমান ভারতে অন্য কোনো শিক্ষায়তনের তো নেই।

৩

বিদ্যা শেখানো শান্তিনিকেতনের মুখ্য কাজ নয়—শান্তিনিকেতন তো বিদ্যালয় নয়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ব্রহ্মচর্য্যের একটা লৌকিক অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে, কৌমার্য্য। আসলে, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবন-যাত্রাটাই হচ্ছে

ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচার্য্যের জন্য শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনের মুখ্য কাজ এমন একটি পরিমণ্ডল জোগানো যার মাঝখানে বাস করা আমাদের পরম শিক্ষার পক্ষে পরম আবশ্যক।

এমনি একটি পরিমণ্ডল রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হ'য়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের কী? গুরুদেব।

সত্যকে আমাদের চারিদিকে ছড়ানো পাচ্ছি; কিন্তু তেমন ক'রে পেয়ে আমাদের সুখ নেই, আমরা পেতে চাই কোনো একজন মানুষের সুপরিণত ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংহত রূপে, রঙ্‌কে যেমন রামধনুর ভিতরে পাই তেমনি। অত্যন্ত সহজ সত্যকেও আমরা গুরুর মুখ থেকে পেতে ভালোবাসি এইজন্যে যে, গুরুর ব্যক্তিত্ব তাতে একটি বিশেষ রস সঞ্চার করে।

আমি সেই গুরুবাদের সমর্থন করছি নে যাতে গুরু অভ্রান্ত দেবতা ও শিষ্য আত্মসম্মানহীন নিজত্বহীন অমানুষ। কিন্তু প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সেই যে প্রথা ছিল, গুরুর কাছে কেবল একটি বিশেষ বিদ্যা নয় গুরুর অখণ্ড ব্যক্তিত্বকে আয়ত্ত করতে হবে, তার ফলে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ ছিল প্রিয়জনের সঙ্গে প্রিয়জনের সম্বন্ধের মতো। আর পাঠ্যপুস্তক ছিল জীবন্ত মানুষ। এখন আমরা একজনের কাছে যাই গণিত শেখ্‌বার জন্যে, একঘণ্টা পরে আরেকজনের কাছে যাই ইতিহাস শেখ্‌বার জন্যে। এতে আমরা মানুষের চেয়ে মানুষের পাণ্ডিত্যকে দামি মনে করি এবং মানুষকে গণিতজ্ঞ বা ইতিহাসজ্ঞ ইত্যাদি হিসাবে খণ্ডভাবে চিনি।

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক নন, গুরু। পিতা যে রকম গুরু সেইরকম। তিনি আত্মীয় ও অগ্রণী। তিনি সকল কাজে ও খেলায় পূজায় ও পার্ব্বণে সকলের সঙ্গে ও সামনে আছেন। তিনি অপরিসীম পরিশ্রম করেন, তাঁর কীর্ত্তি তাঁর নিকটস্থ সকলের সম্মুখেই সৃষ্ট হ'য়ে উঠে। আশ্রমের কবি তিনি, নাট্যকার তিনি, নটগুরুও তিনি। আচার্য্য তিনি, মন্ত্রী তিনি, অর্থসংগ্রাহকও তিনি। সে কালের ভাষায় তাঁকে কুলপতি বল্‌তে পারা যায়।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বেসর্ব্বা বা ডিক্টেটর নন্‌। যে আসন তিনি পেয়েছেন সে আসন সবাই ভালোবেসে ও যোগ্য মনে ক'রে তাঁকে

দিয়েছে। এতে কারো আসন নীচু হয় নি, কারো মাথা নত হয় নি। রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যসম্রাট বললে যেমন কোনো সাহিত্যিকের আত্মকর্ত্তৃত্বে বা আত্মসম্মানে বাধা পড়ে না, এও তেমনি। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক সাহিত্যিকের চেয়ে এখনো প্রতিদিন বেশী লেখেন ভালো লেখেন ও বেশী রকম লেখেন। শান্তিনিকেতনের কর্ম্মীরা তাঁকে কর্ম্মীশ্রেষ্ঠরূপে পেয়েছেন ব'লেই তাঁকে পুরোভাগে স্থান দিয়েছেন।

৪

সাধারণত ইস্কুল স্থাপন করতে হ'লে আমরা কিছু টাকা তুলি, তাই দিয়ে বাড়ী তুলি ও মাষ্টার মজুত করি। অনেকে আবার শুধু বাড়ীটার বৃহত্ত্বের উপরেই বিশ্বাসী।

কিন্তু শান্তিনিকেতনের বাড়ীঘর যেমন তুচ্ছ, বিশেষজ্ঞেরও তেমনি অকুলান। আদিতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে ও তাঁর বাসগৃহ। সেকালে যেমন গুরুগৃহে শিষ্যকে সন্তানের মতো করে নেওয়া হতো তেমনি ক'রেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আরম্ভ হলো। তার আগে থেকে ছিল মহর্ষির পুণ্যস্মৃতি, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলো রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব। এই দুই আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে না পেরে ক্রমে ক্রমে অনেক আদর্শবাদীই সম্মিলিত হলেন। এ'দের জন্যে শান্তিনিকেতনের দেবার মতো ধনসম্পদ কিছু ছিল না, কেবল ছিল অবারিত আকাশ ও ধু-ধু করা মাঠ। সেখানে মানুষের আত্মা যে সহজ মুক্তিটি পায় তা শহরে পায় না। অনবরত বৃহৎ বিশ্বের তলে ও উপরে এবং বৃহৎ মানবের সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য সর্ব্বত্র হয় না।

সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, উইলিয়াম পিয়ার্সন, সি-এফ্ এণ্ড্রুজ্, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল বসু এ'রা প্রতিভাশালী ব্যক্তি। এ'দের প্রতিভাকে মূল্য দিয়ে কেনা যায় না, বেতন দিয়ে নিয়োগ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এ'দের প্রতিভাকে টেনেছে। এ'দেরকে সবাই জানেন ব'লেই কেবল মাত্র এ'দের নাম করলুম, নতুবা কেবলমাত্র এ'রাই যে শান্তিনিকেতনের ত্যাগী কর্ম্মী এমন নয়। শান্তিনিকেতনের আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এতদিনে সমস্ত পৃথিবীর হয়েছে, তাই পৃথিবীর নানা দেশ থেকে শান্তিনিকেতনে কর্ম্মী ও বন্ধু পাচ্ছে।

সেকালের নালন্দা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পুরুষদের ছিল,

তাই ভারতবর্ষের চিত্তকে তারা তেমন অধিকার কর্‌তে পারেনি যেমন পেরেছিল বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের তপোবনগুলি। শান্তিনিকেতনের গুরুপত্নী ও গুরুকন্যাদেরকে প্রথম থেকেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অঙ্গ জ্ঞান করা হয়েছে। ক্রমশঃ তাঁদের নিয়ে গুরুপল্লী গ'ড়ে ওঠে। তারপরে শিষ্যানীদেরকে দ্বার খুলে দেওয়া হয়। স্ত্রীশক্তির আনুকূল্য না পেলে কোনো বড় জিনিষ বাড়্‌তে পারে না। স্ত্রীরা কিছু না করুন, কেবলমাত্র নেপথ্যে উপস্থিত থাক্‌লেও পুরুষ কাজ করবার দম্‌ পায়। স্ত্রী-পুরুষের মিলিত কীর্ত্তি হ'য়ে শান্তিনিকেতন সরস হয়েছে। শান্তিনিকেতনে অত্যন্ত অল্প বয়স্ক বালক নেবার নিয়ম আছে। নারী না থাক্‌লে সে বেচারাদের কী দশা হতো তার নমুনা যে কোনো বোর্ডিং দেখ্‌লে হৃদয়ঙ্গম হয়।

৫

ভারতবর্ষের যা নিজস্ব ও শ্রেষ্ঠ তাকে বিশ্বের হাতে দেবার সময় এলো। বিশ্বভারতী নামের প্রচ্ছন্ন অর্থ বোধ করি এই যে, এখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষ অর্দ্ধনারীশ্বর হয়েছে; ভারতবর্ষের প্রবাহ বিশ্ব-সাগর সঙ্গমে উপনীত হয়েছে। বিশ্বভারতীর মন্ত্র, "যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্‌।" ভারতবর্ষের মাটি, বিশ্বের আকাশ; ভারতবর্ষের নীড়, বিশ্বের পাখা।

গত মহাযুদ্ধের দ্বারা প্রমাণিত হ'য়ে গেছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন কত জরুরি। দুর্ব্বার মিলন-প্রেরণা সব মানুষের ভিতরে আছেই, মিলন যদি ব্যাহত হয় তবে বিরোধ ঘটে। বিরোধ তো আর কিছু নয়, বিকৃত মিলন। প্রেমের ব্যাঘাতে যেমন ব্যভিচার, মিলনের ব্যাঘাতে তেমনি বিরোধ। মানুষের ইতিহাস ক্রমশঃ মহা মিলনের দিকে আস্‌ছে। তারই জন্যে রেল ষ্টীমার এরোপ্লেন, তারই জন্যে লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌স্‌। এত রকম যন্ত্র হলো, অভাব রইলো কেবল একটি নীড়ের। এমন একটি পরিমণ্ডলের প্রয়োজন যেখানে সব দেশের মানুষ আত্মীয়তার সুযোগ পাবে, নানা সম্বন্ধে জড়াবে। পরস্পরের প্রতি মমতার থেকে আসবে পরস্পরের সম্বন্ধে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে মানব-হিতকর কর্ম্ম।

বিশ্বভারতীর একটি ব্যক্তিগত দিকও আছে। নোবেল পুরস্কার

থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব যে অকৃপণ আতিথ্য দিয়ে এসেছে সে আতিথ্যের পরিশোধ তিনি কর্ত্তব্য মনে করেন। ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সভ্যতার মুখ্য প্রতিনিধির সম্মান ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সভ্যতারই সম্মান। ভদ্রতার খাতিরে বিশ্বকে আমন্ত্রণ ভারতবর্ষের হয়ে রবীন্দ্রনাথকে করতে হয়। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ভদ্রতার এই ইঙ্গিতটি সকলের চোখে পড়ে না। আমরা কি কেবল নিতেই থাকবো, কিছু দেবো না? হাজার গরীব হলেও কি আমাদের আত্মসম্মান থাকতে মানা?

বিশ্বভারতী ঠিক বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সব রকম বিদ্যা শেখানো তার উদ্দেশ্য নয়। বিশ্বভারতী আমাদের ঘরের সেই অংশটি যেখানে আমরা অতিথির সঙ্গে মিলিত হই—আমাদের ঘরের শ্রেষ্ঠ অংশটি। সেখানে বিদ্যালোচনা হয়, এই তার চরম পরিচয় নয়। সেখানে আলাপ অন্তরঙ্গতা হয়, সেখানে রঙের ও ভাষার ভিন্নতা এবং ধর্ম্মের বিভেদ হৃদয়কে পথ ছেড়ে দেয়।

বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের মহৎ অন্তঃকরণের উদ্যত দাক্ষিণ্য। বিশ্বভারতী মানব-মিলন-যজ্ঞে ভারতবর্ষের নৈবেদ্য।

৬

আগাছা আমরা তাকেই বলি প্রতিবেশীর প্রতি যার মমতা নেই, কৌতূহল নেই, নাড়ীর টান নেই। আমাদের শহুরে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি পরগাছা না হোক আগাছা। পাড়াপড়শীর সঙ্গে তাদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই।

শান্তিনিকেতন পদ্মপত্রে বারি বিন্দুর মতো নির্লিপ্ত নয়—চারিদিকের গ্রামগুলির সঙ্গে গোড়া থেকেই তার মৈত্রী আছে। ৭ই পৌষের মেলাতে প্রতিবেশী গ্রামের লোক শান্তিনিকেতনে মিলিত হয়ে আসছে; অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতিতে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা নিকটস্থ গ্রামের লোকের ভরসা। সাঁওতালদের জন্য শান্তিনিকেতনের কোনো কোনো অধ্যাপকও ছাত্র বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করেছেন।

শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতনের সেই অঙ্গ যে অঙ্গের নিত্যকর্ম্ম প্রতিবেশীদের সেবা, শিক্ষা ও নেতৃত্ব। শ্রীনিকেতনের কৃষিক্ষেত্র তাদের দৃষ্টান্তস্থল। শ্রীনিকেতনে তারা কুটীর শিল্পের শিক্ষা পায়।

ব্রতী বালক দলের পরিচালন-কেন্দ্র শ্রীনিকেতন। পল্লী কেমন করে তার লুপ্ত শ্রী ফিরে পাবে, এই হলো শ্রীনিকেতনের ভাবনা।

কেবল আমাদের দেশ নয় সকল দেশই শেষ পর্যন্ত পল্লীগত প্রাণ। রুপোর চাক্তি খেয়ে মানুষ বাঁচে না, বাঁচে কৃষিজ দ্রব্য খেয়ে। প্রাণের সঙ্গে যার এত নিবিড় যোগ সেই কৃষি ক্রমশঃ সমস্ত পৃথিবীতে বাণিজ্যের কাছে লাঞ্ছিত হচ্ছে। কৃষিকে আজকাল দরকারী একটা পেশা মনে করে আমরা ক্ষান্ত হই, কিন্তু এককালে কৃষিকে আশ্রয় করে কত কিম্বদন্তী কত গাথা কত ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচলিত হয়েছে। একদিন যা জীবনের জীবন ছিল আজ তাই একটা স্বল্পার্থকরী জীবিকা মাত্র।

শ্রীনিকেতন কৃষির দিক থেকেই বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

এছাড়া শ্রীনিকেতনের আরো একটা তাৎপর্যও আছে। মানুষের মাথার সঙ্গে মানুষের হাতের বিরোধ বর্ত্তমানকালের অন্যতম মহা সমস্যা বুদ্ধিজীবিতে শ্রমজীবিতে জাতিভেদের বাড়াবাড়ি প্রায় অস্পৃশ্যতায় পরিণত হয়েছে। এর প্রতিকার বুদ্ধিজীবিদের পক্ষ থেকে শ্রমজীবিদের প্রতি কার্য্যত সহানুভূতি প্রকাশ। মহাত্মা গান্ধী চরকার সুতোকে সহানুভূতির সূত্র করেছেন। শান্তি-নিকেতনের সহানুভূতি ব্যক্ত হচ্ছে শ্রীনিকেতন অন্তর্গত নানা মঙ্গল প্রচেষ্টায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হল চালনা ক'রে শ্রমিকের সহিত ভাবুকের মিতালী পাতালেন।

প্রাচীনকালের তপোবনগুলিও চতুর্দ্দিকের লোকালয়কে ভাব দিয়ে কর্ম্ম দিয়ে প্রীতি দিয়ে আপনার করেছিল। বটগাছের শিকড়ের মতো শান্তিনিকেতনের মূল অভিপ্রায় তেমনি করে আশপাশের মাটিকে শক্ত করে ধরল। এর পরে শান্তিনিকেতনকে উপ্ড়ে ফেললে তার চারিদিকের পল্লীগুলিকেও উপ্ড়ে ফেলা হয়। যদি কোনোদিন শান্তিনিকেতন বহির্জগতের বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তবে এইসব প্রতিবেশী পল্লী তার দুর্দ্দিনের আত্মীয় হবে।

৭

ইউরোপ খণ্ডে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য লক্ষ্য করেছি। ইউরোপের লোকের ধারণা শান্তিনিকেতনে এক প্রকার নতুন শিক্ষা

প্রণালীর পরীক্ষা চলেছে। এ ধারণা ভুল যদিও নয় তবু ঠিক্‌ও নয়। কারণ শান্তিনিকেতন শেখ্‌বার জায়গা নয়, থাক্‌বার জায়গা। অর্থাৎ অতি বৃহৎ অর্থে শেখ্‌বার জায়গা। এরূপ জায়গাকে ইউরোপীয় আদর্শে বিচার করা যায় না।

শিক্ষা আমাদের দেশের মতে ভগবানের কাছ থেকে—প্রকৃতির কাছ থেকে পাবার জিনিষ। গুরু কেবল সহাধ্যায়ী মাত্র। তিনিও শেখেন, আমরাও শিখি। ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস মাঠ ও গাছ থেকে আমরা পাই অপরিসীম ঔদার্যের শিক্ষা। আমাদের প্রতি দিনের শিক্ষয়িত্রী যে প্রকৃতি তার মধ্যে আমরা দেখি অপরিসীম শান্তি। আমাদের অসংখ্য পশুপাখী পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে এমন সহজ ভাবে ঘর করছে যে অস্তিত্বের জন্যে করাল সংগ্রাম ইত্যাদি আমাদের মনে আসে না।

শান্তিনিকেতনের শিশুরা গাছতলায় ব'সে বিদ্যাভ্যাস করে; আকাশের এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি তাদের দৃষ্টি যায়; পাখীরা তাদের অনতিদূরে কণ্ঠাভ্যাস করে ও পশুরা চরে বেড়ায়; তাদের গায়ে গাছের পাতা খ'সে পড়ে ও হাতের কাছে প্রজাপতি ওড়ে। জীবনের এই যে বিচিত্র স্বাদ এই তাদের শিক্ষা। বৃহত্তম রিয়ালিটীর সঙ্গে তাদের সমস্ত ক্ষণ পরিচয়! অথচ এ এক নতুন শিক্ষা প্রণালীর প্রয়োগ নয়, এ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম তপোবনের অনুসরণ। এতে উপকরণের বাহুল্য নেই। বল্‌লে কম বলা হয়, এতে উপকরণের বালাই নেই।

তবে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা একেবারে বর্ব্বর নয়। তারা যে ঘরে খায় সে ঘরের আস্‌বার নিজেরা তৈরি করেছে নিজেদের খেয়ালের ষ্টাইলে। মামুলী টুল টেবিল দেখে দেখে যাঁদের কল্পনাশক্তি অসাড় হ'য়ে গেছে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের খেয়াল তাঁদের কল্পনাশক্তিকে ঝাঁকানি দেবে। তারপর তারা যে সব বাড়ীতে থাকে সে সব বাড়ী ভারতীয় বাস্তুকলার পুনর্জন্মের নিদর্শন। বড়লোকের ছেলেদের জন্যে বড় বড় বাড়ী সব দেশে আছে, কিন্তু একটা প্রাচীন দেশের পুনর্জাত বাস্তুকলার সঙ্গে সম্বন্ধের রোমান্স্‌ শান্তিনিকেতনের ছেলেদের জীবনে জুটেছে।

ছেলেদের যাঁরা গুরু তাঁরা শিক্ষক বা শিক্ষাতত্ত্ববিৎ নন্‌ সে

ছেলেদের উপর দিয়ে শিক্ষা প্রণালীর পরীক্ষা করচেন। তাঁদের কেউ বা চিত্রকর কেউ বা বাস্তুশিল্পী। তাঁরা নিজের কাজ ক'রে যান্, ছেলেরা দেখে ও যোগ দেয়, শেখে ও শেখায়। গুরুতে শিষ্যে মিলে ভারতীয় চারু ও কারু শিল্পের নব যুগ প্রবর্ত্তন কর্ছেন।

শান্তিনিকেতনকে যদি ইউরোপে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা কর্তেই হয় তবে মধ্য যুগের ফ্লোরেন্স্ বা সিয়েনা বা আসিসি'র সঙ্গে। এক প্রকার উপনিবেশ—তাতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পাশাপাশি থেকে নিজের নিজের বৃহত্তম শিক্ষা ও স্বাভাবিক কর্ম্ম সম্পাদন করেন।

জাতীয় শিক্ষা

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দেশে আবার নূতন করিয়া জাতীয়-শিক্ষার আন্দোলন সুরু হইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত সকল রকম বিলাসিতা বর্জ্জনপূর্ব্বক ব্যয়সংকোচ করিয়া যাহা বাঁচাইতে পারিয়াছেন, জাতীয়-শিক্ষার সাহায্যার্থ তাহাই দান করিয়া দেশ-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। এই উপায়ে কি পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আমরা জ্ঞাত না থাকিলেও, শিক্ষায় স্বাবলম্বনের চেষ্টা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আজ মনে পড়ে ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তারা সেইই প্রথম ইস্তাহার জারি করিয়া স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মাতৃমন্দির-দুয়ার হইতে দূরে রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাঙালীর চিত্তনদ প্লাবিত করিয়া তখন ভাবের বন্যা আসিয়াছিল—বাঁধ ভাঙিবার শক্তিও তাহার জন্মিয়াছিল। তাই দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত ছাত্র-মণ্ডলী শিক্ষা-বিভাগের আইন অমান্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিলেন না। ফলে রংপুরের সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বাণীর মন্দির হইতে বিতাড়িত হইলেন—স্বদেশী-সভায় যোগদান করিবার অমার্জ্জনীয় অপরাধে!

নিরীহ ছাত্র বেচারাদের শিক্ষার পথ যখন এইরূপ রুদ্ধ হইয়া গেল, দেশের নেতৃবৃন্দ নিজেদের ছেলেদের শিক্ষার ভার নিজেরাই গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। সর্ব্বাগ্রেই রংপুরে একটি জাতীয়-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে কলিকাতায় বঙ্গীয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ গঠিত এবং একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইল। মফঃস্বলেও পনের-কুড়িটি জাতীয় বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল। কলিকাতার বিদ্যালয়ে যাঁহারা অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি বাংলাদেশে খুব কমই ছিলেন। প্রথম প্রথম বেশ ছেলে জুটিতে লাগিল। সকলেই মনে করিলেন বেশ কাজ হইবে।

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের বয়স যত বাড়িতে লাগিল, অনুপাতে

ছাত্রসংখ্যা ততই কমিয়া গেল। অনেক ছাত্র কাঁচিয়া গণ্ডূষ করিয়া সরকারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। অধ্যাপকদের মধ্যেও একে একে অনেকে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সাত আট বৎসরের মধ্যেই জাতীয়-বিদ্যালয় নামক একটা বিশেষ কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যে বাংলাদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সাধারণ বাঙালী তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইল।

মাদ্রাজ হইতে নতুন করিয়া এই আন্দোলন সুরু হইবার কিছুদিন পূর্ব্বেও বাংলায় জাতীয়-শিক্ষা সম্বন্ধে বেশি কিছু শুনা যাইত না – যদিও মাণিকতলার পঞ্চবটী উদ্যানে তখনও দেশভক্ত সাধকগণ জ্ঞানদানে নিযুক্ত ছিলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বাংলায় জাতীয়-শিক্ষার আন্দোলন সাফল্যলাভ করে নাই। কেহ কেহ এ কথা স্বীকার করিতে রাজী নহেন। তাঁহারা যে-সব নজীর উপস্থিত করেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন সফল হইয়াছে—এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। তাঁহারা বলেন, যেহেতু জাতীয়-বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত জনৈক-ছাত্র কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ভূষিত অনেক ছাত্রকে পরাভূত করিয়া আপন যোগ্যতার পরিচয় দিয়া সরকারী যাদুঘরে চাকরী পাইয়াছেন এবং শিল্পবিভাগের ছাত্রেরাও জীবিকার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, সেই হেতু বলিতেই হইবে যে, জাতীয়-শিক্ষার প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল হইয়াছে।

উদরের দাবী অবশ্য অবহেলা করা চলে না। কিন্তু জাতীয়-শিক্ষার উদ্দেশ্যও যদি কেবলই চাকরীলাভ হয় তাহা হইলে দেশে ভিন্ন-একটি প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক কি? সে হিসাবে বরং বঙ্গীয় শিল্প বিদ্যালয়ের (Bengl Technical Institute) মত অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে শিক্ষার চরম লক্ষ্যই হইতেছে চাকরীলাভ। সে শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় কথাটা প্রয়োগ না করাই ভাল। কারণ, এই দুর্ভাগা দেশে - যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব খুবই বেশি এবং প্রজার অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যই যেখানে রাজপুরুষদের নিকট কুঅভিপ্রায় প্রণোদিত বলিয়াই মনে হয়, সেখানে জাতীয়-বিদ্যালয়ের – ছাপমারা ছাত্রদের যে শুধু কম হইবে তাহাই নয়, সতত ছিদ্রান্বেষণে নিযুক্ত সি. আই. ডির জাগ্রত

কর্ম্মচারীদের কুনজরেও তাহারা নিশ্চতই পড়িবে। প্রকৃত পক্ষে হইয়াছেও তাহাই। সরকারের এই সবজান্তা বিভাগ হইতে যখন তখন জাতীয়-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নামধামের তালিকা তলব করা এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষক বা অধ্যাপকদের কার্য্য হইতে অপসারিত করিবার অনুরোধ প্রকারান্তরে আদেশ -জাতীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাসে বিরল নহে। এমত অবস্থায় ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় ক'টি ছাত্রের জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করিবার জন্যে জাতীয়-শিক্ষার নামে অনর্থক অর্থব্যয় না করিয়া সে অর্থ সর্‌কারী বিদ্যালয়ে দান করিলে দান করিলে অধিক সংখ্যক ছাত্রের উপকার হওয়াই সম্ভব। আমাদের মনে হয়, এই জন্যই স্বর্গীয় পালিত মহোদয় নয়, সতত ছিদ্রান্বেষনে নিযুক্ত সি আই ডির জাগ্রত কর্ম্মচারীদের ছাপমারা ছাত্রদের আদর যে শুধু কম হইবে তাহাই জাতীয় বিদ্যালয়ের দান রহিত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত অধিক অর্থ দিয়া গিয়াছেন এবং স্বয়ং জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের সভাপতি হইয়াও ডাক্তার স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ও তদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

তবে কি বুঝিতে হইবে যে, জাতীয়-শিক্ষার আন্দোলন করিয়া কিছু লাভ হইবে না? জাতীয় শিক্ষা চাই-ই কিন্তু তার লক্ষ্য হইবে না চাকরীর অন্বেষণ সে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হইবে, তৎসম্বন্ধে দেশের অনেকে নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

কেহ কেহ জাতীয়শিক্ষার সাহায্যে ব্রহ্মচার্য্যাশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতঃ ছাত্রদের ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া ভারতের গরিমময় অতীত ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। উদ্দেশ্য মহৎ, সন্দেহ নাই। কিন্তু হাজারো চেষ্টা করিয়া কখনও কি অতীতকে ঠিক তাহার পুরাতন মূর্ত্তিতে ফিরাইয়া আনা যায়? আমাদের মনের এককোণেও এই ভাব পোষণ করা সঙ্গত হইবে না যে, আবার ভারতের পল্লীতে পল্লীতে নব নব তপোবন রচিত হইবে—সেখানে ঋষিরা সব তপস্যায় মগ্ন থাকিবেন, সামগানে গগন পবন মুখরিত হইবে—এক কথায় সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে। শিক্ষা, সে যতটা খাঁটিভাবে 'জাতীয়' হউক না কেন ভারত আর কখনো সেদিন ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না।

এখন আমরা জাতীয় শিক্ষার যতই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করি না কেন, রাষ্ট্রীয় উন্নতির সহায়তা করিবে বলিয়াই যে বাংলাদেশে এই শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। তখন আমরা চাহিয়াছিলাম জাতির প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে বাদ সাধিয়াছিলেন বলিয়াই না আমরা বন্ধন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়াছিলাম- সরকারী বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া বাহির হইলে চাকরী পাওয়া যায় না, অথবা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না, এ কথা বিচার করিয়া নহে।

মূলের এই কথাটা গোপন রাখিয়া দেশে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা পুরাতনের প্রতি যত বেশি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলাম—দেশের লোক দূর হইতে ততই শিক্ষা বিধিকে সংস্কার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। কারণ দেশের লোক পুরাতনের পুনরাগমনের অপেক্ষায় তত ব্যাকুল হইয়া বসিয়া নাই, যত তাহাদের ব্যাকুলতা রাষ্ট্রীয় লাভের ক্ষেত্র।

লোকমান্য তিলক মহোদয় দেশে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টায় জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়াছেন। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন ঃ

'...But where the people and the Government have different ideals of Citizenship before them ere the governing class wauts to keep the people own inspite of their desire to rise so the status of citizenship in the Empire, there arises the necessity of National Education as distinguished form Governmental Education, Viewed in the light, National Education is only a means to the attainment of self-government and those who demand Home-Rule for India cannot but zealously support a movement for the establishment of National Education in this country.'

ইহার তাৎপর্য এই যে, দেশে জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা তখনই

উপলব্ধ হয়, যখনই প্রজার স্বত্ব ও দাবী লইয়া শাসক ও শাসিতদের মত-বৈষম্য উপস্থিত হয় এবং রাজশক্তি যখন প্রজার অন্তরের আশা ও আকাঙ্ক্ষা চাপিয়া দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। এই হিসাবে যে শিক্ষার দ্বারা রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের যোগ্য হওয়া যায়, তাহাই হইতেছে জাতীয় শিক্ষা : এবং তিনিই এই শিক্ষা বিধির সমর্থন করিবেন, যিনি হোমরুল বা স্বায়ত্ত শাসন প্রার্থনা করেন।

বাংলায় জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের কেহ এ কথাটা এমন স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন নাই। অথচ শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ হর্ণেল বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন -

'...It is so utterly inadequate to the progressive realisation of Responsible Government, that nothing less than a change throughout the entire structure will suffice to secure the objects now envisaged.'

অর্থাৎ, বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি দেশের লোকদিগকে স্বায়ত্ত শাসন লাভের উপযুক্ত করিয়া গড়িবার পক্ষে এতই অনুপযোগী যে, ইহার আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে আসন্ন শাসন সংস্কার কিছুতেই সফল হইবে না।

জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন সফল করিতে হইলে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শ স্পষ্ট করিয়া দেশের লোকদিগকে বুঝাইতে হইবে। কলিকাতা অথবা বড় বড় সহরে সরকারী বিদ্যালয়ের অনুরূপ—কেবল একটু পরিবর্ত্তিত আকারে— দু'দশটা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতীয় শিক্ষা সার্থক হইবে না। জাতীয় শিক্ষা সফল করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে হর্নেল সাহেব সত্যই বলিয়াছেন :

"........If the people are to govern, and ultimately it is the people that must govern always and everywhere, then the people must be education and that as quickly as possible."

অর্থাৎ, দেশের লোকদিগকেই যদি দেশ শাসন করিতে হয়—যাহা সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বত্রই তাহাদিগেরই করা উচিত -তাহা হইলে দেশের লোকদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

আমরা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সর্‌কারের কৃপাকণা প্রার্থনা করিয়া পাই নাই, নিজেরাও এ পর্য্যন্ত কোনপ্রকার চেষ্টা করি নাই। বঙ্গীয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ চেষ্টা করিলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কৃষি ও ব্যবসা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছেন। শিল্প ও ফলিত বিজ্ঞান (applied sciences) শিক্ষার সুবন্দোবস্তও যাহাতে হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের ইহার জন্য অর্থব্যয় করিতে হইবে না।

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের অধীনে কলিকাতায় একটি উচ্চশ্রেণীর কলেজমাত্র থাকিবে। বাণীর এই পবিত্র মন্দির হইতে নবীন কর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত যুবকের দল বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হইবে উপেক্ষিত অনাদৃত কোটী কোটী নরনারীর অভাব মোচন করা—তাদের কাজ হইবে জ্ঞানদান, অন্নদান, পতিতের পরিত্রাণ। তাদের সুখের আদর্শ থাকিবে একটু নূতন ধরণের—স্বেচ্ছায় নব নব অভাবের সৃষ্টি করিয়া তাহারা জীবনযাত্রা দুর্গম করিয়া তুলিবে না। তাহাদের মাঝে কোথাও এতটুকু কৃত্রিমতা থাকিবে না। অবসরকালে চিন্তাবিনোদন করিবার জন্যই তাহারা দেশে কাজে নিযুক্ত হইবে না। যতটুকু শক্তি তাহারা অর্জ্জন করিয়াছে তার সবটুকুই নিঃশেষ করিয়া ব্যয় করিবে দেশের ও দশের জন্য।

বঙ্গীয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের চেষ্টায় কোনদিন যদি বাংলাদেশে এমন ক'জনা কর্ম্মীর সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে -কেবল তাহা হইলেই মাত্র জাতীয়-শিক্ষা সার্থক ও সফল হইবে। নতুবা তাহারা সর্‌কারের যাদুঘরে চাক্‌রী কেন, লাটসাহেবের শাসনপরিষদের প্রধান সদস্যের পদে অধিষ্ঠিত হইলেও বাংলাদেশের বেশি কিছু আসিয়া যাইবে না।

হিন্দুর জাতীয় শিক্ষা

যতীন্দ্রমোহন সিংহ

টাকশাল হইতে King George এই ছাপমারা মুদ্রার ন্যায় আমাদের ছাত্রগণ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একই ডিগ্রির ছাপমারা হইয়া বাহির হইতেছে। তাহাদের সকলের কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতেছে সত্য, কিন্তু যাহা-দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন চরিত্রের, বিভিন্ন মানুষ প্রস্তুত হয়, তাহাদের সে প্রকার শিক্ষা হইতেছে কি ?

তাহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া দেখে, সংসারের সকল মানুষই এক প্রকার নহে। তাহাদের বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন আকৃতি, বিভিন্ন প্রকৃতি আছে। প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন বিশেষত্ব আছে, যাহা তাহাকে অন্য জাতি হইতে পৃথক্ করে। এই বিশেষত্বর স্থলে স্রষ্টার এক হইতে বহু হইয়া সৃষ্টিলীলা প্রকাশের ইচ্ছা। স্রষ্টার সৃষ্টির অর্থ হইতেছে বিচিত্রতা প্রকটন (differentiation); এইরূপে জগতের বিচিত্রতাই সৃষ্টির অবস্থা, আর সাম্য হইতেছে প্রলয়ের অবস্থা। যে শিক্ষা দ্বারা সব মানুষ এক ছাঁচে গড়া হয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে ; কারণ তাহা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলা প্রকটনের সাহায্য হয় না। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু, বিভিন্ন প্রকার মানব প্রকৃতি, বিভিন্ন প্রকার মানুষের আকৃতি ও বিভিন্ন প্রকার মানুষের ভাষা। যে শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির বিশিষ্টত্ব বিকসিত হয়, তাহাই তাহার প্রকৃত শিক্ষা।

আমাদের ভারতবর্ষের, হিন্দুস্থানের, হিন্দুজাতির বিশেষত্ব কি তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের শাস্ত্রে কর্ম্মভূমি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মভূমির অর্থ ধর্ম্মকার্য্য সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যত প্রকার শীতোষ্ণাদির প্রভাব আছে, এক ভারতবর্ষে তাহা সমস্ত আছে। ভারতবর্ষে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতু বর্ত্তমান ; পৃথিবীর অন্যান্য দেশে

ইহার দুইটি, তিনটি অথবা চারিটির বেশী নাই। ইউরোপ ও আমেরিকায় বৎসরের অধিকাংশ সময়ে প্রবল শীত থাকে, সেই শীতের সঙ্গে আবার বৃষ্টি ও তুষারপাত ক্রমাগত লাগিয়াই আছে। সে সব দেশে হেমন্ত ও বসন্ত নাম মাত্র আছে। ভারতবর্ষে এই ষড় ঋতুর প্রভাবে প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচুর শস্যশালী ফুলফলে পূর্ণ। ভারতের নির্ম্মল আকাশ যেরূপ শশিসূর্যের প্রভায় সৌন্দর্যশালী আর কোন দেশই সেরূপ নাই। সুতরাং আমাদের ভারতবর্ষ সৌন্দর্য্য ও শস্যসম্পদে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। এদেশে উদরের অন্ন সংস্থানের জন্য লোককে আগে প্রাণপাত করিতে হইত না, সেজন্য বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশের লোক আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। এই কারণেই ঋষিগণ ভারতের কর্ম্মভূমি ও যজ্ঞভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণে কথিত আছে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি কেবল এই ভারতবর্ষের নানাস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এই বারাণসী ক্ষেত্রে সেইরূপ কতশত যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য এই স্থানে হিন্দুর যজ্ঞে এতদূর পবিত্র। অদ্যাবধি দশাশ্বমেধ ঘাট সেই সকল দেব যজ্ঞের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

আবার ভারতবর্ষের প্রদেশ সকল সপ্তসিন্ধু, পঞ্চনদ, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সরযু ব্রহ্মপুত্র নর্ম্মদা-কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীগণের দ্বারা বিধৌত হইয়াছে। এই সকল নদনদী দেবতাত্মা হিমালয় বিন্ধাচল হইতে পবিত্র মৃত্তিকারাশি বহন করিয়া আসিয়া ভারতের ভূমি গঠন করিয়াছে। সুতরাং ভারতের প্রত্যেক ধূলিকণা পবিত্র। এই কারণে ভগবান্ নারায়ণ পুনঃ পুনঃ ভারত ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। এই কারণে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিন্ন সতীদেহের প্রত্যেক অঙ্গ এই ভারতবর্ষে পতিত হইয়াছিল। সকলেই জানেন সেই সকল স্থান মহাপীঠ রূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে। ভারতের আকাশ বাতাস অরণ্য গিরিগুহা নির্ঝর নদীতীর সকল তপঃ সাধনের অনুকূল, সেজন্য এখনও কতশত সাধু সন্ন্যাসী ইহার নানাস্থানে সাধন ভজনে নিযুক্ত আছেন। পৃথিবীর আর কোন দেশে এরূপ সৃষ্টি দেখা যায় না।

পৃথিবীর অন্য জাতির মধ্যেও ঈশ্বরপরায়ণতা এবং যথেষ্ট ধর্ম্ম-ভাব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু পার্থিব সুখকেই তাহারা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য summuen (bonuer) বলিয়া মনে কর। হিন্দু-জাতি ধর্ম্মজীবন লাভ ও ঈশ্বর প্রাপ্তিকেই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া চিরদিন মনে করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণে অভিলাষি হইয়া তাঁহার দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে তাঁহার বিষয় বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, বৃদ্ধ কামিনী মৈত্রেয়ী বলিলেন "ভগবান্, আপনি যদি আমাকে বিত্তপূর্ণ সমগ্র পৃথিবীও দান করেন, আমি তাহা দ্বারা কি অমৃতত্ত্ব লাভ করিব।" "যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, অমৃতত্বলাভ করিবে না।' মৈত্রেয়ী কহিলেন, "তবে আমি বিত্ত লইয়া কি করিব! আমাকে অমৃতত্ত্ব লাভের উপদেশ প্রদান করুন।" সেই অমৃতত্বলাভই হিন্দুজাতির জীবনের আদর্শ। হিন্দুজাতি এই অমৃতত্ব লাভকে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের উপরে স্থান দিয়াছে। বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণের সময় এই কথা শুনাইয়া দিয়া আসিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন হিন্দুজাতির পার্থিব সুখসম্পদ্ বিমুখতাই তাহাদের অধঃপতনের কারণ, এই কারণেই ভারত পরাধীন হইয়াছে। হিন্দুজাতি সংসারকে অনিত্য বলিয়া মনে করে, "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" হইতেছে তাহাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র. সেজন্য তাহারা পার্থিব সুখসম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করে না, এবং এই কারণেই তাহারা সুখসম্পদ হারাইয়া আজ বিদেশীর পদানত হইয়াছে।

আমি একথা স্বীকার করি না। "কা তব কান্তা কস্তে পুত্র" ইহা হইতেই সন্ন্যাসীর কথা। হিন্দুজাতির সকল লোকই সন্ন্যাসী নহে। পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের সুখভোগের চেষ্টা বিলক্ষণ ছিল, এবং এখনও আছে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই সকল উচ্চবর্ণের জীবন প্রণালী মম্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা শাসিত হইত ; কারোই উচ্চবর্ণের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ্য, পরে বানপ্রস্থ, এবং সর্ব্বশেষে ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিতে হইত। ইচ্ছা করিলেই কেহ প্রথমেই বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিত না। শূদ্রের ত সন্ন্যাসে অধিকারই ছিল না।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"শৈশবেহভ্যস্ত বিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনি বৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ আমি যে রঘুবংশীয় রাজাদিগের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য রঘুবংশ লিখিতেছি, তাঁহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করিতেন, যৌবনকালে বিষয়াকাঙ্ক্ষা করিয়া রাজ্যশাসন শত্রুজয় প্রভৃতি কত কীর্ত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই বিষয়ভোগ তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই; বৃদ্ধকালে তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তপস্যার জন্য বনগমন করিতেন, এবং অন্তিমকালে যোগাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিতেন।

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে আমরা জানিতে পারি, ভারতের অধিকাংশ নৃপতির ইহাই জীবনের আদর্শ ছিল। হিন্দুর সেই গৌরবময় যুগে প্রধান প্রধান নরপতিগণ রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন; তদুপলক্ষে তাঁহাদিগের কত যুদ্ধবিগ্রহ হইত, তাঁহারা কত দেশ জয় করিতেন, কত রাশি অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং তাহা অকাতরে ব্যয় করিতেন। এক এক জন রাজা অনেকগুলি করিয়া বিবাহ করিতেন এবং অনেকগুলি করিয়া সন্তানোৎপাদন করিতেন। "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ভাবিয়া সন্ন্যাসী হইলে কি এ সকল সম্ভব হইত।

প্রকৃত বিষয়বৈরাগ্য লাভ করা বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল। আজন্ম সন্ন্যাসীদের ও কদাচিৎ সে অধিকার জন্মিয়া থাকে। দেবী ভাগবতে আছে, মহাত্মা শুকদেব জন্মগ্রহণ করিয়াই সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ব্যাসদেব তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ গার্হস্থ্য অবলম্বন করিবার জন্য কত প্রকার বুঝাইলেন। অবশেষে তাঁহাকে গৃহী হইয়াও কি প্রকারে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, ইহা শিক্ষা করিবার জন্য রাজর্ষি জনকের নিকট পাঠাইলেন। এই জনক রাজাই ছিলেন পূর্ব্বকালের একজর আদর্শ নৃপতি। তিনি সমোপযুক্তরূপে রাজ্যশাসন ও রাজসুখ ভোগ করিতেন, অথচ তাঁহার মন পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর ন্যায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যাদি মহর্ষিগণের সঙ্গে তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন, অথচ রাজার কর্ত্তব্যকার্য্য

সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতেন।

ঐতিহাসিক যুগে হিন্দুজাতি এই উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ঐহিক সুখলাভকেই—তাহারা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করিত, বানপ্রস্থ অবলম্বন ত বহুকাল হইতেই উঠিয়া গিয়াছিল, এমন কি কালের প্রভাবে ধর্ম্মের অনুশাসনও তাহারা গ্রাহ্য করিতেন না। ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ ভোগসর্ব্বস্ব হইয়া ক্ষীণবীর্য্য, যুদ্ধবিমুখ এবং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া পড়িল। তাহার ফলেই ভারতবর্ষ পরাধীন হইল।

বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সমস্ত লোকই ত পার্থিব সুখভোগের জন্য লালায়িত, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। সকলেই উদরের জন্য "হা—অন্ন" "হা—অন্ন" করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, এবং নানাপ্রকার হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। এমন শতকরা ৯৯ জন সাধু সন্ন্যাসীরও ঐ দশা। সুতরাং হিন্দুজাতির পরকাল সর্ব্বস্ব হওয়ার অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

তবে একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দুজাতি পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যাপেক্ষা ধর্ম্মকেই বেশী আদরণীয় মনে করিত। দুইজন সাহেবের পরস্পর দেখা হইলে, কথা হয় কে কয়টা জানোয়ার শিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দুইজন বাঙ্গালীর দেখা হইলে কথা হয়, কে কত টাকা জমাইতে পারিয়াছে। পূর্ব্বকালে দুইজন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইলে, এক জন আর একজনকে প্রশ্ন করিতেন, "অপি তাপস্তে বর্দ্ধতে ?" আপনার তপস্যা কত দূর অগ্রসর হইয়াছে ? এখন অর্থ যেমন আভিজাত্যের গৌরব সূচনা করে, পূর্ব্বকালে তপঃ সেই স্থান অধিকার করিত। তাই এক জন কপর্দ্দক শূন্য ছিন্নাবস্থাবলম্বন তপস্বীর চরণতলে রাজেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তীর মণিময় মুকুট লুণ্ঠিত হইত। তপঃ কেবল বানপ্রস্থাবলী তপস্বীদের নহে, গৃহস্থ শ্রমীর ও গৌরবের মাপকাঠি (Standard of wasth) ছিল। সেকালে গৃহস্থাশ্রমীরাও পার্থিব সুখ সম্পদ লাভের জন্য—কেহ বা সুন্দেয় অস্ত লাভের জন্য, কেহ বা অমরবয় লাভের জন্য, কেহ বা অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য তপস্যা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জাতির কত উদ্যোগী

পুরুষ সিংহ, কেহ বা হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিবার জন্য, কেহ বা চির তুষারাবৃত উত্তরমেরু আবিষ্কারের জন্য, কেহ বা নব নব বৈজ্ঞানিক অন্য আবিষ্কারের জন্য, জীবন তুচ্ছ করিয়া কত দুঃসাহসের কার্য্য করিতেছেন। ইহাই ত পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য তপস্যা। প্রাচীনকালে হিন্দুগণ পারমার্থিক সম্পদ লাভের জন্য ইহা অপেক্ষা কত কঠোর তপস্যা করিতেন। ইহাই হিন্দু জাতির একটা প্রধান বিশেষত্ব। বর্ত্তমান সময়েও দেখিতে পাই ; ধর্ম্ম লাভের জন্য হিন্দু যতটা ক্লেশ স্বীকার, যত কঠোরতা অবলম্বন করেন, তত কোন জাতিই পারে না। এখন পর্য্যন্তও কত নরনারী তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হিমাচলের দুরধিগম্য কেদার বদরী মানসরোবর, পশুপতিনাথ প্রভৃতি স্থানে কত ক্লেশ সহ্য করিয়া, কেহ বা জীবন তুচ্ছ করিয়া পদব্রজে যাইতেছেন। যখন পুরী পর্য্যন্ত রেল পথ হয় নাই, তখন রথযাত্রার সময় কত সহস্র সহস্র নরনারী হাঁটা পথে কেহ বা দশ পনের দিন কেহ বা এক মাস অনবরত চলিতেন, তাহার মধ্যে কত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের চলিতে চলিতে পায়ের তলা ক্ষত বিক্ষত হইত, তাহার উপর নেকড়া বাঁধিয়া তাঁহারা চলিতে থাকিতেন, সে চলার কিছুতেই বিরাম নাই—আবার কত জন কলেরা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পথিপার্শ্বেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইতেন। ধর্ম্মের জন্য এতটা করিতেছে, এতটা স্বার্থত্যাগ আর কোন্ দেশে আছে ? ইহাও এক রকম তপস্যা।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সন্তানদিগকে পার্থিব ও পারমার্থিক উভয় বিষয়ে পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। হে আমার ছাত্রবন্ধুগণ ! তোমরা সেই তপস্যায় ব্রতী হও। কিন্তু সেজন্য তোমাদিগকে লোটা কম্বল সম্বল করিয়া গিরি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। তোমরা গৃহে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাসের জন্য তপঃ সাধন কর, চরিত্র গঠনের জন্য তপঃ সাধন কর, মনুষ্যত্ব লাভের জন্য তপঃ সাধন কর।

আমাদের শাস্ত্রেই আছে, 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ''—ছাত্রদের বিদ্যাভ্যাসই তপস্যা ॥ এখানে তপস্যার অর্থ—Singleminded devotion—গভীর একাগ্রতা। বিদ্যালাভ করিতে হইলে সেই গভীর একাগ্রতা আবশ্যক। চরিত্র গঠনের জন্য যেরূপ তপঃসাধন

করিতে হইবে, তাহা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় অতি সুন্দররূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তপঃকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—"শারীর তপঃ", "বাচিক তপঃ", এবং "মানস তপঃ"।

"দেব দ্বিজগুরু প্রাজ্ঞপূজনং শৌচ মার্জ্জবং ;
ব্রহ্মচর্য্যসহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে ॥"

দেব দ্বিজ গুরু ও প্রাজ্ঞজনের পূজা অর্থাৎ উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, শৌচাচার, ঋজুতা অর্থাৎ সরল ব্যবহার, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা ইহাকেই শারীর, তপঃ বলে।

"অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যপ্রিয় হিতাকযাৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙময়ং তপ উচ্যতে ॥"

সত্য, প্রিয় অথবা হিতজনক এবং অন্যের চিত্তে অনুদ্বেগজনক বাক্য ব্যবহার এবং বেদাধ্যয়ণকে বাঙময় তপঃ বলা যায়।

"মনঃ-প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌন মাত্ম বিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধি রিত্যেতৎ তপোমানস সুচ্যতে ॥"

চিত্তের প্রসন্নতা ও সৌম্যভাব, মৌনাবলম্বন, ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিগ্রহ এবং ভাবশুদ্ধিকে মানস তপঃ বলা হয়।

গীতায় প্রোক্ত এই ত্রিবিধ তপঃ একজন প্রকৃত সাধকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ইহার মধ্যেই আমরা হিন্দুর জাতীয় শিক্ষার প্রণালী পাইতেছি ; ছাত্রদিগের চরিত্র গঠনের জন্য ইহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়।

(১) শরীরতপের মধ্যে পিতামাতা গুরুজন ও অধ্যাপকদিগের যথোপযুক্ত পূজা অর্থাৎ তাঁহাদের সম্মান করা, তাঁহাদের বাধ্য হইয়া চলা উচিত। শৌচাচার পালন করা উচিত, তাহা দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় এবং মন পবিত্র হয়। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা অর্থাৎ বীর্য্যধারণ করা উচিত। অনেক বালকই কুসঙ্গে পড়িয়া নানাপ্রকার কুঅভ্যাস আরম্ভ করে, তাহার দ্বারা শরীরের বল, চক্ষুর জ্যোতিঃ এবং মনের উৎসাহ ও প্রফুল্লতা নষ্ট হয়। সেরূপ কুঅভ্যাস সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বীর্য্যধারণ দ্বারা একো গুণের বৃদ্ধি হয় ; আমাদের শারীরিক ও মানসিক বলের মূল হইতেছে সেইওজোগুণ। শাস্ত্রে আছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন-লভ্যঃ"—বলহীন ব্যক্তি

কখনও আত্মা বা ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্ম লাভ তা দূরের কথা, বলহীন ব্যক্তি পৃথিবীর কোন সুখসম্পদই লাভ করিতে পারে না। পূর্ব্বকালে বিদ্যার্থিগণ গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন। বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে দার পরিগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। আজকাল অনেক অভিভাবক কলেজের পড়া শেষ না হইলে যুবকদিগের বিবাহ দেন না। অবশ্য অনেকে বিবাহের বাজারে তাহাদের দর বাড়াইবার জন্য এরূপ করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, ইহা দ্বারা সেই যুবকদিগের উপকারই হইয়া থাকে, যদি তাহারা কুসংসর্গে পড়িয়া কুপথে না চলে।

এই প্রসঙ্গে একথা বলা আবশ্যক, কুসঙ্গীর ন্যায় খারাপ পুস্তকও বালকদিগের পক্ষে অপকারী। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত বাহিরের বই পড়িতে বলেন। ভাষা শিক্ষার জন্য তাহার প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেই সকল পুস্তক বিশেষ বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইতে হইবে। আজকাল স্ত্রীপুরুষের ব্যাভিচারের কথা পরিপূর্ণ অনেক নাটক নভেল গল্পের বইয়ের দ্বারা বাজার ছাইয়া গিয়াছে। বালকবালিকাদিগের মধ্যে সেই সকল আপাত রমণীয় বই পড়িবার আগ্রহ অত্যন্ত বেশী দেখা যায়। কোন কোন ক্ষমতাশালী গ্রন্থকার তাঁহাদের আর্টের গুণে তাঁহাদের পুস্তক সকল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক করিয়া রচনা করেন। কিন্তু তাহাতে যে বিষটুকু লুকান থাকে তাহা অলক্ষিত ভাবে তরুণ তরুণীদিগের তরলচিত্তে প্রবেশ করিয়া চিত্তবৃত্তি কলুষিত করে। সেই সকল পাপ চিত্রের সহিত ক্রমাগত মনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে পাপের, প্রতি মনের সহজাত ঘৃণা কমিয়া যায় এবং নিজেরও সুযোগমতো পাপ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপে কুগ্রন্থ কুসঙ্গীর ন্যায় তরলমতি বালকবালিকা-দিগকে পাপের পথ চিনাইয়া দেয় এবং ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়। সেই জন্য এই সকল পুস্তক বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।

প্রাচীনকালে ব্রহ্মচারীগণ স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিতেন না। যাঁহারা অরণ্যে বাস করিতেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল, এখন নগরে অথবা পল্লীসমাজে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে

ইহা অসম্ভব। তবে সমস্ত স্ত্রী জগন্মাতার অংশ, স্ত্রীলোক মাত্রেই মাতৃস্থানীয় বাল্যকাল হইতে এই প্রকার শিক্ষা বদ্ধমূল হওয়া উচিত। স্ত্রীজাতিকে মাতৃভাবে দেখিবার অভ্যাস করিলে বালকগণের চরিত্র কলুষিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। শারীরিক বল বৃদ্ধির জন্য কুস্তি, লাঠিখেলা, ক্রিকেট প্রভৃতি ব্যায়াম একান্ত আবশ্যক। সুখের বিষয় এ বিষয়ে বালকদিগের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়! সন্তরণের ও দৌড়ের প্রতিযোগিতা দ্বারা অনেক বালক ও যুবক খ্যাতি লাভ করিতেছেন। কিন্তু এই সকল ব্যায়ামচর্চার একটা regularity (শৃঙ্খলা) থাকা আবশ্যক। বালোচিত উৎসাহের বশে যেন মাত্রা ছাড়াইয়া না যায়। শৃঙ্খলার সহিত অভ্যস্ত হইলে ব্যায়ামকেও শারীর তপঃ বলা যাইতে পারে।

(২) বাঙ্ময় তপের মধ্যে প্রধান কথা হইতেছে দুইটি—সত্য কথা ও শাস্ত্রাধ্যয়ন। সকলে সত্য বাক্য বলিবে, কিন্তু কেবল সত্য নহে—সে সত্যবাক্য অন্যের হিতজনক হইবে, প্রিয় হইবে এবং কাহারও মনে পীড়া দিবে না। কিন্তু অন্যের প্রিয় হইবে বলিয়া কদাচ মিথ্যা বাক্য বলিবে না। যে সেরূপ বাক্য বলে, তাহার নাম চাটুকর। চাটু বাক্য বা তোসামোদ দ্বারা অন্যের হিত না হইয়া অহিতই হইয়া থাকে। সেই জন্য গীতা বলিতেছেন, তোমার বাক্য অন্যের প্রিয় হইবে অথচ হিতজনক হইবে। অনেক সময়ে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অপ্রিয় সত্য বাক্যও ব্যবহার করিতে হয় এবং তাহা অন্যের মনে পীড়াও দেয়। তাহা অবশ্য মিথ্যা বলা অপেক্ষা ভাল। মিথ্যা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। একাগ্রচিত্তে শাস্ত্রধ্যয়ন ও বাঙ্ময় তপস্বা বলিয়া গণ্য। এ বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ পরীক্ষা পাশ করিতে হইলে বাধ্য হইয়াই বালকদিগকে পাঠ্য পুস্তক পড়িতে হইবে। তবে অপাঠ্য, কুপাঠ্য পুস্তক পাঠে যে অনিষ্ট হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৩) মানস তপের প্রধান কথা হইতেছে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তের প্রসন্নতা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। কাম ক্রোধ ঈর্ষ্যা অসূয়া হিংসা প্রভৃতি রিপু প্রবল হইয়া আমাদের মনে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করে। চিত্তপ্রসন্ন নির্ম্মল রাখিতে হইলে এই সকল রিপুকে দমন করা আবশ্যক, তখন চিত্তবীচিবিক্ষোভশূন্য প্রশান্ত সরোবরের ন্যায়

স্থির ও শান্ত হয় এবং সেই প্রশান্ত নির্ম্মল চিত্তে, প্রশান্ত সরোবর বক্ষে শশাঙ্ক কিরণের ন্যায় জ্ঞানালোক প্রতিফলিত হয়। আমাদের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা বিষয়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য লালায়িত। তাহারাই বাহির হইতে কামক্রোধাদি রিপুর আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয়। সুতরাং এই সকল রিপু দমন করিতে হইলে, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে শাসনাধিনে রাখা আবশ্যক। চক্ষু একটি সুন্দরী রমণীতে জগজ্জননীর প্রকাশ না দেখিয়া যদি ভোগ্যভাব অবলোকন করে, তবে তাহাকে কঠোর শাসন করিতে হইবে। কর্ণ যদি সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে ইচ্ছুক না হইয়া পরনিন্দা বা কুকথা শ্রবণের জন্য লালায়িত হয়, তবে তাহাকে শাসন করিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। যে স্থানে সেরূপ কথা উচিত নয়, অনেক সময়ে সেইরূপ কথা বলার প্রবৃত্তি হয় সেই জন্য বাক্ সংযম এবং মৌনাবলম্বন অভ্যাস করা উচিত। অনেক সময়ে ক্রোধবশে আমরা লোককে কটু কথা বলিয়া ফেলি, সেই সময় মৌনাবলম্বন করিলে অনেক অশান্তি হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও দেশহিতৈষি বাগ্মী ৺অম্বিকাচরণ মজুমদারের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি ক্রোধের বশীভূত ছিলেন এবং ক্রোধ হইলে লোককে কটু কথা বলিতেন। এই জন্য তাঁহার বৈঠকখানায় কয়েক খানা ফলকে বড় বড় অক্ষরে "আবার" "চুপ কর" প্রভৃতি বাক্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইলেই, এই সকল লেখা দেখিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিতেন। পরে এই ক্রোধ দমিত হইয়া তাঁহাকে একজন অসাধারণ তেজস্বী পুরুষে পরিণত করিয়াছিল।

গীতোক্ত এই তপঃসাধন একটা মস্ত moral discipline অর্থাৎ আত্মনিগ্রহ। হিন্দুর শিক্ষার মূলে এই প্রকার আত্মনিগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আজকাল আত্মনিগ্রহের নামে অনেকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাঁহারা বলেন, একটি গাছ যেমন মাটির রস, আলোক উত্তাপ পাইয়া স্বভাবের নিয়মে বাড়িয়া উঠে, মানুষকেও সেইরূপ স্বভাবের নিয়মে বাড়িতে দাও। কতকগুলি কড়া নিয়মের অধীনে ফেলিয়া তাহার স্বাভাবিক পরিণতির পক্ষে

বাধা জন্মান উচিত নহে। কেহ কেহ একথাও বলেন, বালক ও যুবকদিগকে তাহাদের স্বাধীন প্রবৃত্তির বলে উদ্দাম গতিতে ছুটিতে দাও, তাহারা তাহাদের নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে নিজের উপযোগী উপকরণ সকল বাছিয়া লইয়া স্বভাবের নিয়মে বার্দ্ধত হইবে। শাস্ত্রের শাসন কিম্বা স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ের পীড়ন যেন তাহাদের স্বাভাবিক পরিণতির কোন বাধা না জন্মায়। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সবুজ পত্র" নামক মাসিক পত্রিকায় নব্য যুবকদিগকে সমাজ ও শাস্ত্রের শাসনের খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া উন্মুক্ত আকাশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার সেই উপদেশ অনুসারে স্থানে স্থানে "সবুজ সংঘ", "নবযৌবনের দল" প্রভৃতি যুবক সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু এই স্বভাবের নিয়মে পরিণতির ও বৃদ্ধির সম্বন্ধে মানুষের সহিত উদ্ভিদের, এনন কি ইতর জন্তুর কোন সৌসাদৃশ্য নাই। উদ্ভিদ ইতর জন্তু সকল প্রকৃতির মাতার ক্রোড়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াই, তিনি তাহাদিগের লালনপালনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের মন বুদ্ধি বিচারশক্তি আছে বলিয়া মানুষ সব বিষয়ে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া চলিতে চায়। নিজের বুদ্ধিবলেই সে নিজের পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেই পথে চলে এবং উপযুক্তরূপে শিক্ষা না পাইলে পদে পদে তাহার ভুল হইয়া তাহার বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। পূর্ব্ববর্ত্তী মানবগণ সংসারের পথে চলিয়া যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রাকারে প্রথিত হইয়া আছে। শাস্ত্র জ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া মানুষকে পথ দেখাইয়া দেয়। ইহা দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইলেও পরিণামে তাহার মঙ্গলই হয়।

দ্বিতীয় কথা এই, মানুষের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ দুর্দ্দমনীয়; মানুষ স্বভাবত শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়কেই পায়। কিন্তু প্রেয় অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা রমণীয় কেবল তাহাই বরণ করিলে, প্রবৃত্তির ইন্ধনে ঘৃত জোগান হয়। তাহা দ্বারা মানুষের দুর্দ্দমনীয় কাম ক্রোধাদি রিপু অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন

করিতে পারে। এই কারণে শাস্ত্রের ৯ গুরুজনের শাসনের অধীন থাকিয়া সংযম শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

কয়েকদিন পূর্ব্বে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ভারত গৌরব শ্রীযুক্ত স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন সভায় ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"Many misgivings are agilating your mind, some of you thought of setting yourselves adrift from the retraint mispoșed in a place of learning, mistaking the necessary discipline as . oercion in ensuring a spirit of subserviency. Did you ever realise that the most irresistable force is that who is held in restraint, and that this is the only period of your life when you can acquire that habit of restraint and of discipline ?"

অর্থাৎ—

তোমরা হয়ত কেহ কেহ ভাবিতেছ, তোমাদিগকে বিদ্যালয়ে কঠোর শাসনের অধীনে আনিয়া তোমাদের স্বাধীনতালোপের চেষ্টা করা হইতেছে, সেজন্য তোমরা এই স্বাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া বাহির হইবে। কিন্তু একথাটা তোমরা একবার কি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছ যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় শক্তিই তাহা, যাহাকে বাধা দিয়া ধরিয়া রাখা হয়, এবং তোমাদের জীবনের সময়টাই তোমাদের আত্মনিগ্রহ অভ্যাস কেবল এক করিবার পক্ষে অনুকূল।

নদীর স্রোতের বেগ কখনু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দমনীয় হয় ? যখন সেই স্রোতের মুখে এ একটা বাঁধ দিয়া তাহাকে বাধা দেওয়া হয়। যে ইঞ্জিনের অপ্রতিহত শক্তিতে রেলগাড়ী অথবা ষ্টীমার চলে, তাহার বল বয়লারের মধ্যে আবদ্ধ বাষ্পরাশি হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং আত্মনিগ্রহের দ্বারা যুবকদিগের যে স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হয়, তাহা তাহাদের ভবিষ্যতে কর্ম্ম করার জন্য শক্তিসঞ্চয় মাত্র—ইহার অপর নাম Conservation of energy. মহাত্মা গান্ধী ইহাকে Gathering of soul force বলিয়াছেন। সুতরাং

যৌবনমদে মত্ত হইয়া শাস্ত্র এবং সমাজের বিধি নিষেধের বেড়া ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়াতে কিছুমাত্র পৌরুষ নাই। তাহাতে বরং কুষ্টাস্বারূঢ় ব্যক্তির মত গর্ত্তে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

আত্মনিগ্রহে দুঃখ আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু যে সুখ অগ্রে অমৃতের ন্যায় ও পরিণামে বিষের তুল্য, তাহা অপেক্ষা যে সুখ অগ্রে বিষোপম ও পরিণামে অমৃত-তুল্য. তাহাই সকলের বাঞ্ছনীয়। ইহা গীতায় শ্রীশ্রীভগবানের উক্তি।

স্যার জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্-জীবনের সহিত মনুষ্য-জীবনের তুলনা করিয়া জগতীয় শিক্ষার অনুকূলে আর একটি মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন,—

"What is the source of strength that confers on the tree its great power of endurance, by which it emerges Victorious from all peril ? It is the strenght derived form the place of its bortli, its perception and quick readjustment to change and its inherited necessary of the past. The afflorsence of life is then the supreme gift of the place, and its associations. Insoluted from these, what fate awaits the poor Wrcteh nurtured only in the alien thought and ways ? Death dogs his footsteps and annihilation is the nievitable end."

একটি গাছ যে শক্তির দ্বারা নানা বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া উঠে তাহার সেই, শক্তির মূল কোথায়? না যে শক্তি সে তাহার জন্মস্থান হইতে, তাহার অতীতের স্মৃতি হইতে এবং তাহার চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত নিজের সামঞ্জস্য রক্ষা করার শক্তি হইতে প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তাহার জীবনধারণের মূল শক্তিটা তাহার জন্মস্থানের ও তৎসম্বন্ধীয় আবহাওয়ারই উৎকৃষ্ট দান। এই সকল হইতে বিচ্যুত হইয়া যদি সে কেবল বিজাতীয় চিন্তা বা ভাবের ধারা পরিপুষ্ট

হইতে চায় তবে তাহার অদৃষ্টে কি ঘটবে ? না অবশ্যম্ভাবী বিনাশ ও মৃত্যু।

হিন্দুজাতি পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আজ এই জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে বাঁচিতে হইলে তাহার দেশীয় ও জাতীয় ভাবের ধারাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। একটি উদ্ভিদ্ যেমন তাহার উৎপত্তি স্থানের স্মৃতিকর রস সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার বীজ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া বাহিরের বিপদকে তুচ্ছ করিয়া জীবন ধারণ করে আমাদিগকেও সেইরূপ আমাদের জাতীয়ভাব ও পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। একটি গাছ যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে জীবনধারণ করে, আমাদিগকেও পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তনের সহিত সুর মিলাইয়া চলিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা পরানুকরণের দ্বারা কখনও আত্মবিলোপ করিব না। আমাদের জাতির পূর্ব্ব মহাপুরুষগণ প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া আমরা চলিব।

হিন্দুর জাতীয় শিক্ষা অতি উদার তাহা কখনও হিন্দুকে সঙ্কীর্ণতা শিক্ষা দেয় না। সেই শিক্ষা হিন্দুকে অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা শিক্ষা দিতেই পারে না। আমরা আমাদের ইষ্ট দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে "জগদ্বিতায় কৃষ্ণায়" বলিয়া প্রণাম করি! তিনি কেবল হিন্দুজাতির সোভাগের রক্ষক নহেন, তিনি জগতে হিত কর্ত্তা। দৈত্যকুমার প্রহ্লাদ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া প্রত্যাগত হইল, হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! বল দেখি রাজা মিত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, আর শত্রুর সহিতই বা কিরূপ ব্যবহার করিবেন।

তদুত্তরে পহ্লাদ বলিলেন—

"সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র-কথাকুতঃ ॥
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণু-ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্তুতোঽয়ং মিত্রঃ মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্‌কুতঃ ॥"

হে পিতঃ! জগন্ময় জগন্নাথ গোবিন্দ যখন পরমাত্মা-রূপে সর্ব্বভূতের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তখন মিত্র তার শত্রু এরূপ কথা

কেন ? ভগবান্ বিষ্ণু তোমাতে আছেন, আমাতে আছেন, অন্যত্রও আছেন। সুতরাং ইনি মিত্র, ইনি শত্রু এরূপ ভেদজ্ঞান থাকিবে কেন ?

এই প্রকারে উদার শিক্ষা পৃথিবীর আর কোন্ জাতির মধ্যে আছে ? প্রহ্লাদ অবশ্য জন্মান্তরীণ সুকৃতি বলে শৈশবেই এই পরমার্থ তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ হিন্দুগণ জীবনব্যাপী শিক্ষা ও আচারানুষ্ঠান দ্বারা ইহা লাভ করিতে পারেন। হিন্দুর প্রতিদিনের তর্পণ মন্ত্রে দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীকেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জল গণ্ডুষ দান করিবার বিধি রহিয়াছে। আজকাল কথায় কথায় বিশ্বমানবতা বিশ্বপ্রীতির কথা জানিতে পাই, কিন্তু তাহা মুখের কথা নহে; তাহা জীবন-ব্যাপী এই প্রকার সাধনার দ্বারাই লাভ হইতে পারে।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ভারতবর্ষে হিন্দুজাতি কি প্রকার শিক্ষার (Culture) দ্বারা এক সময়ে পার্থিব সুখ সম্পদ ও পারমার্থিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। হিন্দু সন্তানগণ যদি তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব ও পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগকে সেই পূর্ব্বতন শিক্ষার ধারা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে, আমরা যে কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এক সময়ে দেবগণও এখানে জন্মগ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করিতেন। এই পুণ্যভূমিতে একদিন বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিরা রাজ ধর্ম্ম ও সত্যপালন শিক্ষা দিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া গীতার ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক ধর্ম্মরথ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ পূর্ব্বক অহিংসা ও মৈত্রী ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্বৈত্যজ্ঞান ও লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য আবির্ভুত হইয়া আচণ্ডালে প্রেম বিলাইয়াছিলেন। এতগুলি মহাপুরুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার মৃত্তিকাজল আকাশ বাতাসের একটা পুণ্যপ্রভাব অবশ্যই আছে। এই সকল মহাপুরুষ উপদেশ দ্বারা ও তাঁহাদের জীবনের কার্য্যাবলী দ্বারা সে সকল শিক্ষা প্রদান করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। আসুন আমরা সেই সকল শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিয়া এই পুণ্যভূমির উপযুক্ত সন্তান হই।

হিন্দু বালিকার শিক্ষা

নিরুপমা দেবী

আমরা হিন্দুনারীরা আজ সমাজের যে কোথায় আছি তাহা বোধ হয় দেশের মনস্বিনীদিগকে বেশী বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। আমাদের বহরমপুরে নারীশিক্ষার প্রাথমিক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার সম্ভাবনায় এই কথাই আমাদের দেশবাসীকে পত্রযোগে জানাইয়াছিলাম যে "ঘরের কাজে সাহায্যে মাত্র নিজেদের স্বার্থের সংসারে মাত্র—আমাদের আর পুরিয়া রাখিও না, দেশের জ্ঞানের ক্ষেত্রে—শিক্ষার ক্ষেত্রে—ত্যাগের আদর্শের ক্ষেত্রেও তোমাদের ভগিনী কন্যাদের তোমরা ডাক।" একদিন এ ডাক ভারতে ছিল, নারীদের এ স্থানও এদেশে ছিল। যে ধর্ম্ম জগতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই ভারতেরই এবং তাহার ভিক্ষুণী-সংঘ একদিন আমাদের দেশের নারীদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের ত্যাগের সেবাধর্ম্মের মুক্তিক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া ধরিয়াছিল, একদিন সঙ্ঘমিত্রা তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সিংহলে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন আজ আমাদের কোথায়!

এই জ্ঞান-পিপাসা—মানবের এই চিরন্তনী তৃষা এ আমাদের বহু আদিম যুগের সম্পত্তি। একদিন আমাদেরই একজন নারী ব্রহ্মবাদিনী গার্গীরূপে জনক যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবেত্তা মীমাংসা-সভার নেত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিশ্ববারী বাচক্লবী একদিন বেদের সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী একদিন জগৎকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম", সেই জ্ঞানস্বরূপের দিকে চাহিয়া উদাত্তস্বরে প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন—

"অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্ম্মামৃতং গময়।"

একদিন মণ্ডনমিশ্র-শঙ্করাচার্য্য বিচার সভায় উভয়ভারতী

বিচারক আচার্য্যার পদ পাইয়াছিলেন। লীলাবতী খনা একদিন আমাদের ঘরেই জন্মগ্রহণ করিত। তাই আবার বলি সেদিন আজ আমাদের কোথায়! কিন্তু আজ এই আশ্রমের সাংখ্যতীর্থা ব্যাকরণতীর্থা উপাধিধারিণী এবং বেদান্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীদিগকে দেখিয়া সেইদিনের কথাই আমাদের মনে হইতেছে।

আমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়েদের জীবনে মাত্র দুটো পথ আমাদের সমাজ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। এক—বিধবা হইয়া সমাজের দয়ার পাত্রী ভাবে দিন যাপন করা, দ্বিতীয়—বিবাহান্তে জীবনযুদ্ধে অসমর্থ স্বাস্থ্য অর্থ-হীন স্বামীর সঙ্গে অপটু রুগ্ন দুর্ব্বল সন্তানদলকে জগতে আনিয়া অবিরত অনশন ও আধিব্যাধি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সংসারধর্ম্ম যতটুকু সম্ভব পালন করা ; এই তো আমাদের সমাজের সাধারণ নারীজীবনের চিত্র। নারীর সুখ সৌভাগ্যের ঘরের কথা অবশ্য একটু স্বতন্ত্র কিন্তু জ্ঞানালোকের অভাবে সেখানেও অন্য প্রকার দুঃখের অভাব নাই। আমরা আমাদের মেয়েকে বিধবা করিয়া রাখার কল্পনাকে তত ডরাই না তাহাদের চির কৌমার্য্যের কল্পনাকে যতটা ডরাই, আজ দেশকে এই কুপ্রথার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এই আশ্রমাধিষ্ঠাত্রী চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী মাতা আমাদের ডাক দিতেছেন। আজ তিনি আমাদের দেশকে মনে করাইয়া দিতেছেন যে আমাদের আর একটা পথও আছে যাহা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ একেবারেই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রেও কুমারী কন্যার তপশ্চর্য্যা ও জ্ঞানচর্চ্চার প্রমাণ অনেক আছে। বৌদ্ধ-যুগের সংঘমিত্রা অনাথপিণ্ডদসুতা সুপ্রিয়া প্রভৃতির কথা অনেকেই জানেন। লোকসমাজের দত্ত দুইটি ছাড়া আরও যে একটি স্বতঃ অধিকার—যাহা শিক্ষিত ও জ্ঞানানন্দী জীবের ঈশ্বরদত্ত চরিত্রগত বস্তু সেই ব্রহ্মচর্য্যাচরণেও যে আমাদের মেয়েদের অধিকার আছে সেই কথাও মাতাজী আমাদের সম্মুখে জ্বলন্তরূপে প্রমাণ করিয়া দিতেছেন। তাঁহার আজীবন তপস্যার ফল তিনি এইরূপে আমাদের জন্য ব্যয়িত করিতেছেন। দেশের অনেকগুলি অনাথা বিধবা এবং অসহায়া নারীদেরও তিনি আশ্রয় ও শিক্ষাদান

করিতেছেন। বহুদিনের চেষ্টায় কতকগুলি সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণী "মাতৃসঙ্ঘ" গঠন করিয়া সম্প্রতি তিনি দেশবাসীকে দেশের নিজস্ব আদর্শে মজ্জাগত সংস্কারের সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহাদের কন্যাগণকে শিক্ষাদিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। আজ তাঁহার অবৈতনিক হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়ে ১৩৫ জন ছাত্রী! আশ্রমেও অনেকগুলি বালিকা পূর্ব্বতম যুগের গুরুকুলে বাস করার আদর্শে বাস করিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ইঁহাদের প্রদর্শিত জাতীয় নারী-আদর্শে চরিত্র গঠিত করিলে, কালে এই বালিকারা যে সমাজের কতখানি মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে তাহা দেশের ও সমাজের কল্যাণকামী ব্যক্তি-মাত্রেই বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন। সকল মেয়েরই কিছু উচ্চ-শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষমতা থাকে না, অভিভাবকেরাও মেয়েদের সন্ন্যাসিনী বা ব্রহ্মচারিণী করিবার উদ্দেশ্যেই এ বিদ্যালয়ে পাঠান না। যে মেয়ের অন্তরের যে দিকে প্রবণতা সে মেয়ে এই আশ্রমে সেই দিকের উপযুক্ত আদর্শদৃষ্টান্তে শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদের জীবন সেইভাবে গঠন করিয়া লইতে পারিবে, যেটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে এই ধারণাই আমার মনে উদিত হইতেছে। এখানে বিদ্যালয়ে পড়ার পর আর একবৎসর পড়িলেই মেয়েরা ম্যাট্রিক দিতে পারে তাহাদের এমনি ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়। সংস্কৃত এখানে প্রথম হইতেই ভালরূপে পড়ানো হইয়া থাকে।

এখানে একটী কথা প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইতেছে। বিশ্ব-বিদ্যলয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এই সংস্কৃত ভাষাকে ইচ্ছামূলক শিক্ষায় পরিণত করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। এ বিষয়ে বেশী কিছু বলিতে আমি সংকুচিত হইতেছি, কেননা এ বিষয়ে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা আমার খুবই কম। তবে দুই একজন অভিজ্ঞের মুখে একথাও শুনিয়াছি যে সংস্কৃতকে ম্যাট্রিকক্লাশে বাধ্যতামূলক শিক্ষায় পরিগণিত করিলেও কোনই ক্ষতি নাই। শিক্ষা বোর্ডের যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের দরকার ইহা একবাক্যে সকলেই বলেন। আমার নিজের ধারণামত আমি মাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে, যে ভাষায় আমাদের হিন্দুদের যথাসর্ব্বস্বই নিহিত আছে সে ভাষাকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যন্ত ইচ্ছামূলক শিক্ষার ভাবে

না রাখিলেই বোধ হয় দেশের মঙ্গল হয়। সংস্কৃত ভাষার মূল্য এখন প্রায় সমস্ত সভ্য জগৎই বুঝিতেছেন। সভ্য জগতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন এই আদিম মাতৃভাষার সম্মান হইতেছে। অথচ আমাদেরই দেশের পুত্রকন্যারা ষোলো সতের কিম্বা তদূর্দ্ধ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিজেদের ঘরের এই রত্ন-ভাণ্ডারের সঙ্গে একেবারে নিঃসম্পর্কীয় ভাবে থাকিবে ইহা আমার অন্যায় বলিয়াই মনে হয়। আমাদের অতীত যুগ অতীত সাহিত্য সব এই ভাষার অঙ্কেই নিহিত। আমাদের গৌরবের যাহা কিছু সব এই দেবভাষার সঙ্গে একান্ত সংশ্লিষ্ট অথচ আমাদের দেশের কত কত শিক্ষিত সন্তানও যে এই ভাষার সঙ্গে চিরদিন প্রায় অপরিচিতই থাকিয়া যান ইহা দেশের কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়। দেশের এই আদিম ভাষাকে শিক্ষার প্রথম হইতেই বাধ্যতামূলক শিক্ষায় পরিগণিত করিলে দেশের ছেলেমেয়েদের যে কল্যাণই হইবে একথা দেশের বেশীর ভাগ লোকই বোধ হয় অনুমোদন করিবেন।

এখানে দুঃখের সঙ্গেই আর একটী কথাও একটু তুলিতে হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে দেশের ভাই ভাইরা এখনো স্থানে স্থানে যে বিরুদ্ধমত পোষণ করেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিষয়েই আমাদের বহরমপুর সভায় আমাদের সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ যুক্তিতর্কের কথা তাঁহাদের জানাইয়াছিলাম। যাঁহারা এই শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের সম্মুখে আজ সেসব কথার উত্থাপনকে আমার বাহুল্য এবং প্রগলভতা প্রকাশ বলিয়াই মনে হইতেছে। তবে তাঁহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই মাত্র দুটি একটী কথা বলিতে চাই। আর্য্য বলিয়া— জগতের আদিম সভ্যজাতি বলিয়া যাঁহারা একটী বিশিষ্ট গৌরব ভাব মনে রাখেন তাঁহারা যেন একথাটাও ভাবিয়া দেখেন যে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হইয়া আজ তাঁহারা সভ্য সমাজের কোন্ পর্য্যায়ে পড়িতেছেন? যাঁহাদের মধ্যে এই আদর্শবাদের কোন স্থানই নাই তাঁহারাও নিশ্চয় একথা স্বীকার করিবেন যে এই জীবনযুদ্ধের দিনে মেয়েদেরও ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ খানিকটা শিক্ষা না দিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে নানা ভীতির সম্ভাবনা আছে। মেয়েদের বিবাহের জন্য মাত্র যথেষ্ট অর্থব্যয়ে বাধ্য

থাকিয়া পিতামাতার এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। কন্যার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সম্ভাবনাও তাঁহাদের এখন মনে রাখিতে হইবে। দেশে এখন আর সেই একান্ন পরিবারের সংঘযুক্ত ভাব নাই। মাত্র স্বামীর অভাবে মেয়েরা এখন শ্বশুর ও পিতৃ উভয়কুলেরই ভার-স্বরূপ হইয়া থাকে। সেই দিনে তাহারা যেন অকূল সমুদ্রে না পড়ে পিতামাতাকে এখন এ কথাটাও ভাবিয়া রাখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের দুর্ভাগিনী নারীজাতির শেষ আশ্রয় স্থান ধর্ম্মক্ষেত্র কাশীধামে এখন বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে জীবনোপায়বিহীনা কোন কোন নারী শৈশবে যে শিক্ষার সুযোগ পান নাই, মধ্য বা শেষ বয়সে নানারূপে সেই শিক্ষার কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়া নানাকর্ম্মে নিজের দিনপাত করিতেছেন। ছেলের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন মেয়ের পড়ার খরচও কিছু ধরিয়া রাখিতেই হইবে। এ আশ্রমের বিদ্যালয়ে যে পিতা-মাতারা কন্যাদের শিক্ষা দেবার সৌভাগ্যলাভ করিবেন তাঁহাদের আরও একটু সুবিধা এই যে বিদ্যালয়টি অবৈতনিক। আশ্রমের বোর্ডিংয়ে যাঁহারা মেয়ে রাখেন একান্ত অসমর্থ হইলে তাঁহাদের বোর্ডিং খরচাও দিতে হয় না। আশ্রমে এইরূপ মেয়েই বেশীর ভাগ। গৌরীমাতা আজ দেশের মেয়েদের অবস্থার অনুকূল এত বড় প্রতিষ্ঠানই আজ দেশকে দিতেছেন।

আমরা কল্পনাস্বপ্নের এই জাগ্রত সত্য প্রতিষ্ঠানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সেই স্বপ্নের আরও একটু অংশ আজ এখানে নিবেদন করিতে চাই। কার্য্যবিবরণীতে আশ্রমের উদ্দেশ্য তিনটীর কথা (১) হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের অনুযায়ী স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, (২) সদ্বংশজাতা দুঃস্থা বালিকা এবং অসহায়া মহিলাদিগকে আশ্রয় দান ও তাহাদের জীবনধারণোপযোগী কার্য্যকরী শিক্ষাদান এবং (৩) আদর্শ নারীজীবন যাপনের পথে সহায়তা করার কথা জ্ঞাত হইয়াছি। এখানে সাধারণ লেখাপড়া ব্যতীত রন্ধন, সাংসারিক কাজকর্ম্ম, সুতাকাটা, তাঁতবোনা, সেলাই দর্জ্জির কাজ প্রভৃতিও শেখানো হইয়া থাকে। আমি আজ আরও একটু আশা মাতাজীর চরণে নিবেদন করিতেছি। মেয়েদের এইসব শিক্ষার সঙ্গে সেবা-ধর্ম্মের অন্তর্গত চিকিৎসা বিদ্যারও কিছু কিছু অনুশীলন

করাইলে বোধ হয় ভাল হয়; তাহারা দেশের সেবিকাই হোক বা গৃহধর্ম্মেই প্রবেশ করুক সর্ব্বত্রই এবিদ্যার প্রয়োজন বিশেষ ভাবেই আছে। আর আশাকরি মাতাজী এবং আশ্রমের মাতৃসঙ্ঘ এই পুণ্য-প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশঃ বাংলার দেশে দেশে শাখায় শাখায় বিভক্ত করিয়া ঘরে ঘরে ইহার ক্রমবিস্তৃতির চেষ্টাও করিবেন। এই আদর্শ হিন্দুদের ঘরে ঘরে সত্য হইয়া উঠুক ইহাই আজ আমার একান্ত কামনা।

মন্তেসরি শিক্ষা

মায়া সোম

অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকা শিশু-শিক্ষায় অগ্রণী। শিক্ষাকে শিশুর স্বাভাবিক রুচি ও প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া তুলিতে আজ তাঁহারা ব্যস্ত। নিজেদের ইচ্ছা, নিজেদের কর্ত্তৃত্ব, নিজের শাসন শিশুর উপর চালাইয়া, আজ তাঁহারা উহার স্বাধীন প্রকৃতির অবাধ উন্নতির পথে অস্বাভাবিক বাধা উপস্থিত করিতে প্রস্তুত নহেন। দেড় শতাধিক বৎসর ধরিয়া শিশুর মন লইয়া এই সংগ্রাম চলিতেছে। খ্যাতনামা শিক্ষাসংস্কারকদিগের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশু তাহার ন্যায্য দাবীর পূর্ণ অংশ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে শিশু-শিক্ষার জন্য যে সকল প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে মন্তেসরি প্রণালী অন্যতম। এই প্রণালী বর্ণনার পূর্ব্বে শিশুর স্বভাব ও মনস্তত্ত্ব কিছু জানা আবশ্যক।

শৈশব অভ্যাস গঠনের উপযুক্ত সময়। কেন না এই বয়সে শিশুরা যাহা শিক্ষা করে তাহার ফল কিয়ৎ পরিমাণে স্থায়ী হয়, এই জন্য শৈশবে উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। শিশুদের সাত আট বৎসর পর্য্যন্ত বিচার বুদ্ধির পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায় না, কোন বিষয়ের কার্য্য-কারণ নির্ণয়ে তাহারা অক্ষম। এইজন্য এই বয়স পর্য্যন্ত তাহারা যাহাতে নিজেদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া বহির্জগতের সকল প্রকার জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিশুরা যাহাতে নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া ও স্পর্শ করিয়া বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহার আয়োজন করা আবশ্যক।

শিশুদিগের ক্রীড়ার প্রতি অনুরাগ মাতৃক্রোড় হইতেই দেখা যায়। এই খেলাধুলার মধ্য দিয়াই উহারা গৃহে শিক্ষালাভ করিতে থাকে। অনেক পিতামাতা শিশুদিগের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা

করেন না, সুতরাং গৃহে তাহাদিগের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন না। এই অভাব দূর করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকাতে শিশুদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। মন্তেসরি প্রণালী মতে শিশুদিগের খেলাধূলার মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। আজ আপনাদের মন্তেসরি প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

কুমারী মারিয়া মন্তেসরি তাঁহার প্রণালী মতে প্রথমে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন রোমের এক সামান্য পল্লীর আদর্শ গৃহে। তিনি রোম নগরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ও পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। কুমারী মারিয়া মন্তেসরি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইতালী দেশ শিক্ষা-সম্বন্ধে কুসংস্কারে পূর্ণ ছিল। মেয়েদের শিক্ষার খুবই অভাব ছিল, অধিকন্তু শিক্ষিতা রমণীদের কেহ ভাল চক্ষে দেখিত না, সুতরাং লেখাপড়া শিখিতে তাহাদের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। তখনকার দিনে লেখা পড়ার তেমন চর্চা না থাকিলেও কুমারী মন্তেসরি লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেশের প্রচলিত লোকমত, সমাজের কুসংস্কার ইত্যাদি সব উপেক্ষা করিয়া ডাক্তারী পরীক্ষা দিবার ইচ্ছায় তিনি রোম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। ইতিপূর্ব্বে স্থানীয় কোন মহিলা ডাক্তারী পরীক্ষা দেন নাই। এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি Psychiatric Clinic অর্থাৎ কালা, বোবা, পাগল ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠানের সহকারী ডাক্তারের কাজ লইলেন। যে শিশুদের মনোবৃত্তি সাধারণ সুস্থ শিশু অপেক্ষা কম, গৃহে এবং হাঁস-পাতালে তাহাদের চিকিৎসায় তিনি বিশেষ ভাবে মন দিলেন। সময় অসময়ে তাঁহাকে রোগীর পার্শ্বে থাকিতে দেখা যাইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি রোগীকে ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন ততক্ষণ তিনি শান্তি পাইতেন না। কখনও কখনও রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে সারারাত কাটাইতে হইয়াছে, তাহাতেও কখন বিরক্তি বা ক্লান্তি বোধ করেন নাই।

ডাঃ মন্তেসরি শিশুরোগ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে গবেষণা করায় হাঁসপাতালে শিশুদের দেখিবার শুনিবার ভার তাঁহার হাতে দেওয়া

হইল। হাঁসপাতালের অধিকাংশ শিশু অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল। তাহারা কিরূপে মানুষ হইবে, কি উপায়ে তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ হইবে, এই বিষয়ই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি চিকিৎসা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া State Orthophermic School অর্থাৎ শিশু অনাথালয়ের ডিরেক্টার পদে নিযুক্ত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক বালক-বালিকাদের উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ ঘটিল। কায়মনে তিনি সমস্তদিন তাহাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি দিবা-ভাগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, ও রাত্রি-কালে সমস্তদিনের অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল পৃথক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিতেন।

ডাঃ মন্তেসরির বহুদিনে সাধনার ফলে এই বিষয়ের কৃতনিশ্চয়তা সম্বন্ধে তিনি হঠাৎ একদিন আশান্বিত হইলেন। একটি দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ছেলে তাহার নিকট শিক্ষা করিয়া সাধারণ ছেলেদের সহিত পরীক্ষা দিয়া ভাল নম্বর পাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ ও উৎসাহপূর্ব্বক ঐরূপ বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ফলে দেখা গেল, যে সমস্ত ছেলেরা তাঁহার পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহারাই পরীক্ষায় অধিকতর নম্বর পায়। তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার পদ্ধতিকে সাধারণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে স্থির করিলেন। তখন তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রী হিসাবে ভর্ত্তি হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যতগুলি পুস্তক ছিল সবগুলি পাঠ ও গবেষণা করিতে ও নানা-প্রকারের প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এই নূতন শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন।

তিনি চারি বৎসরের সাধারণ শিশুদের এই প্রণালী অবলম্বনে সহজেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইন্দ্রিয় পরিচালনার সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাতে এই বয়সের শিশুরা লেখাপড়া শিখিতে যথেষ্ট আমোদ পাইয়া থাকে। কারণ কয় বৎসর গবেষণার পর তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মানব জীবনের

তিন হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত মন অতিশয় নমনশীল, অর্থাৎ যাহা দেখে শুনে সব কিছুরই ছায়া তাহার মনে পড়িয়া যায়। এই তিন বৎসরের মধ্যে মানবের ভবিষ্যৎ স্বভাবের আভাস পাওয়া যায় কাজেই জাতির, সমাজের, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য এই বয়সের শিশুদের মানুষ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

ডাঃ মন্তেসরির মতে শিক্ষার সময়ে শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, এই স্বাধীনতার ভিতর দিয়াই সে তাহার দৈনন্দিন জীবন সুশৃঙ্খলিত করিয়া তুলিবে। শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা শিশুর মধ্যেই আছে, এই সুপ্ত বীজশক্তিকে পরিস্ফুট করাই শিক্ষার কাজ। এইজন্য তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা, স্ফূর্ত্তিজনক পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, প্রকৃতির সৌন্দয্য উপভোগের অবাধ গতি দিতে হইবে।

সকলেই জানেন যে, যখন ৫।৬টি শিশু একসঙ্গে মিলিত হয়, তথায় প্রত্যেক শিশুর মাতা বর্ত্তমান থাকিলেও শিশুরা ঝগড়াঝাঁটি বা মারামারি না করিয়া কোন কাজই করিতে পারে না। মন্তেসরি বিদ্যালয়ের এক একটি শ্রেণীতে ৩ হইতে ৭ বৎসর বয়সের ৫০।৬০ জন শিশু থাকে, তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তথাপি তাহারা কলহ বা মারামারি না করিয়া প্রত্যেকে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। কেহ বা অঙ্ক কষে, কেহ বা লিখে, কেহ বা ঘর পরিষ্কার করে, কেহ বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আবার কেহ বা অপরের কার্য্য লক্ষ্য করে। শিক্ষয়িত্রী তাহাদের কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করেন না, এবং কোন শিশুকে অপরের কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে সুযোগ দেন না। শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেক শিশুর ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করেন, যদি কোন শিশু তাঁহার সাহায্য চায়, তাহাকে সাহায্য করা হয়, তাহার ভুল সংশোধনপূর্ব্বক যতটুকু বলা হয়। শ্রেণীতে শিক্ষয়িত্রীর যে প্রাধন্য আছে তাহা শিশুদের বোধ করিতে দেওয়া হয় না। শিক্ষয়িত্রী সামান্যই শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি বেশী পর্য্যবেক্ষণ করেন। শিশুরা বিদ্যালয়ে নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিয়া শিক্ষা সুরু করে; শিক্ষয়িত্রী তাহাদিগকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন। তাহাদের স্বইচ্ছা, কার্য্যকুশলতা

ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়া শাসনাধীনে আনা হয়। ডাঃ মন্তেসরির উদ্ভাবিত যন্ত্রপূর্ণ বৈজ্ঞানিক খেলনার (apparatus) সাহায্যে এই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

শিশুরা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয়। খেলনার ব্যবহার পুনঃ পুনঃ দেখিবার আবশ্যক হয় না। ঐ খেলনাগুলিতে শিশুদের স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায় এবং ইহাতে শিশুর উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে কাজের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কারণ শিশুর অনুরাগ উৎপাদন করিতে পারে এইরূপ কাজের ব্যবস্থা থাকিলে তবেই শাসন সহজ হয়। সে নিজের ইচ্ছামত খেলনাগুলি পছন্দ করিয়া লয়। ইহাতে কেহ বা দ্রুত আবার কেহ বা ধীরে শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়। শিক্ষা তাহাদের নিকট ভারস্বরূপ বা ভয়াবহ হয় না। শিশু ইহার ব্যবহার ভুল করিলেও পরে সে নিজেই তাহার ভুল বুঝিতে সমর্থ হয়। শিশু ক্লান্ত হইলে বিশ্রাম করিতে পারে, আবশ্যক বোধ করিলে ঘুমাইতেও পারে, শিক্ষয়িত্রী তাহাকে কিছুই বলেন না। কিন্তু খেলনাগুলির এমনই মোহিণীশক্তি যে, পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলেও শিশুরা অধৈর্য্য হইয়া পড়ে না বরং আমোদই অনুভব করে। শিশু তাহার দৈনিক জীবনের অনেক কার্য্য এইভাবে সম্পন্ন করিয়া আত্মনির্ভরশীল হয়।

প্রত্যেক মাতাই জানেন শিশুরা রান্নাঘরে বসিয়া তাঁহার কার্য্য নিরীক্ষণ এবং সুযোগ পাইলে তাঁহাকে সাহায্য করিতে ভালবাসে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত কক্ষে নীরবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা তাহারা মাতার সহিত রান্নাঘরে থাকা বেশী পছন্দ করে। শিশুদের যদি নিজে স্নান-আহার করিতে দেওয়া হয় বা কোন রকম ফরমাস করিয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় তবে তাহারা যথার্থই কৃতার্থ হয়।

সেইজন্য ডাঃ মন্তেসরি দৈনন্দিন সাংসারিক কার্য্য, যথা বিভিন্ন বস্তু স্পর্শ ও উত্তোলন, বস্ত্র পরিধান, জামার বোতাম ও জুতার লেস লাগান, পরিবেশন ও তৎপরে বাসন-পত্র ধুইয়া মুছিয়া যথাস্থানে স্থাপন, বৃক্ষ, জীব-জন্তুর যত্ন ও লালন-পালন ইত্যাদি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিরূপে এগুলি করিতে হয়

শিক্ষয়িত্রী নিজে দেখাইলে শিশুরা ইহা অনুকরণ করে। এইরূপে তাহারা দৈনন্দিন কাজে অভ্যস্ত হয় ও সামাজিক রীতি, নীতি, শিষ্টাচার ইত্যাদি শিখে। গৃহ-কার্য্যের ভিতর দিয়া এইগুলি শিক্ষা করিতে শিশুরা আমোদ পায়, অনুরাগ দেখায় এবং সম্পন্ন করিতে সতর্কতা অবলম্বন করে। শিশু বিরক্তিভাব প্রকাশ না করিয়া আশ্চর্য্যভাবে আত্মসংযমের পরিচয় দেয়। একসময়ে একটি শিশু পরিবেশনের জন্য গরম সুপ (ঝাল) লইয়া যাইতেছিল, সেই সময় একটি মাছি তাহার নাকের উপর বসে, যতক্ষণ না পরিবেশন শেষ হইল, ততক্ষণ সে মাছির উপদ্রব সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই প্রকারে তাহাদের সাধ্যাতীত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়।

এইগুলি যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হয়, সেইজন্য তিনি বলেন যে, শিশুদের ব্যবহারোপযোগী আসবাব এমন হওয়া দরকার যাহা তিন বছরের শিশু অনায়াসে ও অক্লেশে নাড়াচাড়া করিতে পারে। আসবাব ও খেলনাগুলি নূতন চকচকে ও সুন্দর হওয়া উচিত। তাহা হইলে শৈশব হইতে সৌন্দর্য্যজ্ঞান শিক্ষা হয়। খেলনাগুলি পরিপাটিরূপে গুছাইয়া সাজাইয়া রাখিবার ভার শিশুদের হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে। এইরূপে শিশুরা তাহাদের খেলার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে সদা প্রস্তুত থাকে। যে শিশু যে স্থান হইতে যে খেলা লইবে, সেই স্থানেই উহা রাখিবে। যে খেলনা যে উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইবে। তাহাকে যথেচ্ছভাবে এগুলি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না, কিন্তু সযত্নে ব্যবহার করিতে শিখান হইবে। যদি কোন মেয়ে একটি খেলনা লইয়া খেলিতে চায়, যে পর্য্যন্ত না প্রথম মেয়েটির খেলা শেষ হয় সেই পর্য্যন্ত সে নীরবে অপেক্ষা করিবে। কখনও কখনও শিশুরা তাহার নিকট হইতে খেলনা ঠিক-ভাবে ব্যবহার করিতে শিখে কখনও বা সে তাহাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে শিখায়। এইরূপে শিশুরা ক্রমে ক্রমে দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে শিখে।

মন্তেসরি বিদ্যালয়ে এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়মূলক খেলনা (apparatus), যথা—সিলিণ্ডার, কিউব বিভিন্ন বর্ণের রেশমের

চাকতি, ওজনশিক্ষা, জ্যামিতিক-আকৃতি-বিশিষ্ট কাষ্ঠ ইত্যাদির দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সময়ে শিশুদের ইন্দ্রিয়-গুলি তীক্ষ্ন ও অনুভবপ্রবণ থাকে, উক্ত খেলনার সাহায্যে শিক্ষা করিলে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সম্যক পরিচালনা হয় ও শিশুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এই খেলনাগুলির উদ্দেশ্য নয় যে, শুধু আকৃতি, গঠন, গুণ ও নামের সহিত পরিচিত করান, খেলনাগুলি পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে শিশুদের মনোযোগ, যুক্তি এবং বিচারশক্তির উৎকর্ষ সাধন হয়। মন্তেসরি শিক্ষায় শিশুরা কাজটি কিরূপে সম্পন্ন করিবে তাহা খেলনার সাহায্যে শিশুদিগের দ্বারাই সাধিত হয়, সুতরাং শিশুদিগের আগ্রহ অনায়াসেই উহা দ্বারা উদ্দীপিত হয়। শিশুদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা শিক্ষার উপযোগী হইলে তাহাদিগের যে বিষয়ে বিতৃষ্ণা দেখা যায়, ক্রমশঃ সে বিষয়ে অনুরাগ আসে। শৈশব হইতে এইরূপ অভ্যাস করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে সে তাহার অনুরাগ বা বিরাগের বিষয়গুলির প্রতি নিজে হইতেই মনোনিবেশ করিতে পারিবে।

আর একটি কথা—মন্তেসরি বিদ্যালয়ে শিশুদের মৌনাবলম্বন শিখান হয়। নীরবে এবং নিস্তব্ধভাবে তাহাদের নৈতিক কার্য্য আরম্ভ হয়; ক্রমে ক্রমে তাহারা সকল কাজ ধীরে করিতে ও আস্তে কথা বলিতে অভ্যস্ত হয়। তখন তাহারা আর গোলমাল ভালবাসে না। সময়ে সময়ে শিশুরা মৌন থাকিতে আনন্দ অনুভব করে। মৌনাবলম্বন করিতে একবার অভ্যস্ত হইলে শিশুরা যতই আমোদ-প্রমোদের মধ্যে থাকুক না কেন, শিক্ষয়িত্রীকে একবার নিশ্চল স্থিরভাবে বসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা সংযত হইয়া শিক্ষয়িত্রীকে ঐভাবে অনুকরণ করিবে। কোন রকম আদেশের আর প্রয়োজন হয় না।

আমার মনে হয়, যেমন আমাদের দেশে সাধারণ শিশু-বিদ্যালয় নাই, এবং যখন গৃহেই শিশুর হাতে খড়ি হয়, তখন প্রত্যেক পিতামাতার শিশুশিক্ষায় মন দেওয়া দরকার। মন্তেসরি প্রণালীকে কিছু পরিবর্ত্তিত ও আমাদের দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী করিয়া লইয়া আমরা নিজ নিজ গৃহে অতি অনায়াসেই ইহা শিশু-শিক্ষায় প্রয়োগ করিতে পারি। কারণ শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে নূতনভাবে পরিচালিত করাই মন্তেসরি প্রণালীর উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা

অনুরূপা দেবী

রাত্রি যখন প্রভাত হয় তখন স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সবাই জাগে, শুধু মেয়েরা অথবা শুধু পুরুষরাই জাগ্রত হয় না। জাতীয় জীবনও যখন জাগিয়া উঠে, তখনও সুপ্তোত্থানের এই পূর্ব্ব নিয়মটার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না; নিশাবসানে নিদ্রোত্থিত নর-নারীর মতই জড়তান্ধকার-সমাবৃত নারী-পুরুষ তাদের আলস্য-সুপ্তি ভঙ্গ করিয়া প্রায় একত্রই জাগ্রত হয়। যতদিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল, ততদিন জানা গিয়াছিল, এদেশের রাজনীতিক্ষেত্রের রজনী প্রভাত হয় নাই।

গতবর্ষে জানা গেল, ভারতের কুম্ভকর্ণ তার গভীর সুপ্তি ভঙ্গ করিয়াছে। বিগত সত্যাগ্রহ-সমরে ভারতীয় পুরুষের পার্শ্বে ভারতীয়া নারী তাঁদের দীর্ঘ দিনের অনভ্যস্ত মুক্তবায়ু এবং সুদীর্ঘ দিনের পরানুকৃতির অবরোধ ভাঙ্গিয়া আসিয়া ভারতসতীর চির-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। সতী পতির সহ-ধর্ম্ম-চারিণী হইয়াছেন। বিবাহমন্ত্রের এক হৃদয় এবং একচিত্ততার প্রতিশ্রুতি সফল হইয়াছে।

কিন্তু শুধু দেশ জাগিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না। ঘুমন্ত পুরীতে প্রয়োজন ছিল শুধু চৌকিদারের, এখনই সত্যকার কর্ম্ম-কারকের প্রয়োজন। কাজ করার দিন আসিয়াছে, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ নেওয়া এবং দেওয়ার ব্যবস্থা চাই।

সে ব্যবস্থা চাই সবারই জন্য। শুধু ছেলের জন্যও নয়, শুধু মেয়ের জন্যও নয়। একপক্ষ পক্ষীর মত মেয়েদের বাদ দিয়া পুরুষদের কোন উন্নতির উচ্চাকাশে উড্ডীন হওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে। মেয়েদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন না করিয়া পরন্তু তাদের অকল্যাণের পথে ফেলিয়া রাখিয়া পুরুষের দল যে-পথেই অগ্রসর হইতে যাইবেন, পিছনের টানের চাপে তাঁদের পিছাইতে হইবেই, তাই চাই তাঁদের একত্রিতভাবে সমোন্নতি। একথা বলিয়া আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, এইরূপ উন্নতি করিতে হইলে

নারী-পুরুষকে একই শিক্ষা একই দীক্ষা লইতে হইবে। এরোপ্লেনে, সবমেরিণে, বিবাহ-বিচ্ছেদে, আরও বেশি কোন কিছুতে সর্ব্বত্রই মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দিয়া বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হইবে। আমার মতে রাষ্ট্রে ও সমাজে নারীরও কতকটা অধিকার আছে। গার্হস্থ্য জীবনে পুরুষদেরও কতকটা দায়িত্ব আছে। নিজের নিজের মূল কর্ত্তব্যে লক্ষ্য রাখিয়াও নারী-পুরুষে দেশের কাজ দশের কাজ, এবং ঘরের কর্ত্তব্য পালন অনায়াসেই করিতে পারেন। বিশেষ দেশে যখন আপৎ কাল উপস্থিত হয়, তখন নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষেই আপকর্ম্ম পালন করিতে বাধ্য। নারীর কর্ম্মক্ষেত্র তখন তার গৃহধর্ম্মেই কেবলমাত্র নিবদ্ধ থাকিবে চলিবে না। দেশবাসী মাত্রেরই যখন দেশঋণ আছে, তখন দেশের অর্দ্ধাংশকে পরিহার করিলে আপযুদ্ধার হইবে কেমন করিয়া? এর জন্য এবং আর নিজেরই জন্য শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন করিতে হইবে। স্বরাজ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে, প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করা। শিক্ষা এবং জ্ঞান কোন সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্বতা নয়, জগতের প্রত্যেক নর এবং নারী একই ভাবে ইহা পাইবার অধিকার দাবী করিতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যাহীনকে পশুর সহিত তুলিত করা হইয়াছে। যদিও একদেশদর্শীভাবে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর বাধা সকল সমাজেই মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়াছে, তথাপি সে সব অসত্যের বাধা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না, হিন্দু শাস্ত্রের এমন উদ্দেশ্য হইতে পারে না সমাজের অর্দ্ধাংকে পশুভাবাপন্ন রাখা।

এদেশে প্রাচীনকালে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার ছিল, তাহা সকলেই জানেন। পৌরাণিকযুগে বৌদ্ধযুগে তৎপরবর্ত্তীযুগেও বহুতর নারী ধর্ম্মে, কর্ম্মে জ্ঞানে সমুন্নতির শীর্ষে দাঁড়াইয়া ভারতের ভিতরে এবং এমন কি তার বহির্ভাগেও নিজেদের বংশের কেতন উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন। ভারতসম্রাট অশোক-দুহিতা সিংহলের ধর্ম্মবিজয়িনী সঙ্ঘমিত্রা এবং নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারিকা চারুমতীর কথা আপনারা হয়ত শুনিয়া থাকিবেন। কতবেশী শিক্ষিতা হইলে মেয়েরা এতবড় কাজ করিতে পারেন? পরাধীন

জাতির জাতীয়তাই যখন পরপদাঘাত-চূর্ণ হয়, তখন তার সেই দুরবস্থার দিনের কথা, সে বড় লজ্জারই কথা ; যে সব দিনের আচার ব্যবস্থা সেও কতকটা আপদ্ধর্ম্ম ; তা লইয়া গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই এবং তার মধ্যের যেগুলা বর্ত্তমানের আপদ্ধর্ম্ম পালনের অপরিপন্থী সেগুলোকে পরিবর্ত্তন এবং সংস্কার করিবার প্রয়োজনও আসিয়াছে। এছাড়া আর একটী কথা বলার আছে যে, এদেশে মেয়েদের শিক্ষাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করা হইতেছে এই নিতান্তই আধুনিক বর্ত্তমান যুগে। এর অল্পদিন পূর্ব্বেও যখন সমাজ ছিল, পল্লী-জীবনে যৌথপরিবার প্রথা অটুট ছিল, তখনও পুঁথিগতভাবে হইলেও নানাদিক দিয়াই আমাদের মেয়েদের শিক্ষা আমাদের দেশের দিক হইতে যথেষ্টরূপেই সুশিক্ষা ছিল। পুরাণ ভাগবত ব্রতকথা, ত্যাগ সংযম, মানুষকে দিব্যভাবাপন্ন করিতে, যথার্থ শিক্ষার ফল প্রদান করিতে যাহা প্রয়োজন তাহার কিছুরই ত্রুটী ছিল না। তবে তখন মেয়েদের কাজ ছিল মসিজীবী বা কৃষিজীবী পিতাপতিপুত্রের জন্য গৃহসুখ গঠন করা পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি বজায় রাখা ; আজ শুধু ঐটুকুতেই হইবে না। আজ তাদের ঘরের, পরিবারের, সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রেরও কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। গৃহপালিত পশুর মত গৃহ-লালিত শিশুর ভার বহনই নয়, তাকে বীর প্রসবিণী বীরাঙ্গনা হইয়া দেশঋণ শোধ দিতে হইবে। এ ঋণ দেশবাসীরও যেমন দেশবাসিনীরও তেমনই, ইহাতে কোন ইতর বিশেষ নাই।

কিন্তু এ ঋণ শোধ দিতে হইলে দেশকে দেশের অতীত বর্ত্তমানকে ভাল করিয়া জানিয়া চিনিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে। দেশকে জানিলে, চিনিলে, ভালবাসিলে তবেই দেশ মাতৃকার পূজার আয়োজনে আত্মনিয়োগ-চেষ্টা আসিবে দেশসেবাব্রতের কৃচ্ছ্রসাধনে অনুরাগ জন্মিবে, দেশঋণ পরিশোধ করিতে আগ্রহ হইবে। তাই সার্ব্বজনীন্ বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই দেশাত্মবোধ সৃষ্টিকারী এবং ধর্ম্ম ও নীতির দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত প্রকৃত শিক্ষাই যাহাতে আমাদের ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য প্রবর্ত্তিত হয় সে বিষয়ে আমাদের বিশেষরূপে চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু এই শিক্ষা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই যাহাতে আমাদের ছেলে-

মেয়েরা এই শিক্ষার প্রভাবে নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের ধর্ম্মকে ভালবাসিতে শ্রদ্ধা করিতে গৌরব বোধ করিতে শিক্ষা করে, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ করিতে শিখে না। যদি আধুনিক বিদ্যাশিক্ষার ধাঁচে এই সার্ব্বজনীন শিক্ষাও নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সে কুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখি না।

স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের গোড়ার কথা

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনরীদের উদ্যোগে কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যাপক ভাবে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন আরম্ভ হয়। কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা তখন মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁহারা অন্তঃপুরে কন্যাদের বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করিতেন। এই কারণে মিশনরী পরিচালিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে দরিদ্র ঘরের—অনেক স্থলে নিম্নজাতির মেয়েরাই লেখাপড়া শিখিত। ১৮৪৯ সনে বীটন-কর্তৃক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণকে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেখা যায় নাই।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের রচয়িতা কে?

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে হিন্দু বালিকাদের শিক্ষা-বিস্তারকল্পে কলিকাতায় যে-কয়েকটি খ্রীষ্টীয় মহিলা-সমিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহার মধ্যে একটির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; সেটি The Female Juvenile Society For the Establishment and Support of Bengalee Female Schools. এই মহিলাসমিতি খুব সম্ভব ১৮১৯ সনের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। নন্দনবাগান, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে সমিতির বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য এই মহিলা-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৮২২ সনে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানিতে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক বিদুষী হিন্দু মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক রীতি ও নীতি বিরুদ্ধ নয় তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন ঃ—

About this time Raja Radhacauut offered the Society the manuscript of a pamphlet in Bengali the Stri Siksha Vidhyaka on the subject of female education,···The Committee of the Calcutta Juvenile Society received the manuscript and determined on printing it—A Biographical Sketch of David Hare (1877), p. 55.

ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটিই যে প্রথমে নন্দনবাগানে জুভিনাইল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা করেন, 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রকাশ—

কেবল আমারদের দেশের স্ত্রী লোকের লেখা পড়ার পদ্ধি আগে ছিল না, এই জন্যে কিছু দিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০, ১৮১৯ ? শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতায় নন্দনবাগানে যুবনাইল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।—'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক', ৩য় সংস্করণ (১৮২৪), পৃ. ৯।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকখানির কোন সংস্করণেই গ্রন্থকারের নাম নাই। প্যারীচাঁদ মিত্রের উক্তি—"Raja Radhacaunt offered the Society the manuscript" হইতে অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে রাধাকান্ত দেবই ইহার লেখক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার লেখক—কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার; ইনি কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক, বজরাপুর-নিবাসী স্বনামধন্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির পঞ্চম (১৮২২-২৩) ও ষষ্ঠ (১৮২৪-২৫) রিপোর্টে, পাদরি লঙের Bengal Missions (১৮৪৮) ও বাংলা পুস্তকের তালিকায় (১৮৫৫), এবং ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের জীবনীতে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র রচয়িতা-হিসাবে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের নামের উল্লেখ আছে।

স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র প্রকাশকাল

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' ঠিক কোন্ সালে প্রথম প্রচারিত হয় সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। তাহার আখ্যাপত্র হইতে প্রকাশকাল "বা সন ১২২৮" "১৮২২" পাওয়া যায়। ইহা কলিকাতা ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটির পক্ষে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত হয়। আমরা বিলাত হইতে পুস্তকখানির আখ্যাপত্রের যে ফোটো-প্রতিলিপি আনাইয়াছি, পর পৃষ্ঠায় তাহা মুদ্রিত হইল।

১৮২২ সনের এপ্রিল মাসের অব্যবহিত পূর্বেই 'স্ত্রী শিক্ষা-বিধায়ক' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার আরও একটি প্রমাণ-স্বরূপ ৬ এপ্রিল ১৮২২ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

স্ত্রী শিক্ষা।—এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতেছে।...('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ পৃ. ১৩)

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২২ সনের আগষ্ট মাসে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়—ইহার উল্লেখ ঐ সোসাইটির পঞ্চম রিপোর্টে আছে।

কয়েক মাসের ব্যবধানে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হইবার কারণ আছে। তখন মিশনরীদের চেষ্টায় চারি দিকেই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। চার্চ মিশনরী সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় মিস কুক (পরে বিবি উইলসন্) নামে এক মহিলা অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে লোকমত গঠনের জন্য 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রধানতঃ বিতরণের জন্যই কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮২৪ সনে। এই সংস্করণের গোড়ায় "দুই স্ত্রীলোকের কথোপ-

কথন" নামে একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্টে (১৮২৪-২৫) প্রকাশ :—

Courmohun's Treatise on Female Education has been reprinted, the second edition of 500 copies having been rapidly distributed. The author has enlarged it to nearly double its original size, and has improved it by simplifying the language and by suiting it to the capacity of those for whose use it is intended.

এই সংস্করণে সংযোজিত "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" অধ্যায় হইতে রচনার নিদর্শন-স্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে, কত্তই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কাজ। তাহাতে আমারদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে ; কেন না এ দেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষ করিবে।

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কায কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

রামমোহন কি 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র নিকট ঋণী ?

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ১৮২২ সনের গোড়ায় গৌরমোহনের 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাদরি লং তাঁহার বাংলা পুস্তকের তালিকায় ইহার প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮১৮ সন বলিয়া উল্লেখ করায় একটি মারাত্মক ভুলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত এই তারিখ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া, ১৮১৯ সনে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ' পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্যও করা হইয়াছে :—

রামমোহন রায়ের সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব ও গৌরমোহনের স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক, এই দুই পুস্তকের বহু স্থলে ভাব ও ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। রামমোহনের পুস্তক পরে রচিত হইয়াছিল ; সুতরাং ভাষাগত যে আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে, তাহা কৌতুহলোদ্দীপক।...

উভয় পুস্তকের দু-একটি স্থানে অল্পস্বল্প ভাষা ও ভাবগত মিল আছে সত্য, কিন্তু তাহার জন্য রামমোহনকে দায়ী করা যায় না, কারণ তাঁহার পুস্তক গৌরমোহনের 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র পরে নহে—অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল! রামমোহন তাঁহার পুস্তক রচনাকালে গৌরমোহনের সাহায্য লইয়াছিলেন এরূপ প্রমাণও কেহ দিতে পারেন নাই।

স্ত্রীশিক্ষা

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখ্‌তে আহূত হয়েছি। দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কেতাবের অভাব নেই। যে কেউ বাংলায় দু'অক্ষর লিখ্‌তে পারেন, তিনিই নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে বই লিখে হাতে খড়ি দিয়ে থাকেন। তাতে আমরা দশ বৎসরের বয়সের মধ্যে কিরূপে সীতা, সাবিত্রীও দময়ন্তী তৈরী করতে হয়, গান-বাজনা শিল্পকলা প্রভৃতি শেখান যায়, যেন বারো বৎসরে বিয়ে হ'লেই পতি-দেবতা নগদ বরপণ ও কয়েকভরি সোনার সঙ্গে সঙ্গে একটি "গৃহিনী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিত কলাবিধৌ'' বিনা ক্লেশে লাভ করতে পারেন তার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এটা একবারও কেউ মনে করে' দেখেন না যে, প্রকৃতির নিয়ম বলে' একটা জিনিস আছে সেটাকে কিছুতেই লঙ্ঘন করবার জো নেই, এবং যদিও মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণতঃ পুরুষদের অপেক্ষা অল্প বয়সে বিকাশলাভ করে, তথাপি দ্বাদশ বৎসর বয়সে মস্তিষ্কের পরিণতি অসম্ভব, অধিকাংশ শিক্ষণীয় বিষয়ে তখনও তারা বলিকা মাত্র। তাদের মাথায় সে-সকল বিষয় তখন কিছুতে ঢুকতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা কথাটাই ছেলেখেলা হ'য়ে দাঁড়ায়, যদি বারো বৎসরের মধ্যে সেটা সমাপ্ত করতে হয়।

কোন্‌ বিখ্যাত ফরাসী লেখক সত্যই বলেছেন, স্ত্রীজাতির স্থান কোথায়—এইটি হচ্ছে প্রত্যেক দেশে সভ্যতার মাপকাঠি। আমাদের দেশে নারীদের অবস্থাটা মনুই নির্দ্দেশ করে' দিয়ে গিয়েছেন—'ন সা স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—অর্থাৎ চিরকালই তাকে বাপ ভাই ছেলের অধীন হ'য়ে থাক্‌তে হবে। এই সনাতন নীতিটির যাতে ব্যতিক্রম না ঘটে, এজন্য নারীজাতিকে আমরা এরূপভাবেই রেখেছি যে বাস্তবিক এখন তারা স্বাধীনতার যোগ্যও নয়। ফ্রেডেরিক হ্যারিসন্‌ তাঁর **Reatities and Ideals** নামক গ্রন্থে এক জায়গায়

বলেছেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা বল্‌তে যদি কয়েকটি আধুনিক ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান এবং কয়েকটি ললিত কলার দক্ষতামাত্র বুঝায়, তবে

"This truly Mahomedan or Hindu view of woman's education is no longer openly avowed by cultured people of our own generation."

অর্থাৎ, সেটা হ'ল হিন্দু ও মুসলমানদের উপযুক্ত আদর্শ, পাশ্চাত্য সভ্যজগতের নয়। নারী-জাতি সম্বন্ধে আমরা আমাদের উচ্চধারণার যতই বড়াই করি না কেন সংস্কৃত কোটেশন্‌-কণ্টকিত রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখে সে বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যতই চেষ্টা করি না কেন, একজন ভারতবন্ধু ইংরেজ লেখক স্ত্রীজাতি-সম্পর্কে আমাদের সভ্যতাকে কতটা অবজ্ঞার চোখে দেখেন দেখ্‌তে পাচ্ছেন। তবু তিনি জান্‌তেন না যে, "a moderate knowledge of some modern languages and a few elegant accomplishments" আমাদের উচ্চশিক্ষিতা নারীদেরও অতি অল্পসংখ্যকেরই আছে, এবং তাদের পক্ষে এতটা উচ্চশিক্ষা আমাদের অধিকাংশ পুরুষের ধাতে সয় না ও কল্পনায়ও স্থান পায় না, যেহেতু পুরুষদের নিজেদের মধ্যেই সেটা অবিদ্যমান।

জন্‌ স্টুয়ার্ট মিল্‌ থেকে আরম্ভ করে' রোমানিস, হাক্স্‌লি, লেকি, ফ্রেডেরিক হ্যারিসন, জন্‌ মর্লি প্রভৃতি লেখকগণ স্ত্রীজাতির সঙ্গে পুরুষজাতির তুলনামূলক সমালোচনা করে' যে-সকল মন্তব্য লিখে গিয়েছেন, এবং আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও চিন্তাশীল লেখক স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন ভারতীয় রমণীজাতি সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিখেছেন, প্রচুর অবকাশ থাক্‌লে সে-সকল কথার অবতারণা করে' পুরুষ ও স্ত্রী-জাতির রীতি-প্রকৃতির বিভিন্নতা সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করা যেত; কিন্তু আজকাল মাসিকপত্রাদিতে 'নারী-সমস্যা' সম্বন্ধে অনেক্‌ কিছু লিখিত হওয়ায়, আমার সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে পারিনি বলে' আফ্‌শোষের কোনো কারণ নেই। তবে যখন কিছু বল্‌তে প্রতিশ্রুতি হয়েছি তখন খুব সংক্ষেপে দু'একটি কথা বল্‌তে চাই।

পূর্ব্বোক্ত অধিকাংশ লেখকদের মতে, এক মাতৃত্বই স্ত্রীজাতিকে পুরুষের তুলনায় জীবনযুদ্ধে কতকটা অপটু করে' রাখ্বে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে স্ত্রীজাতি যে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করতে পারবে না-এ সম্বন্ধে যুক্তিতর্ক অনাবশ্যক বিবেচনা করি। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীপ্রকৃতি একে অন্যের পরিপোষক—বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে কেহ শ্রেষ্ঠ কেহ নিকৃষ্ট, একথা বলা চলে না। একদিকে মাতৃত্ব যেমন নারীকে দুর্ব্বল করে' রেখেছে, অপর পক্ষে উহাই ত আবার শিশুশিক্ষার গুরুতর দায়িত্ব তার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছে। মাতৃত্ব নারীর মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে মহীয়সী করেছে একথাটাও সত্য, কিন্তু এটা বলতে বড়ই ভয় হয়, কারণ একবার একথা এনে ফেল্লে সমাজে আমাদের মেয়েদের উচ্চস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে এত নিছক কল্পনা-বিজড়িত কথা শুন্তে পাওয়া যায় যে কানে তালা লেগে যায় এবং আমাদের দেশের পুরুষদের আত্মপ্রতারণা-শক্তি দেখে' বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়।

স্নেহ-মমতা দয়া-দাক্ষিণ্য নিঃস্বার্থতা আত্মত্যাগ ধৈর্য্যতিতিক্ষা ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি যে-সকল নৈতিক গুণ মানবের বিশেষত্ব, এবং তার আ্যধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিসাধনের অনুকূল, মাতৃত্বের মধ্য দিয়েই সেগুলি সহজে বিকাশলাভ করে; কিন্তু সেই বিকাশের জন্য ক্ষেত্র তৈরি থাকা চাই—অকালমাতৃত্ব নিবারণ করা চাই। সুশ্রুত বলেছেন, অল্প বয়সে সন্তান হ'লে সেগুলি মারা যাবে, না মরলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হবে, সুতরাং অত্যন্ত বালাকে সন্তান-জননী হ'তে দেবে না; কিন্তু আমরা ঘরে ঘরেই ত এই নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে, দেখ্তে পাই যে বালিকা খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাক্বে, তার মাতৃত্বের মর্য্যাদাই বা কোথায়, মহিমাই বা কি!

'নাই মামার থেকে কানা মামাও ভাল', এই নীতি অনুসরণ করে' আমাদের পাড়াগাঁয়ের বালিকা বিদ্যালয়গুলি চল্ছে। আমি যদিও এরূপ একটি ইস্কুলের সম্পাদকতা করেছি এবং আর-একটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তথাপি এগুলি খুব স্নেহের চক্ষে দেখতাম বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। কেন দেখ্তাম না, তা পরে বল্ছি। তবে সেখানে ছোট্ট ছোট্ট মেয়ে-

গুলি কি বিশাল উৎসাহভরে সেজেগুজে' এসে গান করত, পদ্যপাঠ পদ্যমালা প্রভৃতি আবৃত্তি করত, তা' দেখতে আমার বড় ভাল লাগ্‌তে; আর মনে একটা গভীর বিষাদ ও দুঃখ হ'ত এই বলে' যে এই কচি মেয়েগুলিকে আর দুদিন পরেই অন্তঃপুরের খাঁচায় পুরে' রাখ্‌বার ব্যবস্থা হবে, হয়ত অনেকের ইতিমধ্যেই বিবাহের প্রস্তাব চল্‌ছে এবং সেটা পাকা হ'লেই ইস্কুল থেকে নাম তুলে' নেওয়া হবে। অতি অল্পব্যয়ে অথবা বিনাব্যয়ে, উপোষ করে', পরম উল্লাসে ও পুলকের সঙ্গে বাড়ীর বালিকাদের যে-সকল ব্রত-নিয়ম উদ্‌যাপন করতে দেখেছি, তাতে আমার কেবলই এই মনে হয়েছে—এদের জীবনেও খেলাধুলা স্ফূর্ত্তি নির্দ্দোষ আমোদের কত আবশ্যক আছে, কত অল্পে এদের প্রাণের সরসতা সঞ্জীবিত রাখা যায়, কিন্তু হায় আমাদের দেশ, ততটুকু আনন্দও এদের ভগ্যে বেশী দিন জুটে উঠে না।

ইস্কুলগুলিকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তাম না এজন্য যে এখানে পড়াশনা খুব কমই হ'ত। উচ্চ শ্রেণীতে সব সময় ছাত্রী থাক্‌ত না, সূচীকার্য্যও সামান্যই শিক্ষা হ'ত। রাশ্‌ব্রুক উইলিয়ম্‌স্‌ সাহেবের বার্ষিক বিবরণীতে দেখ্‌তে পাই, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে ভদ্রশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কত অনাদর। অর্থোপার্জ্জনের জন্য পুরুষদের বিদ্যাশিক্ষা করা অত্যাবশ্যক, মেয়েদের রোজগার কর্‌তে হয় না সুতরাং তাদের লেখাপড়া শেখা অনাবশ্যক,—এই ভাবটি আমাদের মধ্যে খুবই প্রবল। ভদ্রঘরে অধুনা মেয়েদের চিঠিপত্র লিখ্‌তে হয় বলে' বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়া দরকার, বাজার-হিসাবটা রাখ্‌তে হয় বলে' যোগ-বিয়োগ অঙ্কটা শেখা দরকার। বাংলাদেশে হাজার-করা মাত্র একুশটি মেয়ের বিদ্যাশিক্ষা বড়জোর এতদূর অগ্রসর হয়েছে। এই বিদ্যাটুকু আয়ত্ত করবার জন্য বালিকা-বিদ্যালয়ের বিশেষ আবশ্যকতা আমি দেখ্‌তে পাই না—ঘরে বসে'ই একরকম করে' একাজটা চল্‌তে পারে। যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি, মধ্য ও উচ্চবিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগস্থাপনের সেতু বলে' বিবেচিত না হয়, তবে তার বিশেষ কি প্রয়োজন?

আমি দেখছি, বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণসভায়

কোনো বিবাহিতা কিম্বা ১৪।১৫ বৎসর-বয়সের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী—ঐ বয়সে কোনো মেয়ে ইস্কুলে পড়্ছে, এটা ত প্রায় চিন্তার অগোচর—উপস্থিত থেকে সঙ্গীত কি কোন উচ্চবিষয়ে রচনা পাঠ বা আবৃত্তি কর্‌লে ত সভাস্থ সভ্যগণ তা নিয়ে বাড়ী গিয়ে অশোভন ও বিপরীত সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন না। বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী একেই পাওয়া যায় না, তার পর যদি দৈবাৎ জুটে' যায়, তবে তাদের রীতিনীতি চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চপদস্থ ও তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মুখে একান্তই কল্পনাপ্রসূত এমন সব কথা শুনেছি যে, সেগুলি উক্ত মহিলাদের কানে পেঁছিলে তদ্দণ্ডেই তাঁরা চাকরি ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হতেন। মনে মনে আমরা আমাদের সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীদের বিশ্বাস করি না—তাই অতি শীঘ্র বিয়ে দিয়ে ফেল্‌তে চাই, এবং বয়স্কা স্বাধীন-জীবিনী মহিলা দেখ্‌লে তার নীতি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হই। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ইঙ্গিতে যা বলেছেন, তাতে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট কর্‌তে হয়। কমিশন বলেছেন—

"Until men learn the rudiments of respect and chivalry towards women who are not living in venaras, anyting like a service of women teachers will be impossible."

স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে আমাদের পুরুষগণ মনে মনে এই যে গভীর সন্দেহ পোষণ করেন, এটা যতদিন না দূর হবে, ততদিন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা সুদূরপরাহত থাকবে।

যৌন প্রবৃত্তিকে সংযম দ্বারা লোকহিত-ব্রতে নিয়োগ করে', প্রকৃতির নিয়ম যে সৃষ্টিরক্ষা, তা পালন্ করবার জন্য অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ আবশ্যক। বিবাহিত না হ'লে কি পুরুষ কি স্ত্রী কারু চরিত্র পূর্ণতা লাভ করে' সুগঠিত হ'য়ে উঠতে পারে না, সাধারণতঃ একথা মানি। উচ্চশিক্ষিতা অবিবাহিতা কোনো কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনায়, অল্প-শিক্ষিতা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কোনো কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত তা' বলে' সকলকেই যে বিয়ে কর্‌তে হবে তার কোনো মানে নেই,

এবং উচ্চ শিক্ষা দ্বার চিত্তবৃত্তিগুলি মার্জ্জিত করার সুফল বিবাহ-ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারলে সোনায় সোহাগা হয়, এটা অস্বীকার করবার জো নেই।

আমাদের পুরুষদেরই কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, মেয়েদের ত কথাই নেই। কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে সুবিধা ও সুযোগ আছে, বা তা শীঘ্র হওয়ার সম্ভব, সেইসব ক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষালাভের প্রচুর অবসর দেওয়া উচিত নয়, একথা আমি মান্‌তে প্রস্তুত নই। আমি মেয়েদের জীবিকা-অর্জ্জনের প্রসঙ্গ তুল্‌ব না, তাদের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে দু'একটি মাত্র কথা বলে' আমার এই যৎসামান্য বক্তব্য শেষ করব।

জন্ মলি বলেছেন, মেয়েরা কুসংস্কারচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণমনা। বিলেতেই যদি এরূপ অবস্থা, তবে আমাদের দেশের মেয়েদের কথা খুলে' বলা অনাবশ্যক। পুরুষদের মহৎ প্রয়াসগুলি অনুসরণ করবার মত যোগ্যতা পাশ্চাত্য মহিলাদের মধ্যেও অনেকেরই নেই—কিন্তু আমাদের মেয়েরা তা বুঝ্‌তে কিম্বা বুঝে' তার সঙ্গে সহানুভূতি কর্‌তেও অক্ষম। উইলিয়ম্ জেম্‌স্ তাঁর মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে বলেছেন যে, মেয়েরা কুড়ি বৎসরেই মানসিক ক্ষেত্রে বুড়ী হয়, অর্থাৎ তার পর আর তাদের মনের বিকাশ হয় না। আর ঐ বয়সের পুরুষদের মনের অবস্থা জেলিবৎ তরল ও স্থিতিস্থাপক থাকে বলে' তারা তখনও অনেক নূতন নূতন তথ্য গ্রহণ কর্‌তে পারে। পাশ্চাত্য নারীদেরই যদি এই দশা, তবে আমাদের মেয়েদের কথা একবার ভেবে দেখুন। অথবা ভেবে দেখ্‌বারই বা কি আবশ্যকতা, ঘরে ঘরে তাকিয়ে দেখ্‌লেই ত হয়। বিচার-বুদ্ধি বলে' যে একটা জিনিষ, ইংরেজীতে যাকে reason rationality বা judgment বলে, সেটা আমাদের মেয়েদের মধ্যে একেবারে নেই বল্‌লেই চলে। সর্ব্বদা তাঁরা খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে চলেন, যুক্তি-তর্কের ধার ধারেন না, যদিও তর্কযুদ্ধে পশ্চাৎ-পদ না হ'তে পারেন। গোঁড়ামি কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস বিচার-মূঢ়তা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের পুরুষরাই ত পাশ্চাত্য নারীদের পশ্চাতে পড়ে' আছেন, আবার আমাদের মেয়েরা আমাদের আরও পশ্চাতে টেনে রাখ্‌ছেন। রাশ্‌ব্রুক উইলিয়ম্‌স্ সাহেব সত্যই বলেছেন,—

"The traditional conservatism of the Indian home closes and bars the innermost sanctuary of Indian life to those new ideas which must penetrate far and wide if the political and social aspirations of the country are to be attained."

অর্থাৎ কিনা, যে-সকল নূতন ভাবগুলি খুব একটা বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসার লাভ না কর্‌লে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি কার্য্যে পরিণত হ'তে পারে না, ভারতীয় অন্তঃপুরের চিরাগত রক্ষণশীলতার ফলে, জাতীয় জীবনের নিভৃততম কক্ষে সেগুলির প্রবেশাধিকার নেই। ইস্কুল-কলেজে পড়ে' দেশ-বিদেশে ঘুরে', সভাসমিতিতে যোগদান করে' আমাদের দেশের পুরুষদের বিচার-বুদ্ধি যেটুকু খুলে' যায়, আবার বাড়ী এসে মা ভগ্নী গৃহিণীর সনাতন রীতিনীতি আচার-ব্যবহার প্রথা-পদ্ধতির আব্‌হাওয়ার মধ্যে পড়ে,' অল্পদিনের মধ্যেই তা লোপ পায়। সুতরাং জাতি হিসাবে দু'দশ পুরুষেও আমাদের সমাজ-শরীরে কোন নূতন ভাব বদ্ধমূল হ'তে পারে না। বালিকা-বিদ্যালয়ে দু'পাতা পড়ে'ই আমাদের মেয়েরা এসব বিষয়ে একেবারে উন্নত হ'য়ে উঠ্‌বেন, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। কাগজে পড়ে' আমাদের দেশে কয় জন যুবকের বিচার-বুদ্ধি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হ'য়ে থাকে? তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশই ত সনাতন রীতি অনুসরণ করে' গতানুগতিক-ভাবে জীবন যাপন করে' থাকেন। বস্তুত বিচার-বুদ্ধির বিকাশ বড়ই কঠিন সাধনাসাপেক্ষ। মেয়েরা অনেকে উচ্চশিক্ষা লাভ কর্‌লেই আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ থেকে সনাতন রীতিনীতিগুলি অচিরাৎ অন্তর্দ্ধান কর্‌বে, এরূপ আশঙ্কা যেন কেউ না করেন। তবে পুরুষদের মধ্যেও যেমন কতক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধি মার্জ্জিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, স্ত্রীলোকদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার প্রভাবে কতকটা সেরূপ হবে, সন্দেহ নেই। যতদিন তা না হয় ততদিন ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক বিরোধ ও দ্বন্দ্ব দাম্পত্য-জীবনকে দুর্ব্বহ করে' রাখ্‌বে।

অতএব মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত কর্‌তে না পার্‌লে

তাদের শিক্ষা সফল হবে না, বরঞ্চ "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। যেহেতু কেবল নাটক নভেল পড়ে' মেয়েদের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা বেড়ে যাবে, তারা আত্মঘাতী হবার নব নব রোমাণ্টিক উপায় খুঁজে' বের কর্‌বে। নাটক নভেলও আবার বেছে বেছে পড়া হয় শুনেছি, অর্থাৎ যেখানে কেবল নায়ক-নায়িকার প্রেমের কথা থাকে, কেবল সেগুলিই পড়া হয়, দু'চারটি যুক্তি বা তত্ত্বকথা বা সুচিন্তিত মন্তব্য বা চরিত্র-বিশ্লেষণ যদি কোথাও থাকে, তবে সেগুলি নাকি সযত্নে বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং আমার কথা এই যে, দেশময় ছাত্র-শিক্ষার যেরূপ অবস্থা আছে ছাত্রী-শিক্ষারও তদ্রূপ ব্যবস্থা হোক, উচ্চশিক্ষার পথ তাদের নিকটও অবাধ ও উন্মুক্ত করে' দেওয়া হোক, দাক্ষিণাত্যের ন্যায় উত্তরাখন্ডেও অবরোধ-প্রথা শিথিল করে' দেওয়া হোক, মেয়েদের বিয়েটা অনেক পিছিয়ে দেওয়া হোক, যৌবন-বিবাহের দরুণ যদি 'ল্যভ-ম্যাচ' ও অসবর্ণ বিবাহ এসে পড়ে তবে তাদের সাদরে বরণ করে' নেওয়া হোক'—মহর্ষি বাৎস্যায়নের মতে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ হেতু গান্ধর্ব্ব বিবাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—বিধবাদের শিক্ষা ও আবশ্যক মত তাহাদের পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা করা হোক, যেহেতু সেটা তাদের নিজের জন্য যতটা আবশ্যক, তাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ও বন্ধ্যাত্ব নিবারণ দ্বারা জাতিক্ষয় থামাবার জন্যও ততটা প্রয়োজন, এমন কি নিতান্ত আবশ্যক স্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা করা হোক। সমস্য বড়ই জটিল, স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে এতগুলি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি এসে পড়বেই। আর বর্ণপরিচয়ই যদি স্ত্রীশিক্ষার সীমা হয়, তবে বালিকা বিদ্যালয়গুলির বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখ্‌তে পাই না। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিলেই ঘরে ঘরে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী গড়ে' উঠবে না, যেমন শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে যেখানে সেখানে রাম লক্ষ্মণ ভীষ্ম দ্রোণ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তবে মেয়েদের উন্নতির সঙ্গে সমস্ত জাতিটার উন্নতি হবে; নতুবা আমাদের অর্দ্ধাঙ্গ পঙ্গু হ'য়ে থেকে বাকী অঙ্গটাকে অক্ষম ও জড় করে' রাখ্‌ছে ও রাখ্‌বে। 'দেবী' বলে' 'যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" বলে, মেয়েদের গৃহ-কোণে সরিয়ে কোণঠাসা করে' রাখ্‌লে চল্‌বে

না। আমরা চাই

"A creature not too bright or good
For human nature's daily food."

এমন সুগৃহিণী যে আমাদের দৈনন্দিন সংসারযাত্রার পক্ষে আবশ্যক পুষ্টিকর মানসিক খাদ্য জুগিয়ে দিতে পারে, নিজেরা মনুষ্যত্ব লাভ করে' আমাদের পুরুষদের মানুষ করে' তুল্‌বার সাহায্য করতে পারে। দেব বা দেবী কেবল পুঁথিপত্রের সাহায্যে তৈরি হয় না, সেটা যার যার ভগবদ্দত্ত প্রকৃতি অনুসারে হ'য়ে থাকে। আমরা চাই এরূপ স্ত্রীশিক্ষা, যা আমাদের মেয়েদের ধীশক্তি সুমার্জ্জিত করে' বিচার-বুদ্ধিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে' মনে মনে মহৎ আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়ে, প্রবৃত্তিগুলিকে সৎপথে চালিত করে' তাদের পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় কর্ত্তব্য পালনে উপাযাগী করে' তুলবে।

স্ত্রীশিক্ষা

স্বর্ণলতা মল্লিক

এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার কর্ত্তব্যের বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু নারীজাতির কিরূপভাবে শিক্ষা হওয়া উচিত তাহার বহু মত প্রচলিত আছে। প্রকৃত শিক্ষার ফল জ্ঞান লাভ। জ্ঞান সত্য বস্তু। সুতরাং শিক্ষার সম্বন্ধে কোন সম্প্রদায়ের মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। তবে শিক্ষার প্রণালী দেশভেদে অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বিশ্ব সংসার নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। মানবরাজ্যে শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী একথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্বে সভ্যতা প্রচলিত হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে নারীশিক্ষা নীতিমত হইত। অতি প্রাচীন শাস্ত্র বেদ রচনার সময়ে কোন কোন বিদুষী রমণী তত্ত্ববিচার করিতেছেন কেহ বা পতির নিকট প্রশ্নোত্তর দ্বারা জ্ঞান লাভ কেহ বা পুত্রের নিকট ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতেছেন এরূপ বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। পৌরাণিক কালে সাবিত্রীর বিবরণে জানা যায় যে তাঁহার জ্ঞানের কথার ধর্ম্মরাজকে চমৎকৃত হইতে হইয়াছিল। যদি ইহা উপন্যাস বা রূপক বলিরা ধরা যায় কিন্তু সত্য ঘটনা না থাকিলে রূপকের ভাব আসিতে পারে না। সেকালে কন্যাকে পুত্রবৎ পালন করা হইত ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মধ্যবর্ত্তীকালে রাণী ভবানী, অহল্যা বাই প্রভৃতি মনস্বিনী মহিলা দ্বারা রাজ্য শাসন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তাঁহাদের উত্তমরূপ শিক্ষা না থাকিলে তাঁহারা কখনও এরূপ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। সেকালের শিক্ষার পদ্ধতির সহিত এখনকার প্রণালী মিলে না। নানা প্রকার কারণে আমাদের সমাজ সেরূপ দৃঢ়বদ্ধ নাই। সম্প্রদায় বিশেষে শিক্ষার ব্যবস্থা নানাপ্রকারের দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বঙ্গ সমাজে বিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইয়া শিক্ষা দিবার রীতি ছিল না। গৃহে কন্যা বধূগণকে মুখে মুখে ব্রতানুষ্ঠানাদির দ্বারা সদুপদেশ দ্বারা নানা প্রকার কার্য্যপ্রণালীর দ্বারা শিক্ষিতা

করা হইত। তাহা দ্বারা এদেশীয় কন্যা বধূগণ এক একটী পরিবারের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া থাকিতেন। স্নেহ ভক্তিদ্বারা সংসারকে শান্তিময় করিয়া রাখিতে পারিতেন। ক্রমে রাজ্য বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্যক বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়িল। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বভাব শিথিল হইয়া গেল। ইংরাজ অধিকারে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ভাষা শিক্ষা চলিতে লাগিল। প্রকৃত শিক্ষা অপেক্ষা অনুকরণ প্রণালী প্রধান হইয়া উঠিল! বালিকারা মনে করিল, পশম সেলাই প্রধান শিল্প। দুচারটী কবিতা রচনা করিয়াই আপনাদিগকে জ্ঞানবতী ভাবিল। কিন্তু তাহাদের দোষ নাই, দোষ কালের। যখন নূতন ভাবের বন্যা আসে তখন পুরাতন রীতিনীতি এইরূপেই ভগ্ন অর্দ্ধ ভগ্ন হইয়া ভাসিতে থাকে। পরে ক্রমে বিশৃঙ্খল ভাব নিবারিত হইয়া বিচারসহ প্রণালীগুলি স্বাধিকার লাভ করে। এখন যাহাদের হস্তে আমাদের স্ত্রীশিক্ষার ভার তাঁহাদিগকে বিশেষ মনোযোগী, বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। যেন আমাদের বালিকারা বর্ণ পরিচয় শিখিয়া পত্র লেখাকে বিদ্যা মনে না করে। নবেল পড়িয়া নবেলিয়ানা দেখাইয়া জ্ঞানের স্পর্দ্ধা না রাখে। ভাষা শিক্ষা জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ। কিন্তু কর্ত্তব্যপালন সদ্ব্যবহার শিক্ষা সংসারের নানা প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানও অবশ্য কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ যে শিক্ষায় নারীগণ সংসারের সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা নিবারণ করিতে পারে, যে শিক্ষায় মানব গৃহ সজীব ও সুন্দর থাকে যে জ্ঞানলাভে পিতা স্বামী পুত্রগণকে ভগবানের প্রেমাকর্ষণ অনুভব করান যায়, কন্যা বধূগণকে তাহারি যোগ্যা করিতে হইবে।

বিদ্যা বা জ্ঞান যে অনন্ত অপরিমেয় সমস্ত জীবনেও যে মানবের শিক্ষা ফুরায় না ইহা তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। এই পবিত্র অথচ কঠিন, কষ্টসাধ্য অথচ আনন্দময় কার্য্যের ভার ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে শত কোটী ধন্যবাদ। এখনো আমাদের পুরাতন ধর্ম্মনীতির ভাব লোপ পায় নাই এবং পাশ্চাত্য সদ্গুণগুলি ক্রমে আয়ত্তের মধ্যে আসিতেছে। তথাপি বলিতে দুঃখ হয় আমাদের দেশীয় নারী-সমাজের অহঙ্কার হিংসাপরায়ণতা স্বার্থপরতা গুরুজনে অভক্তি

বিলাসিতার প্রভাব বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? অবশ্যই আছে। কয়লাকে শত ধৌত করিলে তাহার মালিন্য দূর হয় না কিন্তু অগ্নিসংযোগে সুন্দরবর্ণ ধারণ করে। সেইরূপ জ্ঞানজ্যোতি একবার হৃদয় আলোকিত করিলে মনের তমোরাশি পলাইয়া যায়। বিদ্যা ও কর্ম্মের প্রবল অনুরাগ যদি একবার বদ্ধমূল করিতে পারা যায় শিক্ষার সার্থকতা অবশ্যই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে।

অনেকে বলেন পুরুষে বিদ্যা শিক্ষা না করিলে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চলাইতে পারিবে না সুতরাং যত অর্থব্যয় হউক তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতেই হইবে। মেয়েদের প্রতি তার অষ্টমাংশ খরচ বৃথা ব্যয় মনে ভাবেন। কিন্তু যে নারীগণের উপর সংসারের সমস্ত সুখ শান্তি নির্ভর করে তাহাদের সুশিক্ষার জন্য রীতিমত ব্যয় কি অবশ্য কর্ত্তব্য নহে? যদি এ বিষয়ে পুরুষগণ পশ্চাদপদ হন আমরা যতটুকু পারি, যেমন করিয়া পারি বালিকাগণকে বধূগণকে মনুষ্য নামের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিব। আজিকার এই নূতন যুগের দিনে সকল জাতি সকল সম্প্রদায় সমুদয় দেশ—বিশেষতঃ আমাদের অর্দ্ধমৃত বঙ্গদেশে চেতনার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। সর্ব্ব ঘটনার মূলধারা সর্ব্বশক্তিমান ভগবান আমাদের সহায় হইবেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই অনুপ্রাণিত হইয়া নারীগণ একত্রে একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। যদি এই মিলন, এই বন্ধন দৃঢ় থাকে, কার্য্যে সফলতা তাহার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার। যদি আমাদের বালিকাগণকে সৃষ্টির প্রধান মানবের পাশে মানবীরূপে স্থিত করিতে পারি আমাদের সকল উদ্যম সার্থক হইবে। আমরা করুণাময়ের কৃপালাভের জন্য একান্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিব এবং অদম্য অধ্যবসায়ে মানাপমান বর্জ্জিত দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইব। যে সরিষা প্রমাণ বীজ কলিকাতায় রোপণ করা হইয়াছে কালে তাহা অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া সংসারের শ্রান্তিহররূপে বিরাজ করিবে, শত লাঞ্ছনার মধ্যেও ইহা আমাদের উৎসাহিত আনন্দিত রাখিবে।

মেয়েদের শিক্ষা

সরলা দেবী

আমাদের দেশে যে নারী জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে এবং নারীদের পর্দ্দাপ্রথা উঠিয়া যাইতেছে ইহা খুবই মঙ্গলের বিষয়, কিন্তু এই জাগরণ যে এক এক এক বিষয়ে সীমা ছাড়াইয়া অনিদ্রা রোগে দাঁড়াইতেছে, আমি সেই বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে চাই।

জাগরণের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে বিদ্যাশিক্ষা ও পুরুষের সমকক্ষ হইয়া চলা,—তাহার পর আর সব।

কিন্তু এই উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া মেয়েদের মানুষ করিতে গিয়া মেয়েদের জননীরা বা অভিভাবক অভিভাবিকারা অনেক বিষয়ে গলদ পাকাইয়া বসেন।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রঘরের মেয়েদের ১২।১৩ বছর বয়স হইতে না হইতেই বিবাহ হইয়া যাইত। কাজেই অবিবাহিত মেয়েদের কোন রূপ পর্দ্দাপ্রথা ছিল না। কিন্তু এখন যখন ঘর ঘর ১৫।১৬ বা তাহার চাইতেও বেশী বয়সের মেয়েরা অবিবাহিত থাকে (বিদ্যাশিক্ষার জন্যই হউক বা অর্থাভাব বশতই হউক) তখন তাহাদের নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তা ও মাধুর্য্য রক্ষার দিকে বড়দের কড়া নজর রাখা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি দেখিয়াছি অনেক স্থলেই তাহা রক্ষিত হয়না।

আমি যখন রেঙ্গুনে ছিলাম তখন এক সময় আমাদের পাশের বাসায় একঘর মাদ্রাজী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের চাল চলন লক্ষ্য করিবার আমার সুযোগ ছিল।

সেই গৃহস্থের একটী কুমারী কন্যা লছমী অবাধে বাহিরে চলা-ফিরা কথাবার্ত্তা ইত্যাদি করিত—কিন্তু যৌবন-সঞ্চারের পর লছমীকে গৃহকোণে বন্দী করা হইল, পিতা ও সহোদর ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতে দেওয়া হইত না। উহাদের দেশে এইরূপ নিয়ম। সকল মেয়েকেই 'বড়' হইবার পর অন্তঃপুরে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু বিবাহের পরই মেয়েরা পুনরায় স্বাধীন

ভাবে চলাফেরা করে, আর কোন বাধা থাকে না।

বিবাহ হইলেও মাদ্রাজী রমনীরা ঘোমটা দেয় না। সকল পুরুষের সম্মুখে বাহির হয় কিন্তু অপরিচিতের সহিত বাক্যালাপ করেনা, স্বল্প পরিচিতের সহিত অপ্রয়োজনীয় কথা বলেনা। পুরুষের চক্ষুর সহিত চক্ষু মিলিত করে না, মুখ খোলা থাকে কিন্তু দৃষ্টি থাকে নত।

মাদ্রাজী রমণীদের এই স্বভাবটি আমার বড়ই মধুর লাগে। আমাদের দেশে সকল স্থানে ঠিক এইরূপটি হয় না। বেশীর ভাগ নারীরা (বিবাহিতা অবিবাহিতা দুই) হয় একেবারে অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকেন, আর নয় এমন ভাবে পুরুষদের সাথে মিশিতে থাকেন যে তাঁহারাও যেন পুরুষ হইয়াই জন্মিয়াছেন, পুরুষের নিকট হইতে তাঁদের দেহের বা মনের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিবার যেন কোনই প্রয়োজন নাই।

পুঁথি গত বিদ্যা এবং শিল্প শিখিলেই নারী যে নারীর শিক্ষা চরমে উঠে না, শালীনতা ও লজ্জা যে সর্ব্ব প্রথমে দরকার আজকাল অনেকেই তাহা ভুলিতে বসিয়াছেন।

জ্ঞানীদের নিকট আমার প্রার্থনা তাঁহারা যেন এই বিষয়ে অধিকতর আলোচনা করিয়া জাতির কল্যাণ সাধন করেন।

বৌদ্ধযুগে স্ত্রীশিক্ষা

বিমলাচরণ লাহা

যে—সমস্ত রমণী বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে যে-সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ ত বেশ বুঝিতে পারিতেনই, শিক্ষা-ব্যাপারেও একেবারে অন্ধকারে ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধযুগের অনেক রমণী শিক্ষাদীক্ষায় তাঁহাদের পুরুষ-ভ্রাতাদেরই সমকক্ষ ছিলেন। অবিবাহিতা বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইত কিংবা গৃহেই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সে-কথার কোনও ইঙ্গিত অবশ্য বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাওয়া যায় না, কিন্তু শিক্ষিতা নারীর উল্লেখ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। পালিধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহের মতে থেরীগাথার শ্লোকগুলি ঋষিকল্পা নারীদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। নারীদের প্রতিভার প্রমাণ-স্বরূপ সুক্কার ধর্ম্মবক্তৃতা এবং ক্ষেমা ও ধর্ম্মদিন্নার দার্শনিক আলোচনা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। সুতরাং সে যুগের নারীদের ভিতর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না একথা বলিলে বৌদ্ধ-সাহিত্যের যে-সব ঐতিহাসিক সত্য আছে, তাহাই উপেক্ষা করা হয়। প্রাচীন ভারতের পাণ্ডিত্যের জন্য যে-সব রমণী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের দুই-চারিজনের নাম, ইউরোপীয়দের না হোক্ অন্ততঃ বহুভারতবাসীর স্মৃতিপথে এখনও জাগিয়া আছে। থেরীগাথা যাঁহারা গান করিতেন, তাঁহারাই রচনা করিয়া ছিলেন, এ সম্বন্ধে অবশ্য মতদ্বৈধ দেখা যায়, কিন্তু বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের যুক্তি অতি সামান্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁহারা ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখাইতে পারিতেছেন, ততদিন তাঁহাদের একথা অবিশ্বাস করিবার কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। বস্তুতঃ ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, বুদ্ধের সময়ে যাঁহারা সাংসারিক জীবন পরিহারপূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় আনন্দের রসাস্বাদনে সক্ষম হইয়াছিলেন, বহু সময়ে বিশেষভাবে মার যখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ইন্দ্রিয়-লালসার লোভ বা নানাবিধ বিভীষিকা

দ্বারা তাঁহাদিগকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিত, তখন তাঁহারাই মুখে মুখে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবময় শ্লোক-সকল রচনা করিয়া গান করিতেন। গাথাগুলি যে মেয়েদের দ্বারাই গীত হইত, তাহা নিঃসংশয়েই বলা যায়। তাহা ছাড়া যে সমস্ত রমণী শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের কয়েকজনের বিবরণও প্রদত্ত হইল। বুদ্ধের সময় মেয়েদের ভিতর শিক্ষার ব্যবস্থা যে প্রচলিত ছিল, তাহা এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়।

বক্তৃতা দিতে পারিতেন এমন একটি রমণীর উল্লেখ সংযুক্তনিকায় গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুক্কা নাম্নী একজন ভিক্ষুণী রাজগৃহের এক বৃহৎ জনতার সম্মুখে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া একজন যক্ষ এতই প্রীতিলাভ করিরাছিল যে, রাজ-গৃহের রাস্তায় রাস্তায় সে বলিয়া ফিরিতেছিল—সুক্কা সুধা বিতরণ করিতেছেন, যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহাদের সেই সুধা পান করিয়া আসা উচিত (১ম খণ্ড, পৃঃ ২১২—২১৩)। ক্ষেমা বিনয়গ্রন্থ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন, প্রচুর পড়িয়াছিলেন, চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারিতেন এবং তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। একদা রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত্যুর পর জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় কি না? তিনি বলিলেন, "ভগবান বুদ্ধ এ কথায় কোনও উত্তর দেন নাই।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই কেন?" ভিক্ষুণী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন কাহাকেও জানেন যিনি গঙ্গার বালুকা এবং সমুদ্রের জলবিন্দু গণনা করিতে পারেন?" রাজা কহিলেন, "না।" ভিক্ষুণী বলিলেন, "যদি কেহ পঞ্চ খন্ধের আকর্ষণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে তবে সে অসীম অতলস্পর্শ সমুদ্রের আকার ধারণ করে। সুতরাং মৃত্যুর পর এইরূপ জীবের পুনর্জ্জন্ম ধারণার অতীত বস্তু।" এই উত্তর শুনিয়া রাজা পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। (সংযুক্তনিকায়, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৭৪—৩৮০)।

ভদ্দা কুণ্ডলকেশা সংসার ত্যাগ করিয়া নিগণ্ঠ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। তারপর নিগণ্ঠদের ধর্ম্ম-মত অধিগত করিয়া তাঁহাদের

সাহচর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি পণ্ডিতদের কাছে কাছে ঘুরিয়া তাঁহাদের জ্ঞান-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। তর্কে এক সারিপুত্র ছাড়া আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। এই সারিপুত্র তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। (থেরীগাথা ভাষ্য, পৃঃ ৯৯)।

মজ্ঝিম নিকায় গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনে সুপণ্ডিতা ধম্মদিন্না নাম্নী একজন শিক্ষিতা মহিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। একদিন ধম্মদিন্নার স্বামী তাঁহাকে আর্য্যঅষ্টাঙ্গিকমার্গ, সংস্কার, নিরোধসমাপত্তি হইতে উদ্ধারলাভের উপায় এবং নানা প্রকারের বেদনা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন করেন। ধম্মদিন্না প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "পঞ্চ উপাদানখন্ধের দ্বারা সংস্কার নির্ম্মিত।" তৃষ্ণার অর্থে সংস্কার সমুদয়। তৃষ্ণা-ধ্বংসের অর্থ সংস্কার-বিনাশ, মহান আটটি পথের দ্বারা সংস্কার-নিরোধ লাভ করা যায়। মূর্খ যাহারা তাহারাই পঞ্চ উপাদান-খন্ধকে একত্রে এবং পৃথকভাবে অত্তাকে (আত্মাকে) দেখে। জ্ঞানী শিষ্যেরা বাক্য, নিশবাসপ্রশবাস এবং মনের কার্য্যকে এইরূপ ভাবে গ্রহণ করেন না। যাঁহারা নিরোধসমাপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐগুলিকে একটির পর একটি রোধ করেন। বেদনা তিন প্রকারের—যথা, সুখ, দুঃখ, এবং অদুঃখ—অসুখ [১ম খণ্ড পৃঃ ২৯৯ হইতে] ধম্মদিন্না বিনয়গ্রন্থ বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন (দীপবংশ, ১৮ পর্ব্ব)।

বিমাববথুভাষ্যে (পৃঃ ১৩১) একটিমাত্র শিক্ষিতা রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রমণীটি শ্রাবস্তীর জনৈক উপাসকের কন্যা—তাঁহার নাম ছিল লতা। তিনি শিক্ষিতা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। সঙ্ঘমিত্তা তিন রকমের বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন। যাদুবিদ্যাতে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল (দীপবংশ, ১৫ পর্ব্ব)। বিনয়পিটক তিনি এরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, অন্যলোককে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারিতেন। বস্তুতঃ অনুরাধপুরে বিনয়পিটক, সুত্তপিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ এবং অভিধর্ম্মের সাতখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন (দীপবংশ, ১৮ পর্ব্ব)। অঞ্জলি ছয়টি অলৌকিক গুণ এবং মহান দৈবশক্তির অধিকারিণী

ছিলেন। সংঘমিত্তার মত তাঁহারও বিনয়পিটকে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। সুতরাং তিনি অন্য লোককেও এই গ্রন্থ হইতে শিক্ষা দান করিতে পারিতেন। তিনি অনুরাধপুরে ১৬ হাজার ভিক্ষুণীসহ গমন করিয়াছিলেন এবং বিনয়পিটক হইতে সত্যসত্যই শিক্ষাও দান করিয়াছিলেন। উত্তরা ত্রিবিধ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং যাদুবিদ্যা সম্বন্ধেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনুরাধপুরে গমন করিয়া তিনি বিনয়-পিটক, সুত্তপিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাতখানি গ্রন্থের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। কালি একজন দুশ্চরিত্রের কন্যা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের মন অত্যন্ত পবিত্র ছিল এবং তিনি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই সুপণ্ডিতা ছিলেন। তিনিও অনুরাধপুরে বিনয়পিটক সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। যে-সব ভিক্ষুণী বিনয় আলোচনার দ্বারা জ্ঞানাৰ্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সপত্তা, ছন্না, উপালি এবং রেবতীর নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। সীবলা এবং মহারুহা অনুরাধপুরে বিনয়পিটক, সুত্তপিটকের পাঁচ-খানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাতখানি গ্রন্থের অধ্যাপনা করিতেন। সমুদ্দনাভা অনুরাধপুরে বিনয়পিটক শিক্ষা দান করিয়াছিলেন (দীপবংশ, ১৮ পৰ্ব্ব)। হেমা ত্রিবিধ বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন এবং অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ছিল (দীপবংশ, ১৫শ পৰ্ব্ব)। তিনি বিনয়পিটক, সুত্তপিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাতখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। (১৮ পৰ্ব্ব)। অগ্গিমিত্তা ত্রিবিধ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। (১৫ সর্গ)। চুলনাগা, ধন্না, সোনা মহাতিসসা, চুলসুমনা এবং মহাসুমনা প্রভৃতি নারীগণ শিক্ষিতা, প্রতিভাসম্পন্না এবং শাস্ত্রজ্ঞা ছিলেন (১৮ সর্গ)। নন্দুত্তরা বিদ্যা এবং শিল্পে পারদর্শিনী ছিলেন (থেরীগাথা ভাষ্য, পৃঃ ৮৭)। যে-সমস্ত ভিক্ষুণী বিনয়পিটক আয়ত্ত করিয়াছিলেন, পটাচারা তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারিণী। (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫ এবং দীপবংশ, ১৮ সর্গ)। উল্লিখিত থেরীগণ ব্যতীত আরও অনেক রমণীর নাম পাওয়া যায় যাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়া-

ছিলেন। উৎপলবন্না, শোভিতা, ইসিদাসিকা, বিশাখা, সবলা, সঙ্ঘদাসী, এবং নন্দা বিনয় গ্রন্থ বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। থেরী উত্তরা, মল্লা, পব্বতা ফেগ্গু, ধম্মদাসী, অগ্গিমিত্তা এবং পসাদপাল অনুরাধপুরে বিনয়পিটক ও সুত্তপিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাতখানি গ্রন্থ হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। সধম্মনন্দী, সোমা, গিরিদ্ধি, দাসী এবং ধম্মা বিনয় গ্রন্থ বেশ ভালভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। সুমনা, মহিলা, মহাদেবী, পদুমা, এবং হেমাসা অনুরাধপুরে বিনয়পিটক হইতে শিক্ষাদান করিতেন। (দীপবংশ, ১৮ সর্গ)। দিব্যাবদানে রাত্রিকালে বুদ্ধবচন-পাঠ-নিরতা নারী-ছাত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃঃ ৫৩২)।

জাপানে স্ত্রীশিক্ষা ও আমাদের কর্ত্তব্য

অবলা বসু

আজকার সম্মিলনে কেহ বা আমার পূজনীয় কেহ বা আমার সমবয়স্ক। যাহাদের সহিত একত্রে ব্রাহ্মসমাজের উদার আদর্শে বর্দ্ধিত হইয়াছি—কিন্তু অধিকাংশই আমার কনিষ্ঠ—তাঁহাদেরই বিশেষভাবে আজ সম্বোধন করিতেছি। আমি বক্তা নহি। এ পর্য্যন্ত কোথায়ও প্রকাশ্য সভায় কিছু বলি নাই—তবে আজ কেন সম্মত হইলাম। দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা আপনাদের নিকট প্রকাশ না করিলে আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে, তাই স্বাভাবিক সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আজ দু-চারটি কথা বলিব। যদি আমার হৃদয়ের আশা ও উৎসাহের কণামাত্র আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলেই সুখী হইব।

আমরা যে জিনিস প্রত্যহ দেখি এবং যাহা অনায়াসে পাই, তাহার মূল্য বুঝি না, এমন কি তাহা অবজ্ঞার চক্ষে দেখি। আবার এক সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কাজ করিতে করিতে আমাদের চক্ষে অভাবগুলিই প্রতিনিয়ত প্রতিভাত হয়, আমরা বড় করিয়া দেখিবার শক্তি হারাই।

এজন্যই আমাদের মাঝে মাঝে দেশভ্রমণে বাহির হওয়া উচিত মনে করি। প্রবাসে গেলেই আমরা প্রতিদিনের বিরক্তিকর ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি ভুলিয়া যাই, যেগুলি আমাদের অগোচরে প্রচ্ছন্ন ভাবে আমাদের আনন্দ দিয়াছে, সেগুলিই মনে আসে। দেশের প্রতি ভালবাসা জাগিয়া উঠে এবং দেশের সামান্য জিনিসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া নূতন স্থানে আমাদের আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তি বাড়িয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশের রীতি নীতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পুস্তক হইতেই—পুস্তকে আমরা কেবল আদর্শটাই জানি এবং সেই আদর্শের সহিত আমাদের দুর্ব্বলতার তুলনা করি। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করিয়া

তাহাদেরও দৈনন্দিন জীবন দেখিলে তখনই আমরা প্রকৃত বুঝিতে পারি কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, কোনটাতে আমরা ছোট, কোনটাতে আমরা বড়। বিদেশে সব চেয়ে আমাদের মনে হয়, সব দেশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আমরা কেবল পশ্চাতে পড়িয়া আছি।

পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার আর এক সুফল এই যে, সেখানে আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা এক মায়ের সন্তান। সেখানে ভারত সন্তানের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নাই, বাঙ্গালী পাঞ্জাবী নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, সকলেই ভারতের—ভারতবাসীরা আমেরিকাতে হিন্দু অথবা হিন্দুস্থানী নামে খ্যাত। ভারতবর্ষে যে একতা সাধন কষ্টসাধ্য, বিদেশে তাহা অনায়াসে সাধিত হইতেছে। বিদেশে যাওয়ামাত্র সকলে ভাই ভাই বলিয়া পরস্পরকে চিনেন—এ এক অদ্ভূত ব্যাপার। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ৮।১০টী প্রদেশে গিয়াছি, প্রত্যেক স্থানেই এই একতার ভাব দেখিয়াছি—এক স্থানে ছাত্রাবাসে নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিলাম, মুসলমান ছাত্রটি রন্ধন ও পরিবেশন করিলেন, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী কায়স্থ সকলে এক সঙ্গে আহার করিলেন, তাঁহারা সকলেই একতাসূত্রে আবদ্ধ।

আমেরিকাতে অধিকাংশ ছাত্রই অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। ইহা যে কতদূর শ্রমসাধ্য তাহা আপনারা জানেন। আমাদের দেশের কত দরিদ্র ছাত্র পাচকের কার্য্য করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছেন। আমেরিকাতে এই সব ছাত্রদের মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় যে সব ছাত্র এক শহরে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা যে সব সময়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা এক সাধারণ ফণ্ড করিয়া যিনি যখন যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা ভাগ করিয়া একে অন্যকে সাহায্য করেন। কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত, কপর্দ্দকশূন্য এই যুবকদের যেখানেই দেখিয়াছি, কাহারও মুখে নিরাশা বা ম্লানভাব দেখি নাই। আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ—সকলেরই উদ্দেশ্য জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া ভারত মাতার সেবা করা। সকলেই দিন গণিতেছেন, কবে কর্ম্মক্ষম হইয়া দেশে ফিরিবেন। আমাদের

ভ্রমণকালে আমেরিকা, চীন জাপান যেখানেই গিয়াছি, ভারতীয় ছাত্র বা ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।

পৃথিবীতে এমন স্থান নাই যেখানে ভারতবাসী কোন না কোন কার্য্যোপলক্ষে বাস না করিতেছেন এবং আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব দ্বারা ভারতের গৌরবই বৃদ্ধি করিতেছেন —ইহা কি কম আনন্দের বিষয় ?

আমরা যেখানেই গিয়াছি, ভারতীয় ভদ্রলোক ও যুবকদের আতিথ্য ও সেবা পাইয়া ধন্য হইয়াছি। ধন্য হইয়াছি এজন্য যে ভারতবাসীর এখন আত্মমর্য্যাদা বোধ ও আত্মজ্ঞান হইয়াছে—এক সময় ছিল যখন আমরা পরস্পরকে হিংসা করিতাম—এখন আর সেদিন নাই, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের সেবা ও যত্ন যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা মাতৃসেবা করিতেছেন, এইরূপ অনুভব করিয়াছি। যাঁহাদের জীবনে কখন দেখি নাই অথবা আর কখন দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, কি ভারতে কি বিদেশে সেই সকল ভারতবাসী প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমাদের অতি আত্মীয়ভাবে সেবা ও যত্ন করিয়াছেন—ঘরের লোকের মতন ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, আমাদের মধ্যে চেতনা আসিয়াছে। এখন আর আমাদের আলস্য করিলে চলিবে না। আমাদের মধ্যে যাহার যতটুকু শক্তি মাতৃসেবাতে নিযুক্ত করিতে হইবে। মাতৃভূমির সেবা অনেকে অনেক রকম করিতেছেন এবং করিতে ইচ্ছুক আছেন। আপনাদের নিকট নারীজাতির পক্ষ হইতে আমার একটি নিবেদন আছে।

এই সম্মিলনে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার দরকার নাই, কিন্তু ভ্রমণকালে বিভিন্ন দেশের নারীজাতির অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত কোন দেশের উন্নতি হইতে পারে না। এ কথা ত আপনারা সকলেই জানেন, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। কিন্তু আপনারা যে জানিয়াও জানিতেছেন না—আপনারা যদি সত্যই তাহা বিশ্বাস করিতেন, তবে কি এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিতেন। কেবল স্ব স্ব কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই কি আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল ?

দেশময় মেয়েরা অশিক্ষিত রহিয়াছে, অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া

রহিয়াছি, তাহার জন্য আমরা কি করিতেছি ? স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পড়িয়াছি, অনেক কবিতা দেখিয়াছি, কিন্তু কাজ কি হইতেছে ?

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধেই বা ক'জন চিন্তা করিতেছেন। আমাদের ছাত্রদের শিক্ষা প্রণালী ইংলন্ডের শিক্ষা-প্রণালী হইতে অনেক পুরাতন, আবার মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালীও তাহারই অনুকরণে গঠিত। আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আমরা যে শিক্ষা বিষয়ে একেবারে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিব তাহার কোন কারণ দেখি না। আমি স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা চাই, কিন্তু যে শিক্ষাতে ভারত নারী তাঁহার নম্রতা বিনয় ও কোমলতা হারান সে শিক্ষা চাই না। আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে, সংকীর্ণতা দূর করিতে হইবে। প্রাদেশিকতা ছাড়াইয়া আমাদের দেশকেও বড় করিয়া দেখিতে হইবে এবং তবথে' নারীজাতিকে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিতে হইবে।

এখন আমরা ছোটখাট বিষয় লইয়া দিন কাটাইতেছি, কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন নারীরা জ্ঞান আহরণ করিয়া জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের সংকল্প হউক যে ভারতে সেদিন আনিতে হইবে ; এবং আপনারা আমাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হউন। আমাদের দেশে নারীশিক্ষা বিস্তারের মূলে কয়েকটী উৎসাহী যুবক ছিলেন। জাপানে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস পড়িলেও তাহাই দেখি। জাপানের যখন প্রথম চেতনা হইল তখন সকলেই পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রবৃত্ত ছিলেন, এই পাশ্চাত্য অনুকরণ যাহাতে বন্ধ হয়, যাহাতে জাপানী আচার ব্যবহার সুরক্ষিত হয়, জাপানী স্ত্রীশিক্ষা সেই উদ্দেশ্যে পালিত হইল। জাপানে কোন দিন অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না, কিন্তু তাহাদের সামাজিক প্রণালী ইউরোপীয় নহে। যদিও জাপানী নারী অসঙ্কোচে রাস্তায় বাহির হন, কিন্তু পুরুষদের সহিত সমাজে মেশামেশী নাই। স্কুলের বালিকা, বিবাহিত, অবিবাহিত সকলেই ট্রামে, গাড়ীতে পুরুষদের সঙ্গে যাতায়াত করেন বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই একটু ব্যবধান থাকে। কয়েকটী জাপানী যুবক, ইয়োরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া

স্ত্রীজাতির উচ্চ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁহারা কি করিয়া উচ্চশিক্ষা প্রচলন করিবেন, রাত্রিদিন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা এক একটি নগরে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজেরাই তাহাতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বিদ্যালয় যখন দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তখন তাহার ভার যোগ্য ব্যক্তির উপর দিয়া তাঁহারা অন্য নগরে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের বিদ্যালয় সমূহ দেশের গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে ও অর্থে বর্ত্তমান স্ত্রীবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, আমি সেটী দেখিতে গিয়াছিলাম। টোকিও সহরের প্রান্তে একটী ছোটখাট গ্রামের মতন ইহার বিস্তৃতি। প্রাথমিক হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। লেখাপড়ার সহিত গৃহস্থালী এমন কি আদব কায়দা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। কেবল যে সুকুমার বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, এমন নহে, গো-পালন, পশুপক্ষী পালন, কৃষিকার্য্য শিক্ষা সমুদয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত। জাপানীরা তাহাদের দেশের উপযোগী শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছে। তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের আড়ম্বরহীনতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি, তাহারা নিজেদের আবশ্যকতা অনুসারে গৃহকার্য্য ও জীবনধারণপ্রণালী গঠন করিয়া লইয়াছে। আর আমাদের জীবনধারণ প্রণালী দিন দিন আরও জটিল ও বিলাসিতাপূর্ণ হইতেছে। এই বিলাসিতা হইতে জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিতে হইলে নারীর উচ্চশিক্ষা ছাড়া আর উপায় নাই।

জাপান দেশ সব দেশ হইতে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দেশটী যেন ছবির মতন গোছান। বাড়ী ঘর, রাস্তা, গলি কোথাও কোন অপরিষ্কার জিনিস দেখি নাই।

জাপান তাহার দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্য্যে নানা সম্বন্ধে আধুনিক ও নব আবিষ্কৃত সব নিয়ম পালন করিতেছে কেন? স্ত্রীশিক্ষার ফলে। প্রাচ্য প্রতীচ্য সব দেশই অগ্রসর হইতেছে, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমরা কি কেবল পশ্চাতে রহিব? আমাদের নিজেদের চেষ্টা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা

করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—আমাদের মধ্যে চিন্তাশীল ও মেধাবী ব্যক্তিগণ ইউরোপে, আমেরিকাতে ও জাপানে গিয়া পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা প্রণালী আলোচনা করিয়া আমাদের দেশের জন্য কিরূপ শিক্ষা চাই, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের মেয়েদের শিক্ষা-প্রণালী প্রাণহীন ও শুষ্ক বলিয়া মনে হয়। আমরা মেয়েদের কতকগুলি বিষয় শিখাইয়াছি, যাহার সহিত জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা জীবন-গঠন করিতে পারি নাই। জাপানে দেখিলাম মেয়েরা বিবাহিতা হইয়াও বাস করে! ইহা কিরূপে সম্ভব? আমাদের শিক্ষিত মেয়েদের বিবাহ হইলেই তাহারা কার্য্যক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়ে—তাহাদের আর লেখাপড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। তাহার কারণ আমাদের সংসার গঠন সরল ও সহজ নহে। যত দেশ বেড়াইলাম, জাপান পর্য্যন্ত সকল স্থানেই গৃহিণীরা গৃহকার্য্য; সন্তান পালন সব করিয়া অবসর মত লেখাপড়ার চর্চ্চা ও সামাজিক কর্ত্তব্য সবই পালন করেন। কেবল আমাদের দেশেই আমরা দিনরাত আহারাদি গৃহকার্য্য লইয়া বিরত থাকি। ইহার কারণ বাহির করিয়া তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। জাপানে যে সকল মহিলা আমেরিকা ও জর্ম্মানী হইতে শিক্ষিতা হইয়া শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের বেতন ৭৫৲ মাত্র, ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাইলাম যে আমাদের গরীব দেশ, তাহাতে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে সে জন্য আমরা শিক্ষা প্রচার ব্রতরূপে গ্রহণ করি। জাপানে ৫০ বৎসরেরও কম হইবে, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, তাহার ফলে এইরূপ নারী-চরিত্র গঠিত হইয়াছে, আর আমাদের মধ্যে ক'জনের কাছে এইরূপ কথা শুনিতে পাই? আমরা শিক্ষাবৃত্তি করিয়া নিজেদের সুখ সচ্ছন্দতা সংসার লইয়া আছি। ক'জনের বা দেশের কথা মনে হয়। কয়জন শিক্ষা প্রচার ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি? যতদিনে এই ভাবে আমাদের মেয়েরা অনুপ্রাণিত না হইবে, ততদিন শিক্ষা বিফল হইবে। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে সত্য পথ অনুসরণ করিলে অবিলম্বে আমাদের মধ্যে এই ভাব প্রবেশ করিবে। সে জন্য

আমাদের ব্রতধারিণী ২।১টি মহিলাকে ইয়ুরোপে পাঠাইয়া শিক্ষা-প্রণালী শিখাইয়া আনিতে হইবে! যতদিন তাহা না হয়, ততদিন পাশ্চাত্য-দেশ হইতে আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ২।১টি মহিলাকে আনা আবশ্যক। ইহাতে কয়েকটি বিপদ আছে। পাশ্চাত্য রমণীর ব্যক্তিত্ব এত অধিক যে সচরাচর তাঁহাদের সহিত আমাদের মিলন হয় না এবং তাঁহারা আমাদের উপর আধিপত্য করিতে চান।

ভগিনী নিবেদিতার ন্যায় স্বার্থশূন্য শিক্ষাব্রত ধারিণী নারী সব সময় সব দেশে দেখা যায় না। আমার সৌভাগ্যবশতঃ খুঁজিতে খুঁজিতে দুইটি উদার হৃদয়া নারীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তাঁহারা এদেশে আসিয়া আমাদের অধীনে থাকিয়া আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইহা অর্থ সাপেক্ষ।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার কোনই বন্দোবস্ত ছিল না, তখন একটী দরিদ্র অজ্ঞাত পণ্ডিতের প্রাণ নারীজাতির দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তিনি নারীজাতির উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন বাধা বিপত্তি না মানিয়া প্রবল উৎসাহে তিনি নারীজাতির উন্নতির সহায় হইয়াছিলেন। সেই অবলা বান্ধব কর্ম্মবীরের নাম কাহারও অবিদিত নাই। আজ তবে কি এই বঙ্গভূমিতে শত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব অসম্ভব?

নব্যশিক্ষা ও দেশ-জ্ঞান

যোগেশ চন্দ্র বাগল

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে নবজাগরণের সূচনা হয়। নব্যশিক্ষা—তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারাই যে তখন ইহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা এখন কাহাকেও নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হয় না। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি নানাদিকেই নব নব জিজ্ঞাসা আমাদের মনে উদিত হয় এবং নিজ নিজ জ্ঞান বিশ্বাস মতে নব্যশিক্ষিতেরা তাহার সমাধানেও অগ্রসর হন। ইংরেজী শিখলেই আমরা চাকুরি পাইব, অথবা চাকুরির জন্যই আমরা ইংরেজী শিখিব এরূপ ধারণা তখনও বাঙালীদের মনে বদ্ধমূল হয় নাই। তবে হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের সরকার বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করিতে ক্রমে আরম্ভ করিলেন। অনেক খরচে কাজ উসুল করার জন্যই তাঁহারা এরূপ করিতে প্রলুব্ধ হন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকার স্পষ্টতঃই ঘোষণা করিলেন যে, সরকারী কর্মে নিয়োগে ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণকে অগ্রে সুযোগ দেওয়া হইবে। ইহার পর হইতে এই রীতি বরাবর চলিয়া আসিয়া 'চাকুরি'র জন্যই আমরা ইংরেজী শিখি এইরূপ ধারণা শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙালীর মনে দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল। আজিও এই মনোভাবের জের চলিতেছে।

বাংলার নবজাগৃতির মূলে যে তখনকার নব্যশিক্ষা একথা এইমাত্র বলিলাম। নব্যশিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালীরা আহৃত জ্ঞান গৌরজন'কে পরিবেশন করার জন্যও উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, কখনও এককভাবে আবার কখনও সংঘবদ্ধভাবে। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ পাঠ্যাবস্থায়ই নিজ নিজ পল্লীতে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া প্রতিবেশী সন্তানদের বিদ্যাদান সুরু করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা সভা-সমিতি গঠন করিলেন সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা নিমিত্ত। পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ইহার একটি

উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু ইহার মূলে ছিল দেশ-প্রীতি। দেশ-প্রীতি বা দেশ-প্রেম এ কথাগুলির তখন তেমন চলন হয় নাই বটে, তবে স্বদেশের উন্নতিসাধন স্পৃহাই যে তাঁদের সকল প্রয়াসের প্রেরণা যোগাইত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। আজিকার দিনেও ইহা আমাদের নিকট কেমন আশ্চর্য ঠেকে। ইংরেজীতে এই মর্মের একটি কথা আছে—চিন্তা কর্মের নিয়ামক। স্বদেশের উন্নতিচিন্তা যে স্বদেশের হিত-কর্মে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছিল একটি প্রতিষ্ঠান বা সংঘ হইতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সংঘটি সম্বন্ধেই এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

২

সে কালের শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতির যাঁহারা খোঁজ-খবর রাখেন তাঁহারা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের একাডেমিক এসোসিয়েশনের কথা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। ছাত্র-যুবকদের সংঘবদ্ধভাবে স্বদেশের হিত-চিন্তার সূত্রপাত হয় এখানে। সভাটি প্রায় দশ বৎসর চলিয়া ১৮৩৯ সন নাগাদ উঠিয়া যায়। এই দশ বৎসরের মধ্যে উক্ত এসোসিয়েশনের সভ্য-ছাত্রগণ বিবিধ কর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ সরকারী কর্ম গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বা মফস্বলে চলিয়া গিয়াছেন, কেহ শিক্ষাব্রত অবলম্বন করিয়া পঠন-পাঠনে নিযুক্ত, কেহ সাংবাদিক হইয়াছেন, আবার কেহ-বা ব্যবসা-কর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু যখন যে কার্যেই তাঁহারা লিপ্ত থাকুন, স্বদেশের উন্নতি-চিন্তা তাঁহাদের অধিকাংশ কর্মেরই ছিল নিয়ামক। কলিকাতাস্থিত হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণ অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহাদের এই ভাবনাকে একটি সংঘের মধ্যে দিয়া স্পষ্ট রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই প্রয়াসের ফল—'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'। ইহার ইংরেজী নাম বড়ই দীর্ঘ—Society for the Acquisition of General Knowledge। আমরা পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশে এইরূপ বহু সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করি। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র কথা এখানে বলিতেছি না। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইহার কর্মসূচীর অঙ্গীভূত হইলেও ইহার

লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র মত পার্সিভিয়ারেন্স সোসাইটি', 'বেথুন সোসাইটি', 'ফেমিলি লিটারারি ক্লাব', 'ভবানীপুর লিটারারি এসোসিয়েশন', 'সোশ্যায়াল সায়ান্স এসোসিয়েশন' প্রভৃতি সভা-সমিতি পর পর স্থাপিত হইয়াছিল। 'কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি', 'ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট সোসাইটি' বা 'ভার্ণাকুলার ট্রানস্লেশন কমিটি' ঠিক এ পর্য্যায়ে পড়ে না বলিয়া উল্লেখ করিলাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রধান উদ্যোক্তারা ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদল। ১৮৩৮ সনের ২০শে তারিখে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি-পত্রে ('Circular') স্বাক্ষর পাইতেছি এই পাঁচ জনের: তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং রাজকৃষ্ণ দে। এই বিজ্ঞপ্তি-পত্রখানি অন্যত্র হুবহু প্রকাশিত করিয়াছি। সভার উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারিগণ বলেন যে, আমাদের বিদ্যালয়সমূহে যে-সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, পরবর্তী কালে কর্মজীবনে প্রবেশের পর চর্চার অভাবে তাহা তাহারা ক্রমশঃ ভুলিয়া যায়, সে-সব বিষয়ে জ্ঞান বর্দ্ধিত ও প্রসারিত হওয়া দূরে থাকুক। অধিগত বিদ্যা এভাবে সমাজেরও কোন কল্যাণে আসে না। ইহার উন্নতির সম্ভাবনাও দূরে সরিয়া যায়। তাঁহারা বলেন, এই অভাব পূরণ করিবার জন্য—বিদ্যা-চর্চা বৃদ্ধি এবং সংঘবদ্ধ প্রয়াসে প্রবৃত্তি উভয়ই বর্ধনকল্পে একটি সভা গঠন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের কথায়—

"If a tree is to be known by its fruits, where, with but one or two solitary exceptions, are the fruits to which we can point with pride and satisfaction, as manifesting any degree of intellectual energy or extent of learning ? We have ever sincerely regretted the want of an Institution which should be the means of promoting mutual intercourse among the educated Hindoos and of exciting an emulation for mental excellence. There is at present no occasion whereby

we are ever called upon to congregate on an extensive scale, for the purpose of mutual improvement and whence we may require an impetus for applying ourselves to useful studies. It is not then desirable to unite in such a landable pursuit by which the bonds of fellowmen may be strengthened, the acquisition of knowledge promoted, and the sphere of our usefulness extended ?"

স্বাক্ষরকারিগণ বিজ্ঞপ্তি-পত্রে কর্মপ্রণালীর খানিকটা আভাস দিয়াছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশেয়ালি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে মধ্যে মধ্যে এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ করা হইবে, বা মৌলিক বক্তৃতা দেওয়াও চলিবে। লেখক বা বক্তা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা দ্বারা সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করিবেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি নিজের ও দেশের উন্নতি চান না ? তাঁহারা বলেন যে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রামকমল সেনের নিকট হইতে সভার অধিবেশনসমূহের জন্য কলেজ-হল ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে, এবং ১৮৩৮, ১২ই মার্চ দিবসে সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ সভা হইবে।

৩

বিজ্ঞপ্তি-পত্র বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং নব্যশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে প্রচারিত হয়। যথারীতি সভার অধিবেশন হইল। এই সভার একটি বিস্তৃত বিবরণ অন্যতম উদ্যোক্তা রামগোপাল ঘোষের একখানি পত্র হইতে জানা যায়। নির্দিষ্ট দিনে (১২ই মার্চ ১৮৩৮) সংস্কৃত কলেজ হলে তিন শতাধিক যুবক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। নানারূপ আলাপ-আলোচনার পর পূর্বোক্ত নামে ও পূর্ব প্রচারিত উদ্দেশ্যে সভা গঠিত হইল। নব্যবঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া অধ্যক্ষ সভা গঠিত হয়। সভাপতি পদে বৃত হইলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী ; সহকারী সভাপতি—কালাচাঁদ শেঠ এবং রামগোপাল ঘোষ ; সম্পাদক—রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র ; কোষাধ্যক্ষ—রাজকৃষ্ণ মিত্র। এতদ্ব্যতীত সদস্য হন ছয় জন—পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রসিক লাল সেন,

মাধবচন্দ্র মল্লিক, প্যারীমোহন বসু, তারিণী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ দে। মাধবচন্দ্র মল্লিক অল্পদিন পরেই সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্বোপরি ডেভিড হেয়ার, 'ভিজিটর' বা বা দর্শকের সম্মানিত পদে বৃত হইলেন। এই প্রারম্ভিক সভায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও ভিড় জমাইয়াছিল। রামগোপাল উক্ত পত্রে তাঁহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

সভা পরিচালনা সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম ধার্য হয়। সভ্যদের চাঁদা দেওয়া ইচ্ছাধীন, সভা মাসে একবার করিয়া হইবে, প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবার সন্ধ্যায় সভা বসিবে—এরূপ উল্লেখ কতকগুলি নিয়মে ছিল। প্রবন্ধ-পাঠ বা বক্তৃতা-দান সম্বন্ধে বাধ্য-বাধকতা ছিল। পরবর্তী অধিবেশনে কি বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ হইবে তাহা পূর্বদিনের অধিবেশনে বিঘোষিত করা হয়। উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে বক্তা অনুপস্থিত হইলে তিরস্কৃত হইবেন—একটি নিয়মে এরূপ কথাও ছিল। প্রবন্ধ-পাঠ বা বক্তৃতা-দানের পর আলোচনাও চলিত। মোট কথা, এসিয়াটিক সোসাইটির আদর্শেই এই নিয়মগুলি রচিত হইয়াছিল। তবে নিয়ম-সংখ্যা ছিল অতি কম, মাত্র পনেরটি।

যাহা হউক, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রতিষ্ঠা ও নিয়ম-কানুন রচনার পর প্রথম সাধারণ মাসিক অধিবেশন হয় প্রায় দুই মাস পরে, ১৮৩৮ সনের ১৬ই মে তারিখে। অধ্যক্ষ-সভার অন্যতম প্রধান সদস্য কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় এই প্রথম অধিবেশনে ইতিহাস পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এদিন ঝড়বৃষ্টি সত্ত্বেও অন্যূন একশত যুবক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সংস্কৃত কলেজ-হলে সমবেত হইয়াছিলেন। সংবাদপত্রেও সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাহির হয়। এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে রামগোপাল ঐ পত্রে লিখিয়াছেন:

"It is remarkable for its chaste and elegant language as well as for the varied information with which it was replete. The illustrations were apt and striking and were chiefly drawn from ancient History."

৪

সভায় ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ-পাঠ বা বক্তৃতা-দান চলিত। এখানে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ অধ্যক্ষসভা কর্তৃক তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়, যথাক্রমে ১৮৪০, '৪২ ও '৪৩ সনে। প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত রচনা বা বক্তৃতাবলীর চৌদ্দটির মধ্যে পাঁচটি লিখিত বা প্রদত্ত হয় আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিই ছিল বাংলায়। শতাধিক বৎসর পূর্বে বঙ্গসন্তানেরা যে বাংলা ভাষা অনুশীলনের এবং শিক্ষার বাহনরূপে ইহার প্রয়োগের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এই বক্তৃতা হইতে তাহা সম্যক্ বুঝা যাইতেছে। ১৮৩৮ সনে প্রদত্ত বা পঠিত পাঁচটি প্রস্তাবই ইহাতে স্থান পায়। প্রথমোক্ত দুইটি প্রস্তাব ব্যতিরেকে কাব্য, বাঁকুড়া জেলার ভৌগোলিক বিবরণ ও আর্থিক অবস্থার পরিসংখ্যান জ্ঞান, হিন্দু-নারীর অবস্থা—এইরূপ নানা বিষয়ের উপরই প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। ১৮৩৯ সনে পঠিত প্রস্তাবের মধ্যে আটটি ও ১৮৪০ সনের একটি এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে তিনটি প্রস্তাব বাংলায় লিখিত। 'ভারতবর্ষের সংক্ষেপ ইতিহাস' (১ম, ২য় ও ৩য় প্রস্তাব) বাংলা ভাষায় গোবিন্দলাল সেন কর্তৃক লিখিত। চট্টগ্রামের বিবরণ সম্বন্ধে ইংরেজী প্রস্তাব রামগোপাল ঘোষের বিশিষ্ট বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাকের রচনা। প্যারীচাঁদ মিত্রের হিন্দু রাজাদের আমলে হিন্দুস্থানের অবস্থা শীর্ষক দুইটি প্রস্তাব এবং পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব্যশিক্ষা-প্রাপ্ত হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক ও অন্যান্য সংস্কারের প্রবর্তন বিষয়ে ইংরেজী প্রস্তাবও এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

১৮৩৮ হইতে ১৮৪০ সনের প্রারম্ভ পর্যন্ত সভার সাধারণ সভ্যদের একটি তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে ১৬৬ জন সভ্যের নাম পাইতেছি। সে যুগের নব্যশিক্ষা-প্রাপ্ত বিখ্যাত বহু লোকেরই নাম এই তালিকায় পাওয়া যায়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সভা কর্তৃক প্রকাশিত পরবর্তী দুই খণ্ড রচনা-বলীতেও (১৮৪২ ও '৪৩) এক একটি করিয়া সভ্য-তালিকা সংযোজিত রহিয়াছে। এ দুইটিতে সভ্য-সংখ্যার কিছু রদ-বদল আছে সত্য, কিন্তু দুই-ই মূলতঃ প্রথম তালিকারই অনুক্রম। প্রথম

তালিকার ১৬৬ জন সভ্যের মধ্যে ১১ জন মফঃস্বলে স্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রশেখর দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক। ইঁহারা প্রত্যেকেই সে যুগে হিন্দু কলেজের ছাত্ররূপে যেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তেমনি সরকারি কর্মেও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন হন। কলিকাতায় স্থিত সভ্যদের অনেকেই যে কৃতবিদ্য যুবক সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—বেণীমাধব মিত্র, ভোলানাথ চন্দ্র, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, গুরুচরণ দত্ত, ক্ষেত্রচন্দ্র দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, নীলমণি মতিলাল, প্যারীচরণ সরকার, রাজেন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ সরকার, শিবচন্দ্র দে, উদয়চন্দ্র আঢ্য প্রভৃতি। অধ্যক্ষ-সভার সদস্যগণের নামও সাধারণ-সভ্য তালিকায় পাইতেছি। পুনরুক্তি বোধে এখানে তাহা দিলাম না।

সভ্য-তালিকার দুইটি বৈশিষ্ট্য স্বতঃই আমাদের চোখে পড়ে। সে যুগের প্রবীণ নেতা—যেমন রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন প্রভৃতির নাম ইহাতে নাই। এটি যুবজনদের সভা বলিয়াই তাঁহারা ইহার সঙ্গে যোগ দেন নাই। প্রবীণদের মধ্যে একমাত্র ডেভিড হেয়ার এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হেয়ার ভারতহিতৈষী; এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নিজেকে একান্ত লিপ্ত করায় যুবজনের সত্যিকার বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তবে দেশীয় প্রবীণেরা যে এই সভার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সভ্য-তালিকার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—ইহাতে 'মধুসূদন দত্ত' নামটি পাইতেছি। ইনি কি পরবর্তী কালের বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক সুবিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, না অন্য কেহ? এ প্রশ্নের জবাব বা এ সম্বন্ধে আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে সমসাময়িক প্রমাণাদি হইতে বুঝা যায়, ইনি কবি মধুসূদন দত্ত নহেন, হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের শিক্ষক মধুসূদন দত্ত।

৫

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রথম দুই বৎসরের বিবরণ আমরা মোটামুটি জানিতে পারিলাম। সভার দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তক

হইতে এপ্রিল ১৮৪০ হইতে মে ১৮৪১ পর্যন্ত এখানে পঠিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতার পরিচয় আমরা পাই। এবারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, সাতকড়ি দত্ত, প্রসন্নকুমার মিত্র প্রমুখ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা জানা যাইতেছে। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠের সঙ্গে এই বৎসরে বিজ্ঞানের শরীরতত্ত্ব, ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা প্রভৃতির আলোচনাও বিশেষ লক্ষণীয়। ছোটনাগপুরের ভৌগোলিক বিবরণ, সিংহভূমের বিবরণ, চট্টগ্রামে তুলার চাষ, চট্টগ্রামের বিশদ বিবরণ—সীতাকুণ্ড তীর্থ, হিন্দু রাজত্বে ভারতবর্ষের অবস্থা (এক), ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (৪), নব্যশিক্ষিতদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা—প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই সকল প্রবন্ধের রচয়িতা ছিলেন যথাক্রমে—প্রথম দুইটির তারকনাথ সেন, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, প্যারীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন ও কিশোরীচাঁদ মিত্র। ইঁহারা প্রত্যেকেই সভার সভ্য। এখানে এগুলি ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রবন্ধও পঠিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পদার্থ'বিষয়ক প্রবন্ধ এবং সাতকড়ি দত্তের 'চক্ষুর গড়ন', প্রসন্নকুমার মিত্রের 'কর্ণের গড়ন' সম্বন্ধীয় বক্তৃতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবারের কতকগুলি রচনা পরবর্তী খণ্ডের জন্য মজুত রাখা হয়।

আত্মোন্নতি ও জ্ঞানবৃদ্ধিমূলক আলোচনাসমূহ অবিলম্বে সাধারণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ১৮৪৩, ১৬ই জুন তারিখে 'বেঙ্গল হরকরা'য় সভার কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। 'হরকরা' বলেন যে, এই সভা সাত বৎসর পর্যন্ত চলিলেও সাধারণ্যে ইহার কথা এখনও তেমন প্রচারিত দেখি না। কারণ সভ্যগণ নিজেদের কার্য সম্বন্ধে বাহিরে প্রচার করিতে বড়ই অনিচ্ছুক, তাঁহারা নীরবে অথচ নিয়মিতভাবে কার্য করিয়া যাইতেছেন। প্রতি মাসে সভার অধিবেশন, প্রবন্ধ-পাঠ, বক্তৃতা-দান তৎসম্বন্ধে আলোচনা এবং সভার পুস্তকে এই সমুদয় রচনা প্রকাশ—এসব বিষয়েও 'হরকরা' উল্লেখ করিলেন। বক্তা বা প্রবন্ধ-পাঠক নিজ নিজ বিষয় ধার্য করেন এবং ইংরেজী-বাংলা যে কোন ভাষায়ই লিখিতে পারেন। ইহার পর 'হরকরা' লেখেন ঃ

"In this way, since the establishment of the society, a great variety of topics have been treated of at the meetings of the society, and the most choice essays and papers have been collected together and printed as the 'transactions' of the society. To little volumes of these transactions have already passed through the press. It may be added that the society at present has about two hundred members."

সভার তখন প্রায় দুইশত সভ্য। নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি দুই খণ্ডে ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় খণ্ডে (প্রকাশকাল ১৮৪৩) জুলাই ১৮৪১ হইতে এপ্রিল ১৮৪২ সন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পঠিত প্রবন্ধগুলির কয়েকখানি প্রকাশিত হয়। গোবিন্দচন্দ্র বসাকের ত্রিপুরা জেলা ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিবরণ সম্বলিত পাঁচটি প্রবন্ধ পর পর এখানে পঠিত হইল। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "Native Female Education" বা এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষা শীর্ষক একটি পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রবন্ধের উপরে আলোচনা-প্রবন্ধ পাঠ করেন প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৪২ সনের ১২ই জানুয়ারীর সভায়। প্রসন্নকুমার মিত্র "On the Physiology of digestion" বা পরিপাকক্রিয়ায় শারীরতত্ব সম্বন্ধীয় রচনা পাঠ করেন পরবর্তী ১৩ই এপ্রিল। ইহার পর সভা হইতে আর কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। সভায় ক্রমশঃ রাজনীতি এবং তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনাও চলিতে থাকে। এই কথাই এখন বলিতেছি।

৬

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধ্যক্ষগণ স্বদেশের সর্বপ্রকার উন্নতি যাহাতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। স্বদেশ সম্বন্ধে, স্বজাতীয় বিভিন্ন সমস্যা লইয়া যে আলোচনা হইত একথাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। সভার মুখপত্র হিসাবে না হইলেও রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ নেতৃগণ কর্তৃক 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (এপ্রিল, ১৮৪২) প্রকাশে ইহা সম্যক সূচিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারত-প্রত্যাবর্তনকালে বিখ্যাত বাগ্মী ও মানবহিতৈষী জর্জ টমসনকে নিজ ব্যয়ে এদেশে লইয়া আসেন। দ্বারকানাথ নব্যদলের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

ইঁহাদের দ্বারা যে স্বদেশের সত্যিকার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব এ বিশ্বাসও তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন। তিনি নব্যদলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে টমসনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ১৮৪৩ সনের ১১ই জানুয়ারী সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকার সভ্যগণ এক প্রকাশ্য সভায় টমসনকে অভিনন্দিত করেন। তাঁহারা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে এবং পরে চিৎপুর রোডস্থ ফৌজদারী বালাখানা-হলে টমসনের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দেন। টমসনের ওজস্বিনী বক্তৃতায় যুবক-মনে স্বদেশপ্রীতি নবরূপে দেখা দিল। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে রাষ্ট্রীয় শক্তির কার্যকারিতা নব্যদল নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তাঁহারা রাজনীতির চর্চায় অভিনিবিষ্ট হওয়াই যুক্তি-মনে করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে সাধারণের দৃষ্টি এ সভার দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইল। ১৮৪৩-এ ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সংস্কৃত কলেজ হলে যথারীতি স্থায়ী সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার একটি অধিবেশন হইল। পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় "The Present State of the East India Company's Judicature and Police, under the Bengal Presidency" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। পাঠ কিছুদূর অগ্রসর হইলে, সভায় নিমন্ত্রিত হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপটেন রিচার্ডসন প্রবন্ধ-পাঠে এই বলিয়া বাধা দেন যে, কলেজ-গৃহকে তিনি রাজদ্রোহের আস্তানায় পরিণত হইতে দিবেন না! তৎক্ষণাৎ এইরূপ মন্তব্যের সমুচিত জবাব দেওয়া হইল। রিচার্ডসন এই মন্তব্য প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু সভার কর্তৃপক্ষ অতঃপর সংস্কৃত কলেজ-হলের পরিবর্তে ফৌজদারী বালাখানাহলেই সভার অধিবেশন করা সাব্যস্ত করেন। এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রে খুব জটলা হইল। ইংরেজ-সম্পাদিত রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি নব্যদলকে কটূক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। নব্যদলের নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নামে তাঁহাদের 'চক্রবর্তী কাকশ্যন' আখ্যা দিতেও ছাড়িল না। পরবর্তী ৩রা ও ৪ঠা মার্চ 'বেঙ্গল হরকরা'য় সমুদয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে দেখা গেল ন্যায্য সমালোচনা ব্যতীত রাজদ্রোহের নামগন্ধও উহাতে নাই।

অথচ 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩) এরূপ মন্তব্য করিতে দ্বিধা করেন নাই যে, ওরূপ খাঁটি রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা বাটাভিয়া বা সামারঙে (যবদ্বীপ) করা হইলে, কমপক্ষে নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত ! নব্য দলের প্রতি শ্বেতকায়দের মনোভাব তখনই কিরূপ বিকৃত হইয়া উঠিতেছিল এই উক্তি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

ইহার পর নব্যদল 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র স্থলে রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয় ও শাসনসংক্রান্ত বিবিধ বিষয় আলোচনা এবং এ সকল বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক এদেশে ও বিদেশে আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি সভা স্থাপনের মনস্থ করিলেন। নবাগত জর্জ টমসন এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রধান সহায় হইলেন। প্রথমে টমসন ও নিজেদের মধ্যে কিছুকাল আলাপ-আলোচনা চলিল। তাহার পর বিলাতস্থ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির আদর্শে এখানে একটি সভা স্থাপিত হইল ১৮৪৩ সনের ২০শে এপ্রিল তারিখে। ইহার নাম দেওয়া হয় 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোস্যাইটি'। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধ্যক্ষগণ প্রায় সকলেই ছিলেন এই সভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা। তাঁহারা স্বতঃই এই নূতন সভারও অধ্যক্ষ হইলেন। পরবর্তী পাঁচ-ছয় বৎসর যাবৎ এই সভাই দেশের রাজনৈতিক কার্যে মনোযোগী হয়। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভারই অনুক্রম একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

শিক্ষার স্বরূপ

স্বামী বিবেকানন্দ

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি নির্ভর করে পুরুষের উপর; অর্থাৎ যেখানে পুরুষেরা উচ্চসংস্কৃতিসম্পন্ন, সেখানে মেয়েরাও ঐরূপ হইবে। যেখানে পুরুষদের সংস্কৃতি নাই, সেখানে মেয়েদেরও নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুপ্রথা-অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামীণ ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে সমস্ত ভূমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল। আপনাদের ভাষায় এগুলি ছিল সরকারের। জমির উপর কাহারও কোন ব্যক্তিগত অধিকার নাই। ভারতবর্ষে রাজস্ব জমি হইতে আসে, কারণ প্রত্যেকে সরকার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ভোগ করে। এই জমি একটি গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পত্তি, এবং পাঁচ দশ কুড়ি বা একশ-টি পরিবার একত্র ঐ জমি দখলে রাখিতে পারে। সমস্ত জমি তাহারই নিয়ন্ত্রণ করে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব তাহারা সরকারকে দেয় এবং একটি চিকিৎসক এবং শিক্ষককে ভরণপোষণ করে, ইত্যাদি।

আপনাদের ভিতর যাঁহারা হারবার্ট স্পেন্সার পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে আছে, তিনি তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতিকে 'মঠপদ্ধতি' বলিয়াছেন। ইহা ইওরোপে প্রয়োগ করা হইয়াছে, কোথাও কোথাও সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছিল। এই পদ্ধতি অনুসারে গ্রামে একজন শিক্ষক থাকিবেন, তাঁহার ভার ঐ গ্রামকে লইতে হইবে। আমাদের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অতি সাধারণ। কারণ আমাদের পদ্ধতিও অত্যন্ত সরল। প্রত্যেক বালক একটি ছোট মাদুরের আসন লইয়া আসে। তালপাতাতে লেখা আরম্ভ হয়, কারণ কাগজের দাম অনেক। প্রত্যেকটি বালক তাহার আসন বিছাইয়া বসে, দোয়াত ও পুস্তক সঙ্গে লইয়া আসে এবং লিখিতে আরম্ভ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য পাটীগণিত, কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণ, একটু ভাষা ও হিসাব—এই শিক্ষা দেওয়া হয়।

বাল্যকালে এক বৃদ্ধ আমাদের নীতিবিষয়ক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক মুখস্থ করাইয়াছিলেন, উহার একটি শ্লোক এখনও আমার মনে আছে : 'গ্রামের জন্য পরিবার, স্বদেশের জন্য গ্রাম, মানবতার জন্য স্বদেশ এবং জগতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিবে।' এইরূপ অনেক শ্লোক ঐ পুস্তকে আছে। আমরা ঐগুলি মুখস্থ করি, এবং শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া দেন, পরে ছাত্রও ব্যাখ্যা করে। বালক-বালিকারা একত্রই এইগুলি শিক্ষা করে। ক্রমে তাহাদের শিক্ষা পৃথক হইয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ ছাত্রদের জন্যই ছিল। ছাত্রীরা কদাচিৎ সেখানে যাইত। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল।

বর্তমানকালে ইওরোপীয় ধরনে উচ্চ শিক্ষার উপর অধিকতর ঝোঁক দেখা দিয়াছে। মেয়েরাও এই উচ্চ শিক্ষালাভ করুক—এই দিকেই জনমত প্রবল হইতেছে। অবশ্য ভারতবর্ষে এমন লোকও আছে, যাহারা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা চায় না; কিন্তু যাহারা চায়, তাহারাই জয়লাভ করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় আজও ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আমেরিকায় হার্ভার্ড ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মেয়েদের জন্য রুদ্ধ। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ বৎসরেরও অধিক হইল, নারীদের জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আমার মনে আছে, যে বৎসর আমি বি. এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হই, সেই বৎসর কয়েকটি ছাত্রীও ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য একই মান, একই পাঠ্যসূচী ছিল এবং পরীক্ষায় ছাত্রীরা বেশ ভালই করিয়াছিল। মেয়েদের শিক্ষা-ব্যাপারে আমাদের ধর্ম বাধা দেয় না। এইরূপে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইবে, এইভাবে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, প্রাচীন পুস্তকে আমরা আরও দেখি—ছেলে ও মেয়েরা উভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছে, কিন্তু পরবর্তী কালে সমস্ত জাতির শিক্ষাই অবহেলিত হইয়াছে। বৈদেশিক শাসনে কি আর আশা করা যায়? বিদেশী বিজেতারা আমাদের কল্যাণ করিবার জন্য তো আসে নাই। তাহারা ধনসম্পদ চায়। আমি বারো বৎসর কঠোর অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করিয়াছি; কিন্তু আমার দেশে আমি মাসে

পাঁচ ডলারও উপার্জন করিতে পারি না। ইহা কি আপনারা বিশ্বাস করিবেন? ইহাই প্রকৃত অবস্থা। বিদেশী-প্রবর্তিত শিক্ষায়তনগুলির উদ্দেশ্য—বহুসংখ্যক কেরানী, পোস্টমাস্টার, তারচালক (টেলিগ্রাফ অপারেটর) প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়া অল্প অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনে উপযোগী একদল কর্মদক্ষ ক্রীতদাস পাওয়া। ইহাই হইল এই শিক্ষার স্বরূপ।

ফলে, বালক-বালিকাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে। আমাদের দেশে করিবার অনেক কিছু আছে। যদি আপনারা আমাকে ক্ষমা করেন এবং অনুমতি দেন, তাহা হইলে আপনাদেরই একটি প্রবাদ বাক্য আমি বলি, 'হংসীর যাহা খাদ্য, হংসেরও খাদ্য তাই'।

কার্য্যমূলক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি

কৃষ্ণভাবিনী দাস

Heaven helps those who help themselves—যাহারা নিজের সাহায্য করে, ঈশ্বর তাঁদের সহায় হয়েন—এই প্রবাদ বাক্যটি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল। মানব-জীবনে আত্মসাহায্যের ইচ্ছাই ব্যক্তিগত চরিত্রের মূল স্বরূপ। ঐ মূল অনেক লোকের প্রকৃতিতে প্রোথিত হ'লেই জাতীয় বল ও শক্তির উৎপন্ন হয়। ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতীয় জীবনেও ভিতরের সাহায্য যত উপকারী ও ফলদায়ী বাহিরের সাহায্য তেমন নয়। কোন লোক বা জাতি নিজে কষ্ট করিয়া একটি দ্রব্য পাইলে বা কার্য্য সাধিলে তাহার চরিত্র যেরূপ দৃঢ় ও সতেজ হয়, পরের সাহায্য পাইলে বা সাধিলে সেরূপ হয় না, বরং আরও নিস্তেজ ও অসহায় হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের ইংরাজী শিক্ষার ও বিদ্যালয়-গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপরের প্রবাদ বাক্যটির অর্থ অধিক বোধগম্য হইবে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এদেশে বিদ্যাশিক্ষার কি দ্রুত উন্নতিই হইয়াছে! পূর্ব্বে যেখানে একটি গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল, এখন সে স্থলে অন্ততঃ দুই তিনটি ছোট বড় স্কুল উঠিয়াছে—তালপাতা ও খাঁকের কলম ছাড়িয়া ছেলেরা স্লেট পেন্সিল বা পেন কাগজ ধরিয়াছে; শিশুশিক্ষার পরিবর্ত্তে হয় ত ফাষ্ট বুক পড়িতেছে, মাদুর ফেলিয়া বেঞ্চিতে বসিতেছে—তা ছাড়া, ম্যাপ, গোলক, ফুটবল ক্রিকেট—প্রভৃতি বিলাতী বিদ্যালয়-গুলির সরঞ্জামের ঢেউ সহর ডিঙ্গাইয়া পল্লিগ্রামে পর্য্যন্ত ঢুকিয়াছে—কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতেছেন, সকলে এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার যেরূপ সুফল আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ কিছুই হইতেছে না। প্রকৃত শিক্ষার ফলে সে নিরেট ও দৃঢ় মানুষের পরিবর্ত্তে আমাদের চারদিকে কি এক ফাঁপা ও হাল্‌কা চরিত্রের উদয় হইতেছে। বালকেরা স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া কলেজে উঠিতেছে, প্রতি বৎসর কত ছাত্র বি, এ, এম, এ, উপাধি ধরিয়া বাহির হইতেছে

—অথচ যে চরিত্রগঠন ও জাতীয় উন্নতি শিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহার কিছুই ফলিতেছে না। ইহার কারণ, এই সব বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য আমরা অন্য জাতিদ্বারা বাহির হইতে পাইয়াছি। এই শিক্ষার ইচ্ছা ও আবশ্যকতা যদি অন্তর্জাতীয় হইত, বালকেরা যদি কার্যতঃ শিক্ষার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা দ্বারা সুফল ফলিত।

ইউরোপের সর্ব্বত্রও দেখা যায় যে, অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষালয়গুলিও মানুষকে কার্যতঃ সাহায্য দিতে পারে না; উহা কেবল ব্যক্তিগত বা জাতীয় চরিত্র-গঠনে পথদর্শকস্বরূপ। বহুদিন হইতে সকলেরই এই ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, উত্তম শিক্ষানীতি বা রাজনীতি দ্বারাই মানুষ পৃথিবীতে সভ্য ও কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারে। কিন্তু উত্তম-শিক্ষাপ্রণালী বা নিয়মের দ্বারা যদিও মানুষকে ভাল পথে রাখিবার চেষ্টা করা যায়, এবং উৎকৃষ্ট আইনের সাহায্যে মানুষের জীবন, স্বত্ব ও সম্পত্তি রক্ষা করা হয়, কিন্তু কোনরূপ কঠোর শাসনেই অলসকে পরিশ্রমী, অমিতব্যয়ীকে মিতব্যয়ী ও মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী করিতে পারে না। এইরূপ আমূল উন্নতি কেবল ব্যক্তিগত কার্যশক্তি ও স্বার্থত্যাগের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে।

মানব ইতিহাসের সকল কালেই দেখিতে পাই যে, সকল জাতির শাসনরীতি সেই জাতির লোক সমাজের চরিত্রের প্রতিকৃতি মাত্র। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ভালমন্দ জাতীয় চরিত্রের সমষ্টি দ্বারা সেই জাতির আইন কানুন স্থিরীকৃত হয়। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ভাল লোকেরা ভালরূপে আর মন্দেরা মন্দরূপে শাসিত হইয়া থাকে। ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা ইহারও স্পষ্ট প্রমাণ পাই যে, কোন জাতির বা রাজ্যের শক্তি তাহার শাসনপ্রণালী অপেক্ষা লোক সমাজের চরিত্রের উপরই অধিক নির্ভর করে। এমন কি, মানব জাতির সভ্যতা ও মানব সমাজের স্ত্রীপুরুষ ও ছেলে মেয়েদের আত্মোন্নতি দ্বারাই সাধিত হয়।

জাতীয় অবনতি যেমন ব্যক্তিগত অলসতা, স্বার্থপরতা ও পাপের ফল—জাতীয় উন্নতিও সেইরূপ ব্যক্তিগত পরিশ্রম, কার্য-ক্ষমতা ও সততার সমষ্টিমাত্র। যে সকল সামাজিক কুনীতি দেখিয়া আমরা মনস্তাপ পাই, তাহাও অধিকাংশ স্থলে মানুষেরই কলুষিত

ও অকর্ম্মণ্য জীবনের শাখা প্রশাখা। অনেক আইনের দ্বারা উহা কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইতেছেন বটে, কিন্তু যতদিন না মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র ও অবস্থা আমূল বিশুদ্ধ ও উন্নত হয় ততদিন উহা কোন না কোন প্রকারে বাড়িতে থাকিবে। গত ডিসেম্বর মাসে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন কালে—উহাতে রাজনীতির সঙ্গে সামাজিক বিষয়েরও আন্দোলন হইবে পড়িয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলাম। যে সকল স্বদেশহিতৈষী ভ্রাতারা ঐ মহৎকার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা যদি অল্প সময়ও দেশীয় লোকদিগকে কার্য্যমূলক জ্ঞান ও আত্মোন্নতির শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উদারতা অধিকতর উচ্চ, স্বদেশপ্রেম অধিকতর গভীর ও তাঁহাদের সাধু চেষ্টা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে।

মানুষ নিজেকে ভিতর হইতে যেরূপে শাসন করে—তাহারই উপর ব্যক্তিগত সুখ ও শান্তি যত নির্ভর করে, বাহিরের শাসনের উপর ততদূর করে না। মানুষের পক্ষে নৈতিক অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও পাপাভ্যাসের দাস হওয়া যেরূপ ঘৃণাকর ও দুঃখজনক, যথেচ্ছাচার রাজার অধীনে ক্রীতদাস হওয়াও সেরূপ নয়। যে ব্যক্তি হৃদয়ে দাসত্ব ধারণ করে, রাজা বা শাসন-রীতির পরিবর্তনে সে কখন স্বাধীন হইতে পারে না।

সকল সভ্যজাতিই বহু শতাব্দীর চিন্তাশীল ও কর্ম্মিষ্ঠ লোকের দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। জীবনের সকল অবস্থাতেই অধ্যবসায়-সম্পন্ন ব্যক্তিরা—সামান্য কৃষক হইতে অভিজ্ঞ দার্শনিক পর্য্যন্ত—সকল প্রকার শ্রমশীল ও কার্য্যকারী মানুষই জাতীয় উন্নতির ভিত্তি গাঁথিয়া থাকে। এক পুরুষের অবসানে আর এক পুরুষ—আর এক বংশ আসিয়া ঐ গুরু কাজ সম্পাদনে অগ্রসর হয়। এইরূপে নিরন্তর শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদিগের কার্য্যমূলক জ্ঞানের দ্বারা সকল জাতির বিদ্যা, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে নিয়ম ও প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

এই কার্য্যতঃ শিক্ষাদ্বারা আত্মোন্নতির ইচ্ছা ইংরাজ জাতির ব্যক্তিগত চরিত্র যেরূপ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়, সেরূপ অতি অল্প জাতির মধ্যেই দেখা যায়। উহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই সাধারণ ও সামান্য শ্রেণীর ভিতর হইতে চিন্তাশীল ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তির উৎপত্তি হইতেছে। প্রতিদিন গৃহে, দোকানে, রাস্তায় ও কারখানায় মানুষ

যে কার্য্যতঃ শিক্ষা পায়, তাহাই আত্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায়। সকল জাতির এইরূপ কার্য্যতঃ শিক্ষাকেই জর্ম্মণ পণ্ডিত শিলর মানব জাতির প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া গিয়াছেন। কার্য্য, সদাচার ও আত্মসংযমের দ্বারাই মানুষ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হইতে পারে—উহাই মানুষকে জীবনের সকল কর্ত্তব্য প্রকৃষ্টরূপে সাধনের জন্য প্রস্তুত করে। যাবতীয় মহৎ চরিত্রের আখ্যায়িকা পড়িয়াও আমরা এই জ্ঞান শিক্ষা পাই যে, মানব জীবন—অধ্যয়ন অপেক্ষা অনুশীলন দ্বারা, সাহিত্য অপেক্ষা আদর্শ দ্বারা, জীবনী অপেক্ষা চরিত্র দেখিয়া অধিক কার্য্যমূলক জ্ঞানলাভ করে। আর ঐরূপ অভিজ্ঞ লোক সমাজের সমষ্টিতেই মানব জাতি ক্রমশঃ উচ্চৈঃ উঠিতে থাকে।

জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণের যেরূপ প্রভাব, মনের উপর কার্য্যমূলক জ্ঞানের সেইরূপ প্রভুত্ব দেখা যায়। উহা মানব জীবনের সমস্ত অংশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখে। আমরা কে, কোথায় আছি, আমাদের শক্তি কতদূর, আমরা কি কাজ করিতে সমর্থ—এই সব গুরু বিষয়ে উহাই আমাদের মনকে সর্ব্বদা চিন্তাশীল রাখে। উহাই আমাদিগকে সুখময় কার্য্যের ন্যায় নিরানন্দ কর্ত্তব্যের দিকেও অগ্রসর করে। উহা আমাদিগকে গতানুশোচনা বা মনস্তাপের দ্বারা কার্য্যশক্তি বৃথা নষ্ট করিতে দেয় না। যদি আমরা একবার কোন কাজে বিফলকাম হই, তাহা হইলে উহাই আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ অধিক সতর্কতার সহিত আবার সেই কাজ সাধিতে শিক্ষা দেয়।

অনেকে মনে করেন, কল্পনাপ্রিয় লোকের মধ্যেই এই কার্য্য-মূলক জ্ঞানের অভাব দেখা যায়। অবশ্য, অতিরিক্ত কল্পনায় মুগ্ধ ভাবুকদের পক্ষে এ কথা সত্য হইতে পারে। কেননা, শরীরে ন্যায় মনেরও কখন কখন কেবল একটি অংশেরই বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। বামনদিগের বৃহদাকার হাত, পা ও মাথা তাহাদের দীর্ঘতা গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু কেহ যদি ভাবেন যে, কল্পনা শক্তির সহিত কার্য্যমূলক জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইলে সময়ে তিনি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। কেননা, আমরা সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাই, যাঁহারা মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই কল্পনাশক্তি প্রবল ছিল।

বেকন বলিয়াছেন এই মানব জীবনের নাটকের মধ্যে কেবল ঈশ্বর ও স্বর্গের দূতেরা দর্শক হইবেন ; চিন্তাশক্তি ও কার্য্যশক্তির সর্ব্বদাই মিল থাকিবে। শনি ও বৃহস্পতি—এই দুটি প্রকাণ্ড গ্রহের যোগের ন্যায় বিশ্রাম ও পরিশ্রমের, চিন্তা ও কার্য্যের দৃঢ় যোগ থাকিবে। এইরূপ মিলনই কার্য্যমূলক জ্ঞানের উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডের অনেক প্রসিদ্ধ লোকের জীবন আমরা এইরূপ কার্য্য ও কল্পনার যোগের স্পষ্ট প্রমাণ পাই। কার্য্যমূলক জ্ঞানের দ্বারাই অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকও উৎকৃষ্ট কাজ সাধন করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই সব কর্ম্মিষ্ঠ বিখ্যাত ইংরাজদের মধ্যে আমরা সূতার কলের আবিষ্কারক স্যর রিচার্ড অকরাইট, চিফ জষ্টিস লর্ড টেণ্ডরডেন্ ও চিত্রকর টর্ণরকে দেখিতে পাই। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, এই সব প্রসিদ্ধ ও পূজা ব্যক্তিরা জীবনারম্ভে নাপিতের দোকানে কাজ করিতেন !

এমন কি, সর্ব্বদেশে আদৃত শেক্সপিয়রও অতি সামান্য শ্রেণীতে জন্মিয়াছিলেন ; তাঁহার পিতা কসাইয়েব কাজ করিতেন। আর কেহ কেহ বলেন, তিনি নিজেও পশম আঁচড়ানর কি কেরাণীর কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার নাটক সকল পড়িলে, তাঁহাকে শুধু এক কাজের নয়—সকল কাজের ও সকল বিষয়ের কার্য্যপ্রধান জ্ঞানে দক্ষ বলিয়াই স্থির হয়। তিনি নিজ রচনায় সমুদ্র সম্বন্ধে এমন সব যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা পড়িয়া নাবিকেরা তাঁহাকে এক জন নাবিক বলিয়াই স্থির করে। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক লেখা পাঠে যাজক ও পুরোহিতেরা ভাবেন তিনি নিশ্চয় কোন যাজকের কেরাণী ছিলেন। আবার তাঁহার অশ্ববিদ্যায় নিপুণতা দেখিয়া অশ্ব ব্যবসায়ীরা বলেন, তিনি ঘোড়ারও কাজ করিতেন। বাস্তবিক, জীবন নাটকে তিনি যে একজন প্রকৃত নট ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি জীবনে নানা খেলা খেলিয়া ও নানা দিক দেখিয়া যে অসীম কার্য্যমূলক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তক সমূহে আমরা সেই জ্ঞানেরই পরিচয় পাই। যতদিন মানব জগৎ থাকিবে, তত দিন উহাও অবিনাশী থাকিয়া মানুষকে শিক্ষা দিবে।

আবার ইংরাজশ্রমজীবীদিগের মধ্যেও আমরা ইঞ্জিনিয়ার ব্রিণ্ডলে, নৌবিদ্ কুক, ও কবি বরণের আবির্ভাব দেখিতে পাই। বিখ্যাত বেন জনসনও রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে তাঁহার জীবনের প্রথমে কার্য্যমূলক জ্ঞান শিক্ষা পাইয়াছিলেন। মহৎ চরিত্রের ইতিহাস খুঁজিলে এইরূপ সহস্র সহস্র উদাহরণ পাই, সকল স্থলেই কঠিন পরিশ্রম মানুষের আত্মোন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছিল।

শ্রম ব্যতীত কোন কর্ম্মেই পারদর্শিতা লাভ করা যায় না। আত্মোন্নতি, কর্ম্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতি—সকল বিষয়েই শ্রমশীল হস্ত ও চিন্তাশীল মস্তক একত্র মিলিয়া জয়লাভ করে। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্মিলেও কার্য্যক্ষমতা ভিন্ন কেহ কখনই বিখ্যাত হইতে পারে না। কারণ, উইলের দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেও কার্য্যজ্ঞান ও শিক্ষা উহা দ্বারা আত্মগত করা যায় না। লোকে অর্থ দিয়া অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে বটে, কিন্তু কেহই টাকা দিয়া আত্মচর্চ্চা কিনিতে পারে না। সে জন্য, এই সব সামান্য শ্রমজীবীদের মধ্যে এত মহৎ চরিত্র দেখিয়া ইহাই আমাদের বিশ্বাস হয় যে, মানুষের আত্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতির জন্য কার্য্যমূলক জ্ঞান যত আবশ্যক, অর্থ বা পরের সাহায্য তত নহে। সুখময় ও সচ্ছন্দ জীবন মানুষকে কষ্ট ও বিপদের সঙ্গে যুঝিতে শিখায় না। সৌভাগ্যের ক্রোড়ে পলিত হইলে মানুষের উদ্যম ও কার্য্যক্ষমতা চালনার অভাবে নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রকৃতরূপে, যে দারিদ্র্য বা সংকটপূর্ণ জীবনকে মানুষ মহাশাপ বলিয়া ভয় পায়, তাহাই আত্মসাহায্য দ্বারা মানবজীবনে শুভ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইতে পারে। জীবনযুদ্ধের এইরূপ ব্যক্তিগত কার্য্যমূলক জ্ঞানই জাতীয় উন্নতির এক মাত্র উপায়।

মুসলমানদের শিক্ষা-সমস্যা

মোহম্মদ ওয়াজেদ আলী

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার দিকে মুসলমান সমাজের দৃষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, প্রয়োজনের তাড়না, সরকারী কূটনীতির চক্র, অদূরদর্শী মোল্লাদের চীৎকার প্রভৃতি নানারূপ অনুকূল-প্রতিকূল আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষা-বিষয়েও মুসলমানেরা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন। ইংরেজী শিক্ষা, মাদ্‌রাসার ওল্‌ড্‌ স্কীম, মাদ্‌রাসার নিউ স্কীম—এগুলির মধ্যে কোন্‌টী অবলম্বন করিলে সমাজের শিক্ষা-সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সকলেই যেন গড্‌ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন হইতে এ-সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য না করিলে সমাজেব সমূহ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এজন্য. এদিকে সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটি কথা বলিতেছি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, অথবা কি হওয়া উচিত, এবং প্রচলিত পদ্ধতিগুলির দ্বারা তাহা পূর্ণ হইতে পারে কিনা, তাহার আলোচনা এখানে করিব না। বর্ত্তমানে যে তিনটী পথ মুসলমান-দের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহার কোনটী অবলম্বন করিলে তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা হইতে পারে, তাহাই আমাদের বিচার্য্য।

মাদ্‌রাসার নিউ স্কীম্‌ যতদিন প্রচলিত হয় নাই, ততদিন এ-সম্বন্ধে আন্দোলন-আলোচনার তেমন কোনো কারণ ঘটে নাই। যাঁহাদের চাকুরী করিবার ইচ্ছা, তাঁহারা স্বভাবতঃই ইংরেজী শিক্ষা-লাভে অগ্রসর হইতেন ; পক্ষান্তরে যাঁহারা "দিনী ইল্‌ম্‌ হাসিল্‌" করিয়া 'বাহাস্‌'-বিতর্ক ও ফৎওয়া-জারি দ্বারা দিন গুজরান করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা স্বতঃই ওল্‌ড স্কীম্‌ মাদ্‌রাসার প্রদত্ত

শিক্ষার দিকে ধাবিত হইতেন। এ-দুইটি পথের মধ্যে কোন একটী অবলম্বন করিতে হইলে বড়-একটা বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হইত না। যাঁহার যেদিকে অভিরুচি তিনি সেই দিকেই চলিয়া যাইতেন। কিন্তু আজকাল নিউ স্কীম্ নাম দিয়া ইংরেজী ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার এক অদ্ভুত খিচুড়ীর আয়োজন করা হইয়াছে। ইহাতেই মুসলমানদের শিক্ষা-সমস্যা পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

মুসলমানেরা অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা কার্য্যতঃ বেশী ধার্ম্মিক হউন বা না হউন, অনেকের কাছে তাঁহাদের এইরূপ একটা সুনাম আছে। মোল্লাদিগকে মুরগী মাংসে পরিতৃপ্ত করা; দরিদ্রের প্রাপ্য অর্থ, তাঁহাদিগকে দান করিয়া তাঁহাদের একাধিক স্ত্রী ও পুত্রকন্যার বিলাস-ব্যসনের ব্যবস্থা করা; তাঁহাদের আদেশ-উপদেশে সংকীর্ণ 'মজহাবী' কলহে প্রমত্ত হইয়া সমাজের মুণ্ডপাত করা; পীর সাহেবদিগের আদেশগুলিকে অলঙ্ঘনীয় শাস্ত্র-বাণীর তুল্য মনে করিয়া ভক্তিগদ্‌গদ্‌চিত্তে তাঁহাদের পদচুম্বন ও প্রতি বৎসর তাঁহাদের অনুষ্ঠিত মেলায় যোগ দিয়া সমাজের অর্থ-লুণ্ঠনের পথ উন্মুক্ত করা; কেহ ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধি-ব্যবস্থার যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা চাহিলে তাঁহাকে ধর্ম্ম 'কাফের' মনে করা,—এ সকল কার্য্যকে যদি ধার্ম্মিকতার লক্ষণ বলিয়া মানিতে হয়, তবে বস্তুতঃই মুসলমানদের এরূপ সুনাম লাভের যোগ্যতা যথেষ্ট পরিমাণে আছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। এবংবিধ "পরম ধার্ম্মিকতার" সুযোগ লইয়া অপরিমাণদর্শী মোল্লার মরহুম স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিলে সহজেই তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ এতই ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সৈয়দ আহ্‌মদকে বাধ্য হইয়া ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যৎসামান্য ধর্ম্মশিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু এ-যুগে একদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে ধর্ম্মের নামে প্রচলিত প্রাচীন মতবাদের স্তূপ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, একই বিদ্যালয়ে এবং একই সময়ে দুইটাই অধীত ও অধ্যাপিত হওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক এখনও

এত শক্তিশালী হয় নাই যে, কেহ যুগপৎ সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও অন্যান্য বিজ্ঞান এবং কোর্‌আন, হাদিস, ফেকা, ওসুল প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া ঐ সকল বিষয়ে পণ্ডিত হইতে পারেন। এইজন্য মরহুম সৈয়দ আহ্‌মদ প্রতিষ্ঠিত কলেজে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাকেই প্রধান স্থান দিয়া মোল্লা-বিরোধের তীব্রতা হ্রাস করিবার জন্য ধর্ম্মশিক্ষার নামমাত্র স্থান করা হইয়াছিল। এবং এই জন্যই যে-সকল দেশে মুসলমান শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত, সেখানেও উক্ত দুই প্রকার শিক্ষার সংমিশ্রণ সঙ্গত যা সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় নাই এবং কখনো হইবে এমন আশাও করা যায় না।

কিন্তু আমাদের দেশের মোল্লা-বুদ্ধিকে ধন্যবাদ; অপর কোন দেশে যাহা সঙ্গত বা সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, এদেশে তাহাকেই কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। বলা বাহুল্য, মাদ্‌রাসার নিউ স্কীম এইরূপ চেষ্টার ফলেই প্রসূত হইয়াছে। যে-ভদ্রলোকের মস্তিক হইতে এই নিউ স্কীমটী বাহির হইয়াছে, তিনি নিজে একজন কাঠমোল্লা হউন বা না হউন, কাঠমোল্লার দৃষ্টি-সংকীর্ণতা তিনি বর্জ্জন করিতে পারেন নাই এবং এই কারণেই নিউ স্কীম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন প্রণালী তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই।

ওল্‌ড্‌ স্কীম মাদ্‌রাসাসমূহে শুধু ধর্ম্মশিক্ষাই প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং তাহাও খুব অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেশমাত্রও ছাত্রদের গোচরীভূত হইবার উপায় নাই; এ-ছাড়া বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গলাকে শিক্ষার বাহন করা দূরে থাকুক স্বতন্ত্রভাবে ঐ-ভাষাটি শিক্ষাদানের ব্যবস্থাটুকু পর্য্যন্ত সেখানে নাই। এরূপ শিক্ষার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। ওলড্‌ স্কীম পাস করিয়া মৌলবী হইয়া যাঁহারা বাহির হন তাঁহাদের জ্ঞান দেখিলে একেবারে অবাক্‌ হইতে হয়। তাঁহারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; মাতৃভাষাতেও অজ্ঞ; কোর্‌আন-হাদিসও তাঁহারা ভালরূপ জানেন না, (কারণ ওল্‌ড্‌ স্কীমে 'ফেকা' পড়াইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোর্‌আন হাদিসের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শিত হইয়াছে)। এরূপ লোকদের দ্বারা সমাজের কী মঙ্গল সাধিত হইতে পারে?

পক্ষান্তরে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত। তাহারা অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের সহিত সর্ব্বত্র প্রতি-যোগিতা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ; সরকারী চাকুরী করিয়া অথবা ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জ্জনে ও সমাজের শক্তি-সম্মান বর্দ্ধনে সক্ষম। কিন্তু কোরআন-হাদিস সম্বন্ধে তাঁহাদের তেমন কোন জ্ঞান নাই এবং আরবী-সাহিত্যের চর্চ্চা না করায় কোরআন হাদিস হইতে জ্ঞান-আহরণের ইচ্ছা তাঁহাদের হইলেও তাহা পূরণ করিবার উপায় নাই। তাঁহারা কাঠমোল্লাদিগকে সাধারণতঃ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। তাহার কারণ—একদিকে তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব ও অন্যদিকে মোল্লাদের আধুনিক জ্ঞানের ও প্রকৃত ধর্ম্ম-জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব।

যিনি নিউ স্কীমের উদ্ভাবক, তিনি ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের ও পুরোপুরি মোল্লাদের ভিতরকার এই ব্যবধানটুকু লোপ করিতে চাহিয়াছেন এবং যাহারা নিউ স্কীম জিনিষটার স্বরূপ উপলব্ধি না করিয়াই পরম উপাদেয় পদার্থ জ্ঞানে উহার সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদেরও বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বস্তুতঃই নিউ স্কীমের দ্বারা আমাদের সমাজের শিক্ষা-বৈষম্য দূরীভূত হইবে।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের নামে পুঞ্জীকৃত প্রাচীন মতবাদের স্তূপসমস্তই এক সঙ্গে, এক সময়ে অধীত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু নিউ স্কীমে এই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিবার চেষ্টা হওয়ায় উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে; শুধু ব্যর্থ হয় নাই, সমাজের পক্ষে ইহা একটা ঘোর অনিষ্টকর প্রণালীতে পরিণত হইয়াছে। কিরূপে, তাহা আমরা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

মাদ্রাসার নিউ স্কীম অনুসারে কোমলমতি বালকগণকে চারটী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়ঃ—সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাঙ্গলা ও ইংরেজী এবং ধর্ম্মশিক্ষার জন্য উর্দ্দু ও আরবী।

ছাত্রদের সৌভাগ্যক্রমে পারসী ভাষাটাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে ; নতুবা তাহাদিগকে চারটীর স্থলে পাঁচটী ভাষা শিক্ষা করিতে হইত ! যাহা হউক সুকুমারমতি বালকগণকে চার-চারটী ভাষা একই সময়ে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলে যে তাহাদের মন ও মস্তিষ্কের উপর অতি ভীষণ অত্যাচার করা হয়, এই সহজ কথাটী বুঝিতে অসাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার দরকার হয় না। শৈশবে এই অত্যাচারের ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের জ্ঞান, চিন্তা ও কর্ম্ম মহৎ ও সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে না।

হিন্দুরা মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক অর্থশালী, সুতরাং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিরা সাধারণতঃ যেরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য খাইতে পায়, মুসলমান বালকেরা তাহা পায় না। ইহা ভিন্ন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বালকেরা সুশিক্ষিত পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নীর সংসর্গে থাকার ফলে তাহাদের বুদ্ধি ও চিন্তা যেরূপ মার্জ্জিত হইতে পারে, মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রসার না ঘটায় মুসলমান ছেলেদের সাধারণতঃ সেরূপ হয় না। এজন্য অন্যান্য কারণে হিন্দু ছেলেদের জ্ঞানবৃত্তি যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে সাধারণ মুসলমান বালকদের তাহা পারে না। অথচ হিন্দু বালকেরা প্রথম শিক্ষার্থীরূপে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া করিয়া শুধু বাঙ্গলা পড়িতে আরম্ভ করে এবং ২।৩ বৎসর শুধু বাঙ্গলা পড়িবার পর ইংরাজী অক্ষরের সহিত পরিচিত হয়। ইহাতেই কিন্তু তাহারা গলদ্ঘর্ম্ম হয়। কারণ, একে বাঙ্গলায় সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা করিতে হয় তাহার উপর আবার বৈদেশিক ভাষা ইংরেজীর ব্যাকরণ ও রচনাপদ্ধতির গুরুভার ক্রমশঃ তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তাহাদের মন ও মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমান বালকদের উপর ইহার দ্বিগুণ অত্যাচার করা হয়। তাহারা নিউ স্কীম্ মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হইয়া প্রথম হইতেই বাঙ্গলার সঙ্গে সঙ্গে আরবী পড়িতে আরম্ভ করে। ইহার পরেই হিন্দু ছাত্রেরা যে-স্থলে কেবল ইংরেজী শিক্ষা করে, মুসলমান ছাত্রগণকে সে স্থলে উর্দ্দু ও ইংরেজী—এই দুইটি ভাষা শিখিতে হয়। জুনিয়র মাদ্রাসার শেষ শ্রেণী পর্য্যন্ত মাতৃভাষা ও তিনটি বৈদেশিক ভাষা—মোট চারটি ভাষার ভয়াবহ

পেষণ চলিবার পর অল্পবয়স্ক মুসলমান ছাত্রদের অপেক্ষাকৃত অপুষ্ট ও অমার্জ্জিত মন ও মস্তিষ্কের দশা কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়া স্বাভাবিক, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সকল ছাত্র জুনিয়র ষ্ট্যাণ্ডার্ড অতিক্রম করিবার পর ম্যাট্রিকুলেশন স্কুল অথবা সিনিয়র মাদ্‌রাসা, যেখানেই প্রবেশ করুক না কেন, কোনখানেই তাহাদের জ্ঞানবৃত্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। কারণ ভাষা-ও-পাঠ বাহুল্যে তাহা অংকুরেই অনেকাংশে বিনষ্ট হইয়া যায়।

মোট কথা, একটু চিন্তা করিলেই একথা বুঝিতে পারা যাইবে যে নিউ স্কীম মাদ্‌রাসার ছাত্রদের দ্বারা মুসলমান সমাজে জ্ঞান, চিন্তা ও কর্ম্মের প্রসার ঘটিতে পারে না। জুনিয়র ষ্ট্যাণ্ডার্ড অতিক্রম করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ প্রভৃতির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলে তাহারা সাধারণতঃ হিন্দু ছাত্রদের সমকক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যে জিনিষটীর বলে তাহারা হিন্দু ছাত্রদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে, বাল্যাবস্থায় চার-চারটি ভাষার পেষণে তাহা অনেককাংশে বিকল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলে চাকুরী ক্ষেত্রেও তাহাদিগকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে নিকট পদে পদে পরাজিত হইতে হইতেছে ও হইবে। আর শুধু চাকুরীর কথাই বা বলি কেন? ডাক্তারী, ওকালতি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের ন্যায় প্রতিভার পরিচয় দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

অন্যদিকে যাহারা মাদ্‌রাসার শিক্ষাই পাইতে চায়, তাহারা জুনিয়র পাস করিয়া হুগ্‌লী, ঢাকা অথবা সিরাজগঞ্জে সিনিয়র মাদ্‌রাসায় পড়িতে যায়। এইসকল স্থানে পূর্ণ চারটী বৎসর অধ্যায়নের পর সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা বাহির হন, তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও পারদর্শিতা জন্মে না কিম্বা ইংরেজী বাঙ্গালাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। ফলে তাঁহারা "না ঘর্‌-কা না ঘাট্‌-কা" অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হন। হাই স্কুলের মৌলবীগিরী ছাড়া অন্য কোন চাকুরীর উপযুক্ত বিদ্যা তাঁহাদের হয় না। অধুনা ঢাকা ও সিরাজগঞ্জে 'ইসলামিক' (!) ম্যাট্রিকুলেশন, 'ইসলামিক' আই-এ প্রভৃতি খাস 'ইসলামী' পরীক্ষার ব্যবস্থা

হইয়াছে। এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কলেজগুলিতে ২।১টি আরবী অধ্যাপকের পদ মিলিলেও মিলিতে পারে; কিন্তু অন্যান্য চাকুরীর সাধারণ প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে এই সকল 'ইসলামী' পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্রদের অবস্থাও শোচনীয়।

ফল কথা, নিউ স্কীমের আবিষ্কর্ত্তা ও সমর্থকেরা উহার সম্বন্ধে যত উচ্চ ধারণাই পোষণ করুন না কেন, উহা দ্বারা মুসলমান সমাজের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না—একথা, এখনই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে এবং যত দিন যাইবে ততই আরও অধিক স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। জ্ঞান চিন্তা ও কর্ম্মে মহৎ ও সুন্দর হইতে না পারিলে কোন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। পক্ষান্তরে সরকারী বা সওদাগরী চাকুরীর চিন্তা একেবারে ত্যাগ করিলে মুসলমানদের চলিবে না। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে কৃষির যেরূপ দুরবস্থা; তাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরেই চাকুরীর কথা শিক্ষিত লোকেদের মনে উদিত হয়। তাছাড়া সরকারী চাকুরীতে রাজশক্তির মারফতে শিক্ষিত লোকদের—এবং আবার তাঁহাদের মারফতে সমাজের, যে শক্তি ও সম্মান লাভ হয়, কৃষিতে—অন্ততঃ আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতায়—তাহা কোন রকমেই পাওয়া যাইতে পারে না বলিয়া জনসাধারণের ধারণা। আবার শক্তি-সম্মান অর্জ্জন করিতে না পারিলে কোন সমাজ জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করা দূরে থাকুক, সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিতেও পারে না। এ অবস্থায় চিন্তাশীল দূরদর্শী ব্যক্তিরা নিউ স্কীম মাদ্‌রাসার সার্থকতা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভাল হয়। আমরা যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে ইহাই মনে হয় যে, এরূপ মাদ্‌রাসার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই মুসলমান সমাজের প্রকৃত কল্যাণের পথ সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া পড়িবে। কারণ মাদ্‌রাসাগুলি সমাজের যোগ্যতা শক্তি ও সম্মান বৃদ্ধির সহায়তা না করিয়া এবং ঐ সকলের পথে বিষম বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে।

অবশ্য মাদ্‌রাসা-ভক্তেরা আমাদের এ কথার উত্তরে বলিতে পারেন—আমরা ত কাহাকেও মাদ্‌রাসায় পড়িতে বাধ্য করিতে পারি না; যাঁহাদের ইচ্ছা, মাদ্‌রাসার পথ ছাড়িয়া সাধারণ

ইংরেজী শিক্ষার দিকে চলিয়া যাইতে পারেন, কেহ তাঁহাদিগকে বাধা দিতে যাইবে না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদেরও কিছু বলিবার আছে। মোল্লারা সাধারণতঃ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরূপ এই শিক্ষার দিকে অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ সমাজকে বিমুখ করিয়া তুলিবার কোন সুযোগই তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই এবং এখনও করিতেছেন না, কিন্তু যতদিন নিউ স্কীম প্রচলিত হয় নাই, ততদিন তাহারা এ আন্দোলনটি প্রবলভাবে চালাইবার বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। বস্তুতঃ ওল্‌ড্ স্কীমে মাতৃভাষা শিক্ষার আদৌ সুযোগ না থাকায় এবং ইংরেজী বাধ্যতামূলক না হওয়ায় মুসলমান সমাজের দৃষ্টি সমগ্রভাবে উহার দিকে আকৃষ্ট করা অসম্ভব ছিল। কেন না, লোকসাধারণ "দিনী ইল্‌ম্ হাসিল" করিবার জন্য যতই উৎসুক হউক না কেন, বিদ্যার্থীরা সকলেই মোল্লা সাজিয়া সমাজের গলগ্রহে পরিণত হউক—এ-অবস্থা তাহারা কখনই বাঞ্ছনীয় মনে করিত না এবং এখনও করে না। কিন্তু নিউ স্কীম বস্তুতঃ যতই অসার জিনিষ হউক না কেন ইহার সহিত ইংরেজী ও বাঙ্গলার সংস্রব থাকাতে মোল্লাদের চমৎকার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এখন তাঁহারা সর্ব্বত্র সমুচ্চ কণ্ঠে ইংরেজী বাঙ্গলার সঙ্গে সঙ্গে "দিনী ইল্‌ম্ হাসিল্" করিবার জন্য মুসলমান সাধারণকে অনবরত উত্তেজিত করিতেছেন এবং তাহার ফলে মুসলমানেরাও সাধারণ ইংরেজী শিক্ষার পথ ছাড়িয়া দিয়া দলে দলে নিউ স্কীমের দিকে চলিয়া পড়িতেছেন। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে-সকল স্থানে মুসলমানদের দ্বারা মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হওয়া সম্ভব ও সঙ্গত ছিল, সেখানে বিনা বিচারে নিউ স্কীমের জুনিয়র মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং যে-সকল স্থানে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টার ফলে মধ্য ইংরেজী স্কুল চলিতেছিল, সেখানে মুসলমানদের মনোভাব মাদ্‌রাসার অনুকূল হইয়া পড়ায় স্কুলগুলির অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে।

এই অবস্থা অধিক দিন চলিতে থাকিলে মোল্লার সংখ্যা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভব হইলেও তদ্দ্বারা সমাজের কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এইজন্য শিক্ষিত, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের

আশু মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এ-সম্বন্ধে এখন হইতেই ঘোর আন্দোলন সুরু না হইলে গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের নীতি পরিবর্ত্তন করিবেন না। চিন্তাশীল মুসলমান মাত্রেরই এই সন্দেহ সহজেই হইতে পারে যে, গবর্ণমেণ্ট একটা গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই নিউ স্কীমের প্রচলন ও পরিপোষণ করিতেছেন। তাই দেখা যায়, মধ্য-ইংরেজী স্কুলগুলি বহু সাধ্য-সাধনা না করিলে ইম্পিরিয়াল এডুকেশন ফণ্ড হইতে সাহায্য সংগ্রহ করিতে পারে না, কিন্তু মাদ্‌রাসাগুলি জেলা বোর্ড হইতে অতি উচ্চহারে সাহায্য পাইলেও সহজেই আবার ঐ ফন্ডের পৃষ্ঠ-পোষকতা পাইয়া থাকে। মুসলমানেরা সাধারণ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টি প্রশস্ত হইতেছে এবং তাঁহারা ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব প্রতিপত্তি হ্রাস করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন। আর একপুরুষ কাল মুসলমানেরা এইভাবে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে থাকিলে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহার ফল অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইবে—ইহা গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এই কারণে তাঁহারা মুসলমানদের শিক্ষা-সম্পর্কিত মতিগতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। সাধারণ স্কুল-কলেজে হিন্দু ছাত্রদের সহিত একত্র একই শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে এবং আবাল্য একত্র অধ্যয়নের ফলে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত সখ্যভাব জন্মে, সেই সূত্র অবলম্বনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ প্রীতি-সহানুভূতির ভাব বদ্ধমূল হইলে উভয়ের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ও কার্য্য স্বভাবতঃ একই পথ ধরিয়া চলিতে থাকিবে। তাহা হইলে এদেশে বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য নিরাপদ থাকিবে না। এজন্য ধর্ম্মশিক্ষার ছুতা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুর সংশ্রব হইতে মুসলমানদিগকে যতটা সম্ভব দূরে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এবং বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে চিন্তাশীল লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। অশিক্ষিত লোকদের ত কথাই নাই; শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও অতি অল্প লোকই সমাজের

ও দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন। মুসলমান সমাজে এইরূপ সর্ব্বব্যাপী চিন্তাহীনতার সহিত একটা মেকি ধর্ম্ম-ভাব মিলিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, মরহুম সৈয়দ আহ্মদের ন্যায় একজন শক্তিশালী ব্যক্তির আবির্ভাব না হইলে আমাদের কল্যাণ নাই। মোল্লারা নিউ স্কীমের সম্বন্ধে জনসাধারণকে একেবারে উম্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের ইহাতে সবিশেষ আহ্লাদের কারণ ঘটিয়াছে। হিন্দু-সমাজকে এমন ভাবে প্রতারিত করা এখন আর সম্ভব নয়। কারণ, হিন্দু সমাজ ধর্ম্মশিক্ষার নামে নাচিয়া উঠেন না; এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধারণ ইংরেজী শিক্ষার কোনরূপ খিচুড়ীর আয়োজন হইলে তাঁহারা প্রকৃত রহস্য সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন। এজন্য হিন্দুদের সম্বন্ধে নিরাশ ইহয়া গবর্ণমেণ্ট 'বেওকুফ' মুসলমানদের স্কন্ধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এ অবস্থার প্রতীকার করিতে হইলে একটি জবরদস্ত ওঝার প্রয়োজন।

আমরা এ-সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আপাততঃ যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি। বলা আবশ্যক, ইহা আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত নহে। আপাততঃ আমাদের ইহাই মনে হইতেছে যে, আমাদের সমাজের শিক্ষা-সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে ওল্ড্ স্কীম ও নিউ স্কীম উভয় প্রকারের মাদ্রাসাগুলি তুলিয়া দিয়া সাধারণ ইংরেজী শিক্ষা রাখিয়া দিতে হইবে। ইংরেজীর সহিত দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আরবী অবশ্যপাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। মধ্য ইংরেজী স্কুলের শেষ দুই শ্রেণীতে বা শুধু শেষ শ্রেণীতে আরবী সুরু করা যাইতে পারে (যেমন অনেক মধ্য ইংরেজী স্কুলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যকরণের উপক্রমণিকা পড়ান হয়)। তাহা হইলে ম্যাট্রিকুলেশনের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রদের প্রাথমিক অসুবিধা আর থাকিবে না, অন্ততঃপক্ষে অনেক কমিয়া যাইবে। ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ, বি-এ প্রভৃতির আরবী পাঠ্য নির্দ্দেশ করিবার সময় কোর্আন ও বিশ্বস্ত হাদিসের দিকেই প্রধান ও প্রথম দৃষ্টি দিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত ছাত্রদের পক্ষে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা মোটামুটি

জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইবে। যাঁহারা ম্যাট্রিক, আই-এ, কিংবা বি-এ পাশ করিবার পর আরবীতে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চান, তাঁহাদের জন্য কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি কেন্দ্রে একটি করিয়া বিশিষ্ট আরবী কলেজ স্থাপিত হইলেই চলিবে। যাঁহারা ম্যাট্রিক, আই-এ অথবা বি-এ পড়িয়া আরবী কলেজে প্রবেশ করিবেন তাঁহারা যথাক্রমে চার, তিন ও দুই বৎসর অধ্যয়ন করিলে আরবী গ্রাজুয়েটের সনদ পাইতে পারিবেন। এইভাবে আরবী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে মুসলমান সমাজে কাঠমোল্লাদের সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে এবং উপযুক্ত মৌলবীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। বলা বাহুল্য, এতদর্থে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা আরবীর একটা সম্পূর্ণ নূতন 'নেসার' (পাঠ্যতালিকা) প্রস্তুত করাইয়া তদনুসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে আরবী কলেজে উর্দ্দু ভাষায় একটা মোটামুটি জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু উর্দ্দু না হইলে আমাদের চলিবেই না, এ-ধারণা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। আরবী সাহিত্য ও ইতিহাস (হাদিসকেও ইতিহাসের অঙ্গ বলা যাইতে পারে) এখানে প্রধান পাঠ্য বিষয় হইবে। প্রাচীন 'মন্তেক' (ন্যায়-শাস্ত্র) ও ফলসফা (philosophy—দর্শন) বর্ত্তমান যুগে স্বতন্ত্রভাবে—বিশেষতঃ আরবীতে—শিক্ষা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা আরবী কলেজে চার কিংবা তিন বৎসর পড়িবেন, অপরিহার্য্য বিবেচিত হইলে তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ আধুনিক ন্যায়-দর্শন মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বলিতে ভুলিয়াছি, আরবী কলেজে শিক্ষার বাহন বাঙ্গালাই করিতে হইবে।

আমাদের মনে হয়, এই প্রস্তাবটির মূল নীতিগুলি ধরিয়া এ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিলে মুসলমান সমাজের শিক্ষা-সমস্যার একটা সুমীমাংসা হওয়া সম্ভব।

যাহারা মধ্য ইংরেজী, উচ্চপ্রাইমারী বা নিম্নপ্রাইমারী ষ্ট্যাণ্ডার্ড পর্য্যন্ত পড়িয়া পড়াশুনা ত্যাগ করিবে, তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা কি হইবে?—এখানে কেহ কেহ এ-প্রশ্ন তুলিতে পারেন। উত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে, ওল্ড্ স্কীম বা নিউ স্কীম মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করিলেও অতটুকু বিদ্যায় কিছুই ধর্ম্মশিক্ষা

হইতে পারে না। আরবীর একখানা চটি প্রাথমিক ব্যাকরণ, উর্দুর পহলী-দুসরী কেতাব অথবা কোরআনের আম্‌পারার কিয়দংশ পড়িতে শিখিলেই ধর্ম্মশিক্ষা লাভ হইল, এমন কথা কোন কাণ্ডজ্ঞান বিশিষ্ট লোক বলিবেন না, কিংবা অন্যে বলিলে স্বীকার করিবেন না। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে, অতি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া যাহারা পড়াশুনা বন্ধ করিবে, মাদ্‌রাসায় পড়িলেও তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষা কিছুমাত্র হইবে না। এজন্য বরং উর্দু দিলীয়াত্‌ কি পহলী, দুস্‌রী প্রভৃতি কেতাবের অনুকরণে সরল বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচিত হইলে বালকেরা তাহা সহজেই পড়িয়া লইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, এরূপ পুস্তক বুঝিবার মত মাতৃভাষায় জ্ঞান অর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে বালকবালিকাদের ধর্ম্মশিক্ষার কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। কেন না, সমাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য শৈশবে, এমন কি বাল্যেও অপরিহার্য্য নহে।

শেষ কথা বর্ত্তমানে নিউ স্কীম মাদ্‌রাসাগুলির দ্বারা ভিন্ন কোন প্রকার ইষ্ট সাধিত হইতে পারে না। ইহার উচ্ছেদসাধন করিয়া ইংরেজীর সহিত কি ভাবে আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে উভয় দিক রক্ষা হয়, উপরে তাহার আভাস দিয়াছি। এদিকে শিক্ষিত, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের আশু মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারা এবিষয়ে আলোচনা করিয়া একটা সুরাহা বাহির করিবার চেষ্টা করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

মূকবধির শিক্ষা

চুণীলাল ভট্টাচার্য্য

মূক-বধির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সাধারণকে বুঝাইতে হইলে তৎপূর্ব্বে তাহাদের সম্বন্ধে যে-সকল ভুল ও অসঙ্গত ধারণা সাধারণ লোকে পোষণ করিয়া থাকে, সেগুলির নিরাকরণ দরকার, নচেৎ কাজে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না। যুক্তিহীন ধারণা কার্য্যক্ষেত্রে প্রধান বাধা। বহুদিন পূর্ব্বে নিজদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাইবার নিমিত্ত সিডনি স্মিথ তাঁহার গবেষণাপূর্ণ রচনাতে সাধারণের কতকগুলি যুক্তিবিহীন ধারণার উল্লেখ করিয়া তাহা যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ শিক্ষার আলো না পায় ততদিন তাহার ভিতরে একটা যুক্তিহীন মত পোষণের স্পৃহা দেখা যায়। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই দোষ ক্রমশঃ অপসারিত হয়। সুতরাং আমার বিশ্বাস যে, শিক্ষার প্রভাবে আমাদের কাজও অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতায় যখন প্রথম মূক-বধির শিক্ষার প্রচলন হয়, তখন কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোকও এই শিক্ষার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। কেবল তাহাই নয়, —যাঁহারা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া এই অভাবগ্রস্ত মানবশাখার উন্নতির জন্য একটু স্থানসংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার অব্যবহার্য্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ কোনও স্থানের পাগলা গারদে ইহাদিগকে রাখিলেও যে চলে, এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় যে, তাঁহাদেরই বা দোষ কি? শিশুকে যেমন জ্যামিতির অঙ্ক বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা, ইহাদিগকে মূক-বধির শিক্ষার কথা জানান প্রায় তদ্রূপ বৃথা। যাঁহারা নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে পারেন না, যাঁহাদের হৃদয় শিক্ষার সাহায্যে মার্জ্জিত ও উদার হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে মূক-বধির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করা যে

একটু কঠিন তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

কিন্তু এখন আর সে সময় নাই। দেশ ভাবরাজ্যে অনেকটা প্রবেশ-লাভ করিতে পারিয়াছে, সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি যে, সর্ব্বসাধারণ আমাদের কথাগুলি একটু মনোযোগপূর্ব্বক শুনিবেন এবং তৎপরে কর্ত্তব্য কি তাহা একটু ভাবিয়া দেখিবেন। দেশের কাজ ভাগাভাগি করিয়া না লইলে কাজের সুবিধা হয় না। দেশের কাজ করিতে সকলেরই অধিকার আছে। যাঁহারা এদিকে আসেন নাই বা অন্যান্য কার্য্যে ব্রতী আছেন, তাঁহাদের যদি কেবল সহানুভূতি পাওয়া যায় তাহা হইলেই এই মহৎ কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারে।

এখন মোটামুটিভাবে মূক-বধির সম্বন্ধে সাধারণের যে কতক-গুলি ধারণা আছে, তাহারাই উল্লেখ করিব।

১। অনেকেই মনে করেন বা জানিয়া আছেন যে, বোবা ও কালা একই ব্যক্তি নয়। অর্থাৎ কেহ বা বোবা কেহ বা কালা। এক ব্যক্তিই যে কালা হওয়ার ফলে বোবা হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই জানেন না।

২। বোবা দেখিলেই কেহ কেহ মনে করবেন যে, এ একটা বোকা, ইহার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই। তাহাকে পাগল বলিয়া ধিক্কার দিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না এবং তাহাকে সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করেন।

৩। অনেকেরই বিশ্বাস, বোবার আল্‌জিভ নাই—তাই সে কথা বলিতে পারে না।

৪। অনেকের ধারণা বোবা কাণে শুনিতে পায়।

৫। কেহ কেহ মনে করেন, বোবা গান করিতে পারে।

৬। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ধারণা যে, অন্ধদের তুলনায় মূক-বধিরগণের অবস্থা ভাল।

এতদ্ব্যতীত আরও ছোটখাট অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ও ধারণা দৈনন্দিন কার্য্যের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আমাদের নিকট পেঁাছায়। স্ত্রী-পুরুষ বহু দর্শক দেখিতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল রকমের লোকই থাকেন। ইহাদের প্রশ্নাদি শুনিয়া আমাদের এই কথাটাই

বারবার মনে জাগিয়া উঠে যে, আর কোনও স্বাভাবিক অভাবগ্রস্ত মানবশাখা-সম্বন্ধে বোধ করি এত ভুল ধারণা মানুষের নাই।

যে খোঁড়া সে খোঁড়াই। তাহার খোঁড়া হওয়া সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। হাঁটার ধারণাটাই বিশিষ্ট দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করাইয়া দেয়। যে কাণা তাহার সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। যে অন্ধ তাহার অবস্থার সত্যতা তীব্রভাবে বর্ত্তমান। ইহাদের প্রত্যেকের অবস্থার মধ্যে লুক্কায়িত এমন কিছু নাই যাহা অন্যে দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু মূক-বধির ভিন্ন জীব। বাহির হইতে তাহাকে দেখিতে তাহার কোনও অভাবের কথাই মনে আসিবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সহিত কথা বলার কোন প্রয়োজন না আসিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সর্ব্বসাধারণের মত। রাস্তা দিয়া দশজন লোক যায়, সেও যায়। ভয় পাইলে তাহারা দৌড়ায়, সেও দৌড়ায়, তাহারা জলে সাঁতার দেয়, সেও সাঁতার দেয়। মাঠে যখন খেলা হয় তখন অন্যান্য দর্শকগণের মধ্যে সেও একজন। বায়স্কোপও সে অন্যান্য দশজনেই মতই উপভোগ করে। যেখানে ম্যাজিক বা সাপের খেলা হয় সেখানে সে দাঁড়াইয়া আছে। মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, ঘোড়দৌড়ক্ষেত্রে সে বর্ত্তমান, কিন্তু যেখানে গান সেখানে সে নাই। থিয়েটারে সে নাই, টাউন হলেও সে নাই। বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ঝঙ্কার, সুবক্তার ওজস্বিনী বক্তৃতা তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

আকাশের ঘোর বজ্রনিনাদ হইতে আরম্ভ করিয়া কীটপতঙ্গের মৃদুধ্বনি কিছুই তাহার কর্ণে প্রবেশ করে না। কোকিলের কুহু রব, পাপিয়ার গান, কাকের কর্কশ শব্দ স্রোতস্বিনীর কলতান তাহার নিকট অবোধ্য।

পিছন হইতে সম্বোধন কর উত্তর পাইবে না, চীৎকার কর ফল হইবে না। সামনে আসিয়া তাড়াতাড়ি একটা প্রশ্ন করিয়া বস, দেখিবে সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আবার প্রশ্ন কর জবাব মিলিবে না। তোমার রাগ হইবে। যদি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হও তবে তোমার দয়া হইবে। তখন বোধ হয় বুঝিতে পারিবে, সে ঠিক তোমারই মত নয়। কিছু বিশেষ অভাব আছে। যে-বিশেষত্ব তোমা হইতে তাহাকে পৃথক করিতেছে তাহা শ্রুতি। এই

শ্রুতি-দ্বারা তুমি তাহা হইতে বিশিষ্ট এবং এই শ্রুতির অভাবহেতু তোমা হইতে সে বিশিষ্ট।

এইভাবে শ্রুতিহীনতা বিষয়ে তোমার দৃষ্টি পড়িলে তুমি ক্রমে তাহাতে আরও একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিবে। সেটা কি? সে কথা বলে না। তোমার শত চীৎকার করা সত্ত্বেও সে নিরুত্তর। দুই একটা অবোধ্য ইঙ্গিত বা ইসারা সে করিতেছে মাত্র। হয়ত বা তৎসঙ্গে পশুর ন্যায় দুই একবার গম্ভীর আওয়াজ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তোমার জবাব মিলিল কই? হয়ত তাহার ইঙ্গিত ও শব্দের ভিতর কোনও অর্থ আছে, কিন্তু তুমি তাহা বুঝিতে অক্ষম। পশুপক্ষীর ডাকের যেমন ব্যাখ্যা আমরা করিতে পারি না, তদ্রূপ তাহার ইসারা ও অস্বাভাবিক শব্দও তোমার নিকট ব্যাখ্যাত হইতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ পরে তোমার আর একটা ধারণা হইল যে, সে বোবা। বাস্‌ এই পর্য্যন্ত। তুমিও আর জিজ্ঞাসা করিলে না, সেও চলিয়া গেল। তোমারও সংবাদ লইবার কোনও প্রয়োজন রহিল না।

তুমি দুইটা অভাবই তাহাতে লক্ষ্য করিলে;—প্রথম তাহার বধিরতা, দ্বিতীয় তাহার বাক্‌হীনতা কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কোনো সংযোগ-সূত্র আছে বলিয়া তোমার মনে হইল কি? ঐ বধিরতাই যে বাক্‌হীনতার জন্মদাত্রী, তাহা কয়জন জানে? সোজা কথায় কালা হইলেই বোবা হয়। কেন হয়, তাহা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

আমরা কাহাকেও বোবা বলি? সে কথা বলিতে পারে না। যাহার কথিত ভাষা নাই। কেন সে কথা বলিতে অক্ষম? আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের শরীরের কোন্‌ কোন্‌ অংশের কাজ হয়? একটু নজর করিলেই দেখা যাইবে, যে, কথা বলিবার সময় নিম্নলিখিত শরীরাংশের প্রয়োজন,—ওষ্ঠ, দন্ত, মূর্দ্দা কঠিন ও নরম তাল, জিহ্বা ও নাসিকা। আচ্ছা, যদি তাই হয় তবে দেখা যাউক এই-সব অঙ্গ বোবারও আছে কি না। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে (যাঁহাদের সন্দেহ হয় হয় তাঁহারা একজন বোবাকে পরীক্ষা করিতে পারেন অথবা মূক-বধির বিদ্যালয়ে যাইয়া দেখিয়া আসিতে পারেন) যে, বোবাদের ঐ সকল অঙ্গ সুস্থ অবস্থায় আছে। তবে

দোষ কোথায়? বাগ্‌-যন্ত্রে দোষ নাই, কারণ পরিষ্কার স্বর প্রত্যেকের গলা হইতেই বাহির হয়। ফুস্‌ফুস্‌ ও সুস্থ—দেহের সুস্থতাই তাহার নিদর্শন না।

কথা বলিবার যন্ত্রে যখন কোনও দোষ পরিলক্ষিত হইল না তখন বোবা হওয়ার কারণটা অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আমরা কি ভাবে কথা শিখি? সৃষ্টিকর্ত্তা কি জন্মিবার সময়ে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটা ভাষার থলি দিয়া দেন? যদি তাহাই হইত, তবে ছোটবেলাতেই সব কথা বলিতে পারিনা কেন? 'পা' 'পা' 'মা' 'মা' বলিবার কি প্রয়োজন? প্রথম অবস্থা হইতেই ত বড বড় বাক্য যোজনা করিয়া কথা বলিতে পারিতাম। কই তাহা ত হয় না। আর যদি তাহাই হইত, তবে বাঙ্গালীর ছেলেকে কি এই ইংরেজী শিক্ষার দারুণ প্রয়োজনে বিধাতা একটা ইংরেজী ভাষার থলিও দিতে পারিতেন না?

কিন্তু তাহা হয় না। বাঙ্গালীর ছেলে বাংলাই বলে, ইংরেজের ছেলে ইংরেজী বলে। বাপ মা বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, বলিয়া কি? না, তা নয়। তাহা হইলে রবিবাবুর 'গোরা'-ও ছোটকাল হইতেই ইংরেজী বলিত।

তুমি জার্ম্মান ভাষা বলিতে পার না কেন। তোমারও ত সকল বাগ যন্ত্রই ঠিক আছে। কিন্তু তুমি ত' বেশ ইংরেজী বলিতে পার। ইহার কারণ কি? তুমি বাঙ্গালীর ছেলে, এমন সুন্দর, প্রাঞ্জল ইংরেজী তোমার মুখ হইতে কি করিয়া বাহির হয়? তুমি অমনি উত্তর করিলে—"আমি ত' জার্ম্মান ভাষা শুনিনি, তাই জার্ম্মান ভাষা বলিতে পারি না। আমি ছোটবেলা থেকেই ইংরেজী ভাষা বল্‌তে শুনেছি, তাই ইংরেজী ভাষা বল্‌তে শিখেছি।" এই উত্তরই সত্য। এখন দেখ, আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভাষা শিক্ষা করি কি না। আমরা কথা শুনি, সেই কথা অনুকরণ করিয়া বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। এই চেষ্টাই বাল্যকাল হইতে আরম্ভ হয় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সফলতা প্রাপ্ত হয়।

রাস্তায় বেড়াইতেছি। এক বাড়ীতে একটি লোক গান গাহিতেছে। দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরে গানটি মুখস্থ করিয়া

চলিয়া আসিলাম। কি করিয়া গানটি মুখস্থ করিলাম। শুনিয়া নয় কি? আমরা শুনিয়া শুনিয়াই ভাষা শিখি। ভাষা ও জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আসে না। অনুকরণ করিয়া শিখিতে হয়।

শ্রবণেন্দ্রিয়ই ভাষাশিক্ষার সহজ ও স্বাভাবিক দ্বার। কেবল ইংরেজী বই পড়িয়া ইংরেজী বলিতে পারা যায় না। ইংরেজী বলা অনুক্ষণ শুনতে হয়। আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহস্র সহস্র যুবক বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া বাহির হইতেছেন। কিন্তু সহজে ইংরেজী বলিতে অনেকেই প্রায় পারেন না। এ দোষ তাঁহাদের নয়। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কোনও ভাষা না শুনিতে পাইলে তাহা বলা চলে না। যে শিশুকাল হইতেই বিলাতে সাহেব-মেমদের সমাজে প্রতিপালিত হইয়াছে, সর্ব্বদা তাহাদের কথা শুনিয়াছে, তাহাদের প্রশ্ন শুনিয়া ইংরেজীতে যাহাকে উত্তর দিতে হইয়াছে, তাহাকে কেবল যে ইংরেজী ভাষাই শিক্ষা করিতে হইয়াছে তা নয়, তাহার গলার স্বর পর্য্যন্ত সাহেবী ধরণের হইয়া গিয়াছে।

তারপর আরোহ-প্রথা অবলম্বনেও বধিরতা ও মূকত্বে কার্য্য-করণ সম্বন্ধ প্রমাণ করা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত যত বোবা দেখা গিয়াছে, তাহারা সকলেই জন্মবধির। কাজেই ইহা সহজেই অনুমেয় যে, বধিরতাই মূকত্বের কারণ।

কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন "মশায়, কানে শোনে না, অথচ বেশ ত কথা বলে। সে ত স্কুলে পড়ে নাই।" এখানে কেবল একটু পর্য্যবেক্ষণের অভাব। ভাষা গঠিত হইবার পর অধিক বয়সে শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত হইলে ভাষা থাকিয়া যায়। ঐ অবস্থায় শ্রবণশক্তির সহিত ভাষার তিরোধান হয় না। কিন্তু একটা কিছু হইবেই। তিনি যদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন তাহার স্বর ধরিয়া গিয়াছে। স্বরের লালিত্য নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার আর গান গাহিবার শক্তি নাই। গাহিবার চেষ্টা করিলেও না শোনার দরুণ স্বরের ক্ষমতা বা প্রয়োজন-মত pitch রক্ষা করিতে তিনি পারেন না। যখন শব্দই শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া আছে, তখন শব্দের সমস্ত ধর্ম্ম, গুণাগুণও শ্রুতির উপরেই নির্ভর করিবে।

মূক-বধির হইলেই যে মূর্খ হইবে এমন কোন কথা নেই।

জন্ম-বধিরতার সঙ্গে মূর্খতার কোন সম্বন্ধ নাই। অহরহ মূক-বধিরের সঙ্গে থাকি। আমারও পূর্ব্বে সাধারণের ন্যায় এই সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা ছিল। বর্ত্তমানে ইহাদের সংস্রবে থাকাতে আমার পূর্ব্ব ধারণা দূরীকৃত হইয়াছে। যাহার সাধারণ বিচারবুদ্ধি নাই, তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ মূর্খ বলিয়া থাকি। এই সাধারণ বুদ্ধির বিকাশ আমাদের কথিত ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষাতেও হইতে পারে। এই ভাষা বোবাদের নিজ ভাষা বা ইসারার ভাষা। এই ভাষাকেই ইংরেজীতে 'সাইন ল্যাংগোয়েজ' বলে। মনের ভাব যাহার দ্বারা ব্যক্ত করা চলে একত্র বাসের ফলে যাহা সমশ্রেণীর জীব বিনা আয়াসে বুঝিতে সক্ষম, তাহাই ভাষা। আমরা, অর্থাৎ শ্রুতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, কথিত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা মুখের কথার দ্বারা ভাবের আদান-প্রদান নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। কেবল ইহাই পর্য্যাপ্ত নয়। এই কথিত ভাষার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গিও ব্যবহার করিয়া থাকি।

এই প্রকার অঙ্গভঙ্গির মূল কোথায় তাহা বিচার করিবে অন্য বিজ্ঞান। এখানে তাহার বিষয় উল্লেখ করিব না। ভাষা যখন গড়িয়া উঠিতেছিল অর্থাৎ ভাষার বাল্যবস্থায় যখন ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত শব্দরাশির অভাব হইয়াছিল, তখন ইসারা বা অঙ্গভঙ্গিই সেই অভাব পরিপূরণের কার্য্য করিয়াছিল, এইরূপ অনুমানে বোধ করি দোষ নাই। পরে ভাষার পরিপূর্ণতা দৃষ্ট হইলেও অঙ্গ-ভঙ্গিগুলি (gestures) আমরা ছাড়িতে পারি নাই। উহারাও 'সাথের সাথী' হইয়া গিয়াছে। এই হেতুই যখন কাহাকেও 'এস' বলিয়া ডাকি তখন দক্ষিণ হস্তও প্রসারিত হইয়া আপনিই দেহের দিকে নামিয়া আসে। এই প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত মিলিবে।

ইসারার ভাষাও অন্যান্য কথিত ভাষার ন্যায় arbitrary signs দিয়া তৈয়ারী। gesture স্বাভাবিক, sign (সংকেত) artificial (কৃত্রিম) এবং arbitrary, তবে প্রায় অনেকে সময়েই sing এর অনুসন্ধানে কোন-না-কোন একটা অর্থ মিলিয়া থাকে। তবে উহা অধিকাংশ স্থলেই accidental। সাধারণ সম্মতির স্থানও এই ভাষা-গঠনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কোনও নূতন ব্যক্তি বস্তু দেখিলে প্রথম একটি বালক ঐ ব্যক্তি বা বস্তুনির্দ্দেশক একটা

কিছু ইসারা করে। যদি অধিকাংশের তাহা পছন্দ হয় তবেই উহা ভাষাতে পরিণত হইবে, নচেৎ নয়। যদি ইতিমধ্যে কোন চতুর, বুদ্ধিমান বালক—যাহার প্রভাব সকলের উপর আছে—অন্য কোনও একটা যোগ্য চিহ্ন বাহির করিয়া দিতে পারে তবে পূর্বের ব্যক্তি ভোটে হারিয়া যাইবে এবং তাহার আবিষ্কৃত চিহ্ন অব্যবহার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। পরবর্ত্তী বালকের চিহ্নই উপযুক্ত বলিয়া ভাষাতে স্থান পাইবে।

মূক-বধির সংঘ, সমাজ বা সমিতিই ইসারার ভাষা গঠন করে। ইহা কোথায় সম্ভব? যেখানে ইহাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, স্কুল আছে, কলেজ আছে এবং শিল্প কাজের কারখানা আছে। যেখানে স্কুল ইত্যাদি থাকিবে সেইখানেই মূক-বধিরের সংঘ বা সমিতির সৃষ্টি সম্ভব। একক ভাবে কোনও মূক-বধির একটা ভাষা গঠন করিতে পারে না। তাহার ইসারা সুন্দর নয়, পর্য্যাপ্তও নয়। সুতরাং সে সমিতির সহযোগে আসিলে তাহাকে পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের উপাসক হইতে হইবে। এইখানেও একটা স্বাভাবিক বা ঐতিহাসিক সত্য কাজ করে। Testimony বা বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লওয়া মানব মনের একটা ধর্ম্ম।

পিতা যাহা বলেন পুত্র তাহা মানিয়া লয়, শিক্ষক যাহা বলেন ছাত্র তাহা মানিয়া নয়, রাজা যাহা বলেন প্রজা তাহা স্বীকার করিয়া লয়, শক্তিমান যাহা বলে দুর্ব্বল তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে—ইহাই মানব-মনের ইতিহাস। এই স্বীকার করা, এই বিশ্বাস করা বা মানিয়া লওয়াটা না থাকিলে বড়ই মুস্কিল হইত। পূর্ব্বপুরুষগণ জিনিষের যে প্রকার নামকরণ করিয়া গিয়াছেন তাহাতেই পরবর্ত্তী সন্তানগণ সন্তুষ্ট। এমন কি নিজের নামেও কেহ কখনও আপত্তি করেন নাই তাহা যতই না কেন রুচিবহির্ভূত হউক। মানব-মনের এই মানিয়া লওয়ার ধর্ম্মটা না থাকিলে কোন ভাষাই গড়িয়া উঠিতে পারিত না।

মূক-বধিরদিগের নিজ ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যে sign বা ইসারা করিয়া গেল তাহা পরবর্ত্তিগণ উল্টাইবে না। আপনিই মানিয়া লইবে। অপরিচিতের উপর পরিচিতের এই দাবী চিরদিনই রহিয়া যাইবে। সুতরাং যে

sign একবার স্কুলে বা সমিতিতে 'পাস' হইয়া গিয়াছে তাহার আর পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই ভাষার সাহায্যেই মূক-বধিরগণ সাধারণতঃ আপনাদের ভাবরাশি নিজেদের মধ্যে ব্যক্ত করে।

কোনও শ্রুতিসম্পন্ন ব্যক্তি যদি ইসারার ভাষা জানেন, তবে তিনিও তাহাদের সহিত আলাপে যোগদান করিতে পারেন। মূক-বধিরগণ আমাদিগকে ঘৃণা করে না। আমরাই তাহাদিগকে অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমরাই এই অসহায় মানবশাখাকে অসহানুভূতির বেড়া দিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়াছি। একবার দেখি নাই, একবারও বুঝিতে চেষ্টা করি নাই তাহারাও আমাদের মত, তাহাদেরও অবিকৃত বিচারবুদ্ধি আছে, তাহাদের জ্ঞান আছে, আত্মমর্য্যাদাবোধ আছে। তাহারাও আমাদের মত লেখাপড়া শিখিতে পারে, শিল্পকাজ করিয়া নিজেকে, নিজের পরিবারকে ভরণপোষণ করিতে পারে।

মূক-বিধরদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার ও বুঝিবার আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে-প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চল্‌চে। ইচ্ছা ছিল না এর মধ্যে প্রবেশ করি। প্রথম কারণ, আমার শরীর অপটু ; দ্বিতীয় কারণ, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত ভার সম্প্রতি আমি নিজের হাতে নিয়েচি। শরীর যখন দুর্ব্বল তখন একান্ত আমার আশু কর্ত্তব্যের বাইরে অন্য কর্ত্তব্যের মধ্যে নিজেকে জড়িত করা শক্তির অমিতব্যয়িতা, তাতে ব্যর্থতার সৃষ্টি করে। কিন্তু অকাজকে অগ্রসর হ'য়ে গ্রহণ না কর্‌লেও বাইরে থেকে সে ঘাড়ে এসে পড়ে, তখন তাকে অস্বীকার কর্‌তে গেলে জটিলতা আরো বেড়ে যায়।

শিক্ষাবিভাগ থেকে কিছুদিন হ'ল এক পত্র পেয়েছিলুম ; তাতে সঙ্গীত শিক্ষার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। বিষয়ের গুরুত্ব বিচার ক'রে আমি চুপ ক'রে থাক্‌তে পারিনি। উত্তরে লিখেছিলুম, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা গ'ড়ে তোল্‌বার পক্ষে অধ্যাপক ভাট্‌খণ্ডেই যোগ্যতম। আশা করেছিলুম, এইখানেই আমার কাজ ফুরোলো। কর্ম্মফলের পরম্পরা এখনো শেষ হয়নি। চিঠিপত্রযোগে তর্কবিতর্কের জালের মধ্যে জড়িত হ'য়ে পড়েচি। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রেষ্ঠ গায়ক বলেচি, এই কারণে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েচে ; সেটা পরিষ্কার করা ভাল।

সাধারণত আমরা যাঁদের ওস্তাদ বলি, পুরাতন বিদ্যাধারাকে রক্ষা করা সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ একটা উপযোগিতা আছে। তাঁরা সংগ্রহ করেন, সঞ্চয় করেন, সঙ্গীত ব্যাকরণের বিশুদ্ধতা বাঁচিয়ে রাখেন। চিরপ্রচলিত রাগরাগিণীকে চিরপ্রচলিত প্রথার কাঠামোর মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ধ'রে রাখ্‌বার কাজে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তাঁদেরকে প্রবৃত্ত হ'তে হয়। ছেলেবেলা থেকেই এক মাত্র এই কাজেই তাঁদের দেহ-মন-প্রাণ নিযুক্ত। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয় ; অনেকের তা নেই, অনেকে তাকে অবজ্ঞাই

করেন। গান সম্বন্ধে তাদের প্রতিভার স্বকীয়তাও বাহুল্য, এমন কি তাতে হয়ত তাঁদের আপন কর্মের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাঁরা একান্ত অবিকৃত ভাবে প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ করে' চলেন এইটেই তাঁদের গর্বের বিষয়। এইরকম রক্ষকতার মূল্য আছে। সমাজ সেই মূল্য তাঁদের যদি না দেয় তবে তাঁদের প্রতিও অন্যায় করে, নিজেরও ক্ষতি ঘটায়।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এমন একটি কলাবিদ্যা যার রচনার নিয়ম বহুকাল পূর্বেই সমাপ্ত হ'য়ে গেছে। সেই বহুকাল পূর্বের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়েই তার বিচার চলে। যাঁরা সেই আদর্শ-মতেই বহু পরিশ্রমে এই জাতীয় সঙ্গীতের সাধনা করেচেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষ্যকেই প্রামাণ্য ব'লে গ্রহণ করতে হয়।

এই ওস্তাদ সম্প্রদায়ের মধ্যেও গুণের তারতম্য নিশ্চয় আছে। কারো গানের সংগ্রহ অন্যের চেয়ে হয়ত বহুলতর, রাগরাগিণীর রূপের পরিচয় হয়ত এক ওস্তাদের চেয়ে অন্য ওস্তাদের চেয়ে অন্য ওস্তাদের অধিকতর বিশুদ্ধ ; তাল তানের প্রয়োগ সম্বন্ধে কারো বা কসরৎ অন্যের চেয়ে বিস্ময়জনক।

ওস্তাদীর চেয়ে বড়ো একটা জিনিষ আছে, সেটা হচে দরদ। সেটা বাইরের জিনিষ নয়, ভিতরের জিনিষ। বাইরের জিনিষের পরিমাপ আছে, আদর্শে ধ'রে সেটা সম্বন্ধে দাঁড়ি পাল্লার বিচার চলে। তার চেয়ে বড়ো যেটা সেটাকে কোনো বাইরের আদর্শে মাপা চলে না, সেটা হ'ল "সহৃদয় হৃদয় বেদ্য।" কে সহৃদয় আর কে সহৃদয় নয়, বাইরে থেকে তারও তল পাওয়া যায় না, তার শেষ নিষ্পত্তি কর্‌বার ব্যর্থ চেষ্টা মাথা ফাটাফাটিতে গিয়ে পেঁছয়— অর্থাৎ যাকে বলে হিংস্র দুঃসহযোগ।

বালক কালে যদুভট্টকে জান্‌তাম। তিনি ওস্তাদজাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে ব'লে বর্ণনা কর্‌লে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তাঁর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ তখন হিন্দুস্থানে অনেক ছিল, অর্থাৎ তাঁদের গানের

সংগ্রহ আরো বেশি ছিল, তাঁদের কসরৎও ছিল বহুসাধনাসাধ্য, কিন্তু যদুভট্টর মতো সঙ্গীত-ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কি না সন্দেহ। অবশ্য একথাটা অস্বীকার করবার অধিকার সকলেরই আছে ; কারণ কলাবিদ্যায় যথার্থ গুণের প্রমাণ তর্কের দ্বারা স্থির হয় না, যষ্টির দ্বারাও নয়। যাই হোক্ ওস্তাদ ছাঁচে ঢেলে তৈরি হ'তে পারে, যদুভট্ট বিধাতার স্বহস্ত-রচিত। অতএব চল্‌তি কাজে যদুভট্টদের প্রত্যাশা করা বৃথা। কথাটা হচ্চে এই যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতো একটা স্থাবর পদার্থের আধার যখন খুঁজি তখন ওস্তাদকেই সহজে হাতের কাছে পাই। বিশুদ্ধ রাগরাগিণী শুনতে বা শিখ্‌তে যখন চাই তখন ওস্তাদকেই খুঁজি। যেমন যে-পূজাবিধি মন্ত্রে ও অনুষ্ঠানে একেবারে অচল ক'রে বাঁধা, তার জন্যে পুরুতের দরকার হয় তখন এমন লোককে জুটিয়ে আনি, অক্ষরে অক্ষরে যার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অভ্যস্ত। তার মানে বুঝতে পারে এতটুকু সংস্কৃতজ্ঞান এই পুরুতের পক্ষে অনাবশ্যক। কারণ এইসকল ক্রিয়াকলাপের বাইরের রূপটাই হ'ল প্রধান, সেটা যদি বিশুদ্ধ হয় তাহলেই কাজটা নিষ্পন্ন হ'তে পারে। যিনি পণ্ডিত তিনি তাঁর অর্থবোধের দ্বারা এইসকল মন্ত্রে হয়ত প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু একান্তচর্চ্চার অভাবে বাইরের দিকে তাঁর স্খলন হ'তে পারে, অন্তত তাঁর পক্ষে কাজটা অনর্গলভাবে সহজ নাও হতে পারে। যেখানে দৃঢ় ক'রে বেঁধে দেওয়া বাহ্যরূপটাই প্রধান যেখানে আয়াস-সাধ্য অভ্যাসটাই বেশি কাজে লাগে, সেখানে প্রতিভা লজ্জিত হ'বে। আপিসের অভিজ্ঞ কেরাণী তার স্বস্থানে উপরের অধ্যক্ষের চেয়ে বেশি যোগ্য, কিন্তু সেই যোগ্যতা সেই সীমার মধ্যেই পর্য্যাপ্ত।

হিন্দুস্থানী গানকে যেহেতু আমরা অতীতকালের নির্দ্দিষ্ট বিধির দ্বারা বিচার করি সেইজন্যেই তার এমন বাহন চাই, যার চর্চ্চা আছে, প্রতিভা যার পক্ষে বাহুল্য ; যে আবিষ্কারক নয়, যে ব্যাখ্যাকারক,—সঙ্গীতে যে জগদীশচন্দ্র বসু নয়, যে বিজ্ঞান-পাঠশালায় ডেমনেস্‌ট্রেটর। এককথায় যে ওস্তাদ।

আমাদের যখন অল্প বয়স ছিল তখন কলকাতায় ধনীদের ঘরে এইরকম ওস্তাদের সমাগম সর্ব্বদাই দেখেচি। তাতে ক'রে সঙ্গীতের

অলংকার শাস্ত্রবোধ অন্তত ধনীসমাজে প্রচলিত ছিল। সেই সব বনেদীঘরে গানের এই অলংকার শাস্ত্রবোধটা না থাকা লজ্জার বিষয় ছিল। ঠিক্ কোন্‌খানে সুর বা তালের বতটুকু স্খলন হচ্চে সেটা তাঁরা অনেকেই জান্‌তেন, সেই দিকে কান রেখেই তাঁরা গান শুন্‌তেন। বাঁধা আদর্শের সঙ্গে তানমানলয় সম্পূর্ণ মিলেচে দেখ্‌লেই তাঁরা পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌তেন। রাগিণীর যে-সব জায়গায় দুরূহ গ্রন্থি, সেইখানটাতে যে-সব গাইয়ে অনায়াসে সংকট পার হ'য়ে যেত তারাই বরমাল্য পেত।

যে কারণেই হোক্, সহরে অনেকদিন থেকেই গাইয়ে সমাগম বিরল হ'য়ে এসেচে। তাই হিন্দুস্থানী গানের অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের চর্চা অনেক দিন থেকে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে নেই বল্‌লেই হয়। অথচ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে অলংকার-শাস্ত্রবোধটা প্রধান জিনিষ। এই কারণেই যখন আমরা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিশেষভাবে আলোচনা কর্‌তে চাই তখন ওস্তাদকে খুঁজি। সেও পাওয়া দুর্লভ হয়েচে।

আমাদের বাড়ীতে একদা নানাপ্রয়োজন বশত এই রকম ওস্তাদের খোঁজ আমরা প্রায়ই কর্‌তুম। শেষ যাঁকে পাওয়া গিয়েছিল তিনি খ্যাতনামা রাধিকা গোস্বামী অন্যান্য গায়কদের মধ্যে যদুভট্টর কাছেও তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন। যাঁদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল তাঁরা সকলেই জানেন রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রসসঞ্চার কর্‌তে পার্‌তেন। সেটা ছিল ওস্তাদের চেয়ে কিছু বেশী। সেটা যদি নাও থাক্‌ত তবু তাঁকে আমরা ওস্তাদ ব'লেই গণ্য কর্‌তুম, এবং ওস্তাদের কাছ থেকে যেটা আদায় কর্‌বার তা আমরা আদায় কর্‌তুম, আমরা আদায় করেওছিলুম। সে-সব কথা সকলের জানা নেই।

তাঁর মৃত্যুর পরেও ওস্তাদের খোঁজ কর্‌বার দরকার ঘটেছিল। শান্তিনিকেতনে হিন্দুস্থানী গান শিক্ষা দেবার প্রয়োজন বোধ করি। নিজেও চেষ্টা করেচি, বন্ধুবান্ধবদেরকেও অনুরোধ জানিয়েচি স্বয়ং দিলীপকুমারকেও এ-সম্বন্ধে আমার অভাব জ্ঞাপন করেচি। তখনই আবিষ্কার করা গেল, বাংলাদেশে একমাত্র হিন্দুস্থানীগানের

ওস্তাদ আছেন শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর। আর যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ তাঁর সমকক্ষ নন, এবং অনেকে তাঁরই আত্মীয়। আমি তাঁকেও শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা কাজের জন্যে পেতে ইচ্ছা করেছিলুম। কিন্তু কলকাতায় তাঁর এত কাজ যে, তাঁকে কলকাতার বাইরে পাওয়া সম্ভব হয়নি। দিলীপকুমার তাঁর চেয়ে যোগ্যতর কোনো ওস্তাদের কথা আমাকে জানাতে পারেননি। আজকের দিনে কলকাতায় যেখানেই সঙ্গীত-শিক্ষার প্রয়োজন হয়েচে সেখানেই তাঁকে ডাক পড়েচে। আর যাই হোক্ আজকের দিনে সাধারণের মতে তিনিই বড়ো ওস্তাদ ব'লে স্বীকৃত।

যাঁরা সঙ্গীত-ব্যবসায়ী নন বাংলাদেশে তাঁদের মধ্যে গোপেশ্বর-বাবুর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ কেউ আছেন কি না, সে-কথা বলা কঠিন। যাঁরা সঙ্গীত-ব্যবসায়ী তাঁরা শিশুকাল থেকেই একান্তভাবে গান শিক্ষায় প্রবৃত্ত, অনেক স্থলে তাঁদের বংশের মধ্যে গানচর্চার ধারা প্রবহমান। অতএব গানের সংগ্রহ ও সাধনা সম্বন্ধে তাঁদের উপর নির্ভর করা চলে। একসময়ে আমি বহুল পরিমাণেই হোমিয়োপ্যাথী চিকিৎসার চর্চা করেছিলুম। দৈবাৎ আমার চিকিৎসায় যাঁরা ফল পেয়েছিলেন তাঁরা ব্যবসায়ী চিকিৎসককে ছেড়ে আমার কাছেই আস্‌তেন। তার থেকে আমার পক্ষপাতীর দল যদি বিচার কর্‌তেন আমি সত্যই বড়ো ডাক্তার তবে তাঁদের সেই বিশ্বাসের জোরে আমার ডাক্তারি বিদ্যার প্রমাণ হ'ত না। অন্যান্য শিক্ষা বা কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে যাঁরা কোনো একটি বিদ্যার চর্চা করেন সাধারণত তাঁদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না এমন দলের যাঁরা একান্তভাবেই সেই বিদ্যার চর্চা করেচেন। অব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন লোক থাক্‌তে পারেন,—কিন্তু পূর্ব্বেই বলেচি,—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতো প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের দ্বারা প্রায় অচল ভাবে নিয়মিত বিদ্যায় কেবল প্রতিভা দ্বারা ওস্তাদী লাভ করা যায় না, বহুল শিক্ষা ও চর্চার দ্বারাই করা যায়।

আর একটি বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্চে,—গোপেশ্বরবাবুর গানের ষ্টাইলটা বিষ্ণুপুরী ব'লে কেউ কেউ তাঁর ওস্তাদীতে কলঙ্ক আরোপ ক'রে থাকেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে দেখা যায় যে, প্রদেশভেদে সাহিত্যের স্বাভাবিক রীতিভেদ স্বীকার করা হয়েচে।

বৈদভী রীতি, গোড়ীয় রীতি প্রভৃতি রীতির বিশিষ্টতা তিরস্কৃত হয়নি। ভারতীয় স্থাপত্যে দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের সঙ্গে উড়িষ্যার ও উত্তর ভারতের অনেক পার্থক্য। মাদুরার মন্দির রচনায় স্থাপত্য পদে পদে যে তান লাগিয়েছে, তার অংশে অংশে-অলংকার-বৈচিত্র্যের যে অতি বাহুল্য তা কারো কারো ভালো লাগে না; তার সঙ্গে সেকেন্দ্রার স্থাপত্যের তানবিহীনতা ও অলঙ্কার-বিরলতার তুলনা কর্‌লে সেকেন্দ্রাকেই কারো কারো রুচিতে ভাল ঠেকে, তবুও ভারতীয় স্থাপত্যে দাক্ষিণী রীতিকে অস্বীকার করা চলে না। তেমনিই হিন্দুস্থানী গান বাংলা দেশে যদি কোনো বিশেষরীতি অবলম্বন ক'রে থাকে তবে তার স্বাতন্ত্র্য মেনে নিতে হ'বে। সেই রীতের মধ্যেও যে উৎকর্ষের স্থান নেই তা বলা চলে না। যদুভট্টের প্রতিভার প্রথম ভূমিকা এই বিষ্ণুপরী রীতিতেই, রাধিকা গোস্বামী সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। পশ্চিম-দেশী শ্রোতারা যদি এই রীতির গান পছন্দ নাও করে তবে সেটাকেই চরম বিচার ব'লে মেনে নেওয়া চলে না। রসবোধ সম্বন্ধে মতভেদ অভ্যাসের পার্থক্যের উপর কম নির্ভর করে না। এমনও যদি ঘটে যে, কোনো বিশেষ গায়কের মুখে বিষ্ণুপুরী রীতির গান সত্যই প্রশংসাযোগ্য না হ'য়ে থাকে, তাতে সাধারণভাবে বিষ্ণুপুরী রীতিকে নিন্দা করা উচিত হয় না। শত শত গায়ক আছে যারা হিন্দুস্থানী দস্তুর-মতোই গান গেয়ে শ্রোতাদেরকে পীড়িত করে, সেজন্যে হিন্দুস্হানী রীতিকে কেউ দায়ী করে না।

যে তর্ক উপস্থিত হয়েছে তার প্রধান মীমাংসার বিষয় এই যে, বিশ্ববিদালয়ে সঙ্গীত শিক্ষাবিভাগ গ'ড়ে তোল্‌বার কাজে কে সব-চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। আমার মনে সন্দেহমাত্র নেই, যে, ভাট্‌খণ্ডেই সেই লোক। ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর যে ভূরিদর্শিতা তা আর কারো নেই তা ছাড়া তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাদান প্রণালীর অসাধারণ নৈপুণ্য সকলকেই স্বীকার কর্‌তে হ'বে। তিনি গায়ক নন, তিনি গান-শাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়, অন্যত্র তিনি হিন্দুস্হানী গানশিক্ষার যে ভিত্তি রচনা করেচেন, বাংলা দেশেও যদি তাঁকে সেই ভিত্তিরচনার সুযোগ দেওয়া যায় তবে বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ সফলতালাভ কর্‌বেন।

সেকালের কলিকাতায় ইংরাজী স্কুল

পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর,

১৭৩৪ হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় ইংরাজী-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। খিদিরপুর পুলে উঠিবার সময় দেখিতে পাওয়া যায়, পশ্চিম দিক্ দিয়া একটি রাস্তা গঙ্গাতীরের দিকে চলিয়া গিয়াছে; ঐ অঞ্চলের নাম "কুলী-বাজার"। ইহা অতি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানেই ১৭৭৫, ৫ই আগষ্ট শনিবার দিবসে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল। পলাসীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বৎসর হইতেই বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। যে-সকল কুলী ও মজুর দুর্গ-নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিল, তাহারা এই স্থানে বাস করিত বলিয়া লোকে অদ্যাপি ইহাকে "কুলী-বাজার" বলিয়া থাকে।

যে-সকল ইংরাজ সৈনিক পুরুষ শ্রীরঙ্গপট্টন বা পলাসীর প্রাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া কুলী-বাজারেই বাস করিতেন। তখন কলিকাতায় অতি অল্পই পাকাবাড়ী ছিল; সুতরাং খড়ের ঘরেই তাঁহাদিগকে বাস করিতে হইত। তাঁহাদের অনেকে যুদ্ধকার্য্যে অসমর্থ হওয়ায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তি-ভোগী হইয়া দিন-যাপন করিতেছিলেন। প্রত্যেক লোকে দৈনিক একটাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। তাঁহারা সকলেই প্রায় নিষ্কর্ম্মা,—তামাক খাইয়া ও গল্প করিয়া দিন কাটাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যৎসামান্য ইংরাজী জানিতেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্, তিনি একটি স্কুল খুলিয়া বসিতেন। তাঁহার দেখাদেখি কোন বিধবা সৈনিক-রমণীও আর একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। মাষ্টার-সাহেব একখানি ভগ্নপ্রায় পুরাতন চেয়ারে বসিয়া সম্মুখস্থিত একটি বেতের মোড়ার উপর পা-দুখানি তুলিয়া দিয়া ছাত্রগণকে A. B. C. ইত্যাদি অক্ষর শিক্ষা দিতে বসিলেন। মুখে একটি গুড়গুড়ি নল বিরাজ করিতে লাগিল। ছাত্রগণকে প্রহার করিবার

জন্য হাতে একগাছি বেত রাখিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ একটি পা-জামা ও চাপকান। এক একটি ছাত্র মোড়ায় বসিয়া পড়িত। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্র "মিশ্রভাগ" পর্য্যন্ত অংক কষিত। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত স্কুল বসিত। মাষ্টার সাহেবের গৃহিণী তরকারী ছাড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে রন্ধনের আয়োজন করিতেন। পলাসীর যুদ্ধের পরবর্ত্তী কাল হইতে কয়েক বৎসর এইভাবেই শিক্ষাদান করা হইত।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপেই কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্ত্তী ২৫ বৎসরের শিক্ষার অবস্থা যৎকিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছিল। ১৮১৭, ২০ জানুয়ারী সোমবার "হিন্দু-কলেজ" স্থাপিত হইলে পাশ্চাত্ত্য প্রণালী মতে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে হিন্দু-কলেজে রীতিমত শিক্ষাদান করা হইতে লাগিল এবং ক্রমশই তাহার সুফল ফলিতে লাগিল।

সেকালের কলিকাতায় যে-সকল ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

(১) চ্যারিটি স্কুল (Charity School)। পলাসীর যুদ্ধের ২৩ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার কোন্ স্থানে কোন্ ব্যক্তি ইহা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইহাই কলিকাতায় সর্ব্ব প্রথম ইংরাজী স্কুল। এইহেতু পরবর্ত্তী সময়ে লোকে ইহাকে "ওল্ড্ চ্যারিটী স্কুল" বলিত। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জানবাজারে কোন একজন সাহেবের বাগানবাড়ীতে স্কুলটি উঠিয়া আসিয়াছিল। এই স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ, মাসিক ও বাৎসরিক চাঁদা আদায় করা হইত। দ্বিতীয়তঃ, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া Sr Anne's Church ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়ায় তাহার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ পরবর্ত্তী নবাব মিরজাফরের নিকট হইতে ক্লাইভ এক কোটী সত্তর লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। এই টাকার কিছু অংশ ক্লাইভ চ্যারিটী-স্কুলের উপকারার্থ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু

এই টাকার পরিমাণ জানা যায় না। তৃতীয়তঃ, Lawrence Constantine নামক এক ধনাঢ্য পর্টুগীজের উইল অনুসারে তাঁহার ম্যানেজার Charles Weston ১৩৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে স্বহস্তে ছয় সাত হাজার টাকা চ্যারিটী-স্কুল ফাণ্ডে দান করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানিও স্কুলটির সাহায্যার্থ অনেক টাকা দিয়াছিলেন। পঞ্চমতঃ, Mr Bourchier এই স্কুলের নিমিত্ত প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া যান। এস্থলে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি প্রথমে কলিকাতার Master Attendant ছিলেন। তৎপরে তিনি সামান্য ব্যবসায় হইতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তৎকালে মেয়র ও অলডারম্যান কলিকাতায় বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য পৃথক্ বিচার-গৃহ ছিল না। তাঁহাদিগের অসুবিধা দূর করিবার জন্য বুর্বশির সাহেব একটি বিচার- গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। চ্যারিটী-স্কুলের নিমিত্ত বাৎসরিক চারি হাজার (আর্কট) মুদ্রা দান করিবেন, এই সর্ত্তে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কোম্পানীকে বাড়ীখানি দিয়াছিলেন। কোম্পানী বাহাদুর এই টাকা রীতিমত দিতেন। এই টাকা বাদেও কোম্পানী মাসে মাসে আরও ৮০০৲ টাকা করিয়া দান করিতেন। ষষ্ঠতঃ, রাজা উমিচাঁদও এই স্কুলের উন্নতিকল্পে ৩০,০০০৲ দান করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। ১৭৩৪ হইতে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক মাস পর্য্যন্ত এই স্কুলটি স্বাধীন-ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ইহাতে পাশ্চাত্য প্রণালী মতে উপযুক্ত শিক্ষাদান করা হইত না। এই হেতু Calcutta Free School নামক আর একটি ইংরাজী স্কুলের সহিত ১৭৮৯, ২১ ডিসেম্বর ইহা মিলিত হইয়া যায়। প্রথমতঃ, উভয় স্কুলের ধন-ভাণ্ডার লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হয়। এই অসুবিধা-নিবারণের জন্য ১৮০০, ১৪ এপ্রিল তারিখে দুইটী স্কুলের ধন-ভান্ডার একত্র মিলিয়া যায়, এবং দুইটী স্কুলই একটি বলিয়া গণ্য হয়।

(২) রামনারায়ণ মিশ্রের স্কুল। ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রিম-কোর্ট স্থাপিত হইলেই অনেক বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়ে। তখন যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী

জানিলেই মানুষ বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে পারিত। রামরাম মিশ্র নামক একটি লোক কিঞ্চিৎ ইংরাজী জানিতেন; অর্থাৎ তিনি কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজী প্রতিবাক্য শিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার একটি ছাত্র ছিলেন,—তাঁহার নাম রামনারায়ণ মিশ্র। রামনারায়ণ যোড়াবাগানে একটি ইংরাজী স্কুল খুলিয়াছিলেন। তিনি উকীলের কেরাণীগিরি করিতেন এবং কিঞ্চিৎ আইন জানিতেন বলিয়া লোকের দরখাস্তও লিখিয়া দিতেন। তাঁহার স্কুলে প্রত্যেক ছাত্রকে অবস্থানুসারে ৪৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন দিয়া পড়িতে হইত। সুপ্রিম-কোর্ট স্থাপনের পূর্ব্বেই এই স্কুলটি স্হাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই স্কুলে Thomas Dice এর Spelling Book পড়ান হইত।

(৩) কিয়ারন্যান্ডার (Kiernander) স্কুল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে, ১ ডিসেম্বর তারিখে এই স্কুলটি কিয়ার-ন্যান্ডার সাহেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কতকগুলি খ্রিশ্চান ছাত্র এই স্কুলে কেবল পড়িত, অবশিষ্ট ছাত্রগণ পড়িত ও আহার পাইত। বর্ত্তমান মিসন-চার্চ লেনে এই স্কুলটি অবস্থিত ছিল।

(৪) হেজেস্-বিবির বালিকা-বিদ্যালয় হেজেস্ সাহেবের পত্নী ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্হাপন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইহাই কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম বালিকা-বিদ্যালয়। ইহাতে নৃত্যকলা ও ফরাসী-ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। শুনিতে পাওয়া যায়, এই বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকাগণ অত্যন্ত অসভ্য, অশান্ত ও অবাধ্য ছিল। যাহা হউক, বিবি-সাহেব এই স্কুলের কৃপায় অনেক টাকা লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন।

(৫) চিৎপুর বয়জ্ বোর্ডিং স্কুল। চিৎপুর অতি প্রাচীন স্হান। আজকাল যেখানে গঙ্গাতীরে বাগবাজার ও চিৎপুরের মধ্যে একটি সেতু রহিয়াছে, তাহার কিছু উত্তর দিকেই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁর একটি সুরম্য প্রাসাদ ও উদ্যান ছিল। এই প্রাসাদের নিকটেই বালকদিগের জন্য ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে একটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। কোন্ সাহেব ইহা স্থাপন করেন, তাহা বলা যায় না। ছাত্রগণ স্কুলে পড়িত এবং আহারাদি করিত। যাহারা মাষ্টারের সহিত টেবিলে বসিয়া খাইত,

তাহারা মাসিক ৫০, টাকা বেতন দিত। কিন্তু যাহারা পৃথক্ বসিয়া খাইত ও স্কুল-বাড়ীতে থাকিত, তাহাদিগকে মাসিক ৩০, টাকা দিতে হইত। এই স্কুলে ১৪ জনের অধিক ছাত্র লওয়া হইত না।

(৬) পিট্‌স্-বিবির স্কুল (Mrs Pitt's School for Young Ladies)। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোক-গণের জন্য ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পিট্‌স্-বিবি এই স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বয়ঃস্থা নারীদের নিমিত্ত অন্য কোন স্কুল স্থাপিত হয় নাই।

(৭) ডারেল বিবির (Mrs. Durrell's) সেমিনারী। এই স্কুলটিও স্ত্রীলোকদের জন্য ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। তাৎকালিক গণ্যমান্য সাহেবগণ এই স্কুলটির জন্য অনেক টাকা চাঁদা তুলিয়া দিতেন।

(৮) হজেস্-সাহেবের স্কুল (Hodge's School)। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হজেস্-নামক একজন সাহেব এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, আর্ম্মানী গির্জ্জার নিকটে একটি গভর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুল খোলা হইবে। এই স্কুলে পড়া, হাতের লেখা ও সূচের কাজ শিখান হইবে।

(৯) গ্রিফিথ্ সাহেবের বোর্ডিং স্কুল। শিয়ালদহের নিকটে বৈঠকখানায় গ্রিফিথ্ সাহেব ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাগানবাড়ীতে একটী স্কুল খুলিয়াছিলেন।

(১০) আপার এণ্ড্ লোয়ার অর্ফ্যান্ স্কুলস্। ১৭৮২, আগষ্ট মাসে মেজর কীলপ্যাট্রিক সাহেব প্রস্তাব করেন যে, মাতা-পিতৃহীন বালক-বালিকাগণের নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ১৭৮৩ খৃীষ্টাব্দে মার্চ মাসে Military Orphan Society নামক একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে দুইটি স্কুল স্থাপিত হইল, একটির নাম Upper School, অপরটির নাম Lower School, প্রত্যেক স্কুল আবার দুইভাগে বিভক্ত হইল,—একটি বালকদিগের নিমিত্ত ও আর একটি বালিকাদিগের নিমিত্ত। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণের পুত্র ও কন্যাগণ Upper School এ এবং সৈনিকগণের বালক-বালিকা-গণ

Lower School-এ পড়িত। প্রথমতঃ উক্ত স্কুলগুলি হাবড়ায় স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুরে উঠিয়া আসে যে বাড়ীখানিতে বালিকা-বিদ্যালয় বসিত তাহা Kyderpur House নামে পরিচিত ছিল। ইহার সম্মুখভাগে নৃত্য করিবার একখানি গৃহ ছিল। শিক্ষার্থিনীগণ বল্-নাচ করিতেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে "আপার স্কুল" এবং কয়েক বৎসর পরে "লোয়ার স্কুল" উঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন যে সকল ছাত্র ও ছাত্রী এই স্কুলে পড়িত, তাহাদিগকে অন্যান্য স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(১১) সেরবোরনের (Sherborne's) সেমিনারি। সেরবোরন সাহেব একজন ফিরিঙ্গি ছিলেন। তাঁহার স্কুল অতি প্রাচীন, সম্ভবতঃ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর, হরকুমার (মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের পিতা), প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামগোপাল ঘোষ, এবং মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কুলে প্রথমতঃ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরিশেষে কৃতবিদ্য, কৃতকর্ম্মা ও যশস্বী হইয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাবুদের বাটীতে সেরবোরন সাহেবের সুনাম ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। ঠাকুরবাবুদের বাটীতে ক্রিয়াকলাপের উপলক্ষে সাহেব-মহাশয় তাঁহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া হাঁড়ি হাঁড়ি খাবার তাঁহার স্ত্রীর জন্য বাটীতে লইয়া আসিতেন। এখন যেখানে "আদি ব্রাহ্ম-সমাজ" আছে, তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকেই সাহেবের বাটী ও স্কুল ছিল।

(১২) রামজয় দত্তের স্কুল। রামজয় দত্ত, ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলুটোলায় এই স্কুল স্থাপন করিয়া তৎকালোচিত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিতেন। প্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই স্কুলে আমি 'তুতিনামা' ও 'এরেবিয়ান নাইটস' পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছিলাম। তৎকালে এদেশে ইংরাজী অভিধান বা ইংরাজী ব্যাকরণ ছিল না।"

(১৩) ইউনিয়ন স্কুল। এই স্কুলটী কলিকাতায় কোন্ স্থানে কোন্ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা জানা যায় না। ইহা ১৭৯৩

খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলটী খোলা থাকিত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহাতে একশত ছাত্র পড়িত।

মার্টিন বাউলের (Martin Bowl's) স্কুল। মার্টিন বাউল নামক এক জন ফিরিঙ্গী আমড়াতলায় একটি স্কুল খুলিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল মহাশয় এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। সম্ভবতঃ ইহা ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

(১৫) ক্যানিং একাডেমি। ক্যানিং (Canning) নামক একজন সাহেব ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই স্কুলটি খুলিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব এই স্কুলেই বিদ্যাশিক্ষা করেন।

(১৬) আর্চার-সাহেবের স্কুল। আরচার (Archer's) ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বিলক্ষণ সুনাম ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

(১৭) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। কোম্পানীর সিভিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণর-জেনারল ওয়েলেসলী, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট তারিখে এই কলেজটী স্হাপন করেন। এই স্কুলে বাঙ্গালা-বিভাগের শিক্ষকগণের মধ্যে আমরা রামরাম বসুর নাম পাই। তিনি এখানে শিক্ষকতা কালেই "প্রতাপাদিত্য চরিত" রচনা করেন।

(১৮) কলিকাতা একাডেমী। সম্ভবতঃ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। কামিং সাহেবই এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। মহারাজ নবকৃষ্ণের পৌত্র ও রাজা গোপীমোহন দেবের পুত্র, স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই স্কুলে ইংরাজী ভাষা প্রথম শিক্ষা করিয়াছিলেন। তখন এই স্কুলে ডাইক সাহেবের 'স্পেলিং বুক' ও 'স্কুল মাষ্টার' এই দুইখানি পুস্তকের অধ্যাপনা হইত।

(১৯) রিড্ সাহেবের স্কুল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রিড (Reid) হাটখোলায় এই স্কুলটি স্থাপন করেন। কোন্নগর-নিবাসী মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব কয়েক মাস এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

(২০) এর‍্যাটুন পিটার্সের (Arratoon Peter's) স্কুল। এই স্কুলটী সম্ভবতঃ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। স্বর্গত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "সাহেবের যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে কলুটোলার কাণা নিতাই সেন ও খোঁড়া অদ্বৈত সেন প্রসিদ্ধ।

ইহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ব্যাকরণহীন ইংরাজী বলিতে পারিতেন এবং একটু-আধটু ইংরাজী লিখিতে পারিতেন বলিয়া তৎকালীন কলিকাতা সমাজে ইহাঁদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। ইহাঁরা যাত্রা প্রভৃতি উৎসবাদিতে আপনাদের পদ-গৌরবের চিহ্ন-স্বরূপ কাবা চাপকান পরিয়া ও জরীর জুতা পায়ে দিয়া আসিতেন। লোকে সম্ভ্রমের সহিত ইহাঁদিগের দিকে তাকাইয়া দেখিত।"

(২১) আনন্দীরামের স্কুল। আনন্দীরাম মহাশয় তাঁহার বসতি বাটীতে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুলটি খুলিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-ছাত্রগণকেই পড়াইতেন। তাঁহার পড়াইবার নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। ছাত্রেরা গিয়া তাঁহার বাটীতে বহুক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকিত। যেদিন তাঁহার ইচ্ছা হইত, সেই দিন তিনি তাহাদিগকে পড়াইতেন। তাঁহার একখানি খাতায় কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী প্রতিবাক্য লেখা ছিল। ইহা দেখিয়াই পাঁচছয়টী শব্দ তিনি ছাত্রদিগকে মধ্যে মধ্যে শিখাইতেন।

(২২) এল্ স্যানাবেলস (L. Schnabel's) স্কুল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পিয়ানোফোর্টে শিক্ষা দেওয়া হইত। মাসিক বেতন ৫০ টাকা।

(২৩) ষ্ট্যাথাম্‌স্ একাডেমী। বড় ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে এই স্কুলটী অবস্থিত ছিল। ষ্ট্যাথাম (Statham) এই স্কুল পরে হাবড়ায় উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

(২৪) নিত্যানন্দ সেনের স্কুল। নিত্যানন্দ সেন নামক জনৈক ভদ্রলোক আনুমানিক ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে কলুটোলায় এই স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল, মার্টিন বাউল সাহেবের স্কুল পরিত্যাগ করিয়া এই স্কুলে কিছুদিন ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। এই স্কুলে তখন Murray's Grammar, Introduction ও Spelling Book পড়ান হইত।

(২৫) ধর্ম্মতলা-একাডেমী বা ড্রামণ্ড একাডেমী। উত্তরে গুমঘর, পূর্ব্বে হার্ট সাহেবের আস্তাবল, দক্ষিণে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, পশ্চিমে হাঁসপাতাল্ লেন, চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ডেভিড ড্রামণ্ড সাহেব ১৮১০ খৃষ্টাব্দে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিতকার লিখিয়াছেন, "ড্রামণ্ডই সর্ব্ব-প্রথমে নিজ স্কুলে

ইংরাজী ব্যাকরণ প্রবর্ত্তন করেন এবং গ্লোবের ব্যবহার সম্বন্ধেও শিক্ষাদান করিতে থাকেন। তৎকালে এই স্কুলটি, কলিকাতাস্থ যাবতীয় স্কুল অপেক্ষা শিক্ষাদানে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। ছাত্রগণের সংখ্যাও অধিক ছিল এবং ছাত্রদত্ত বেতন হইতেও যথেষ্ট লাভ হইত। হস্তাক্ষর, ইংরাজী পুস্তকপাঠ ও অঙ্কশিক্ষার দিকেই ড্রামন্ড সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কি গভর্ণমেণ্ট আপিস, কি সওদাগরী আপিস,—এই দুই স্থানে চাকরী করিতে হইলে উক্ত তিন প্রকার বিদ্যাশিক্ষারই প্রয়োজন হইত। কিন্তু ড্রামণ্ড সাহেব ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না—তিনি ক্রমে ক্রমে ইংরাজী এবং ল্যাটিন সাহিত্যও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তৎকালে যে কয়েকটি ইংরাজী স্কুল ছিল, তাহাদের কোনটিতেই ছাত্রগণের বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ড্রামণ্ড সাহেবই নিজ বিদ্যালয়ে বাৎসরিক পরীক্ষার সৃষ্টি করেন। প্রসিদ্ধ ডিরোজিও (Derozio) সাহেব (যিনি একদিন সমগ্র হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন) এই স্কুলের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন।

ড্রামণ্ড সাহেব কুব্জপৃষ্ঠ ছিলেন। এজন্য লোকে তাঁহার স্কুলকে "কুঁজো-সাহেবের স্কুল" বলিত। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি অসাধারণ ছিল। তিনি স্বয়ং একজন সুকবি ছিলেন। তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি লোয়ার সার্কুলার রোড্ সমাধি-স্থানে সমাহিত হইয়া রহিয়াছেন।

(২৬-২৮) হ্যালিফ্যাক্স স্কুল, লিন্ড্সটেণ্ড ও ড্র্যাপার সাহেবের স্কুল। এই তিনটি স্কুল কলিকাতায় কোন্ স্থানে ও কোন্ বৎসরে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না।

(২৯) রেভারেণ্ড ইয়েট্স্ সাহেবের বালক বিদ্যালয়। এই স্কুলটির ইতিহাসের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না।

(৩০) লসন্-বিবির স্কুল।

(৩১) ফ্যারেল সেমিনারী। আরচার সাহেব ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে যে স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তিনি বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছেন দেখিয়া ফ্যারেল (Farael) সাহেবও পর বৎসরে একটি স্কুল খুলিয়া বসিলেন। কিন্তু ড্রামণ্ড সাহেবের

স্কুলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া এই স্কুলটি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৩২) হাটারম্যান্‌-সাহেবের স্কুল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হাটারম্যান্‌ সাহেব বৈঠকখানায় এই স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ছয়টি ভাষা জানিতেন। তাঁহার মত ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত লোক তৎকালে কলিকাতায় আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার স্থাপিত স্কুল ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। হাটারম্যান্‌ সাহেবের স্কুল হইতে অনেকগুলি লোক সুচারুরূপে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন।

(৩৩) দি ক্যালকাটা বেনাভোলেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউট্‌। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বউবাজারে এই স্কুলটি স্থাপিত হইয়াছিল। দরিদ্র ক্রিশ্চানদিগকে শিক্ষাদান করাই এই স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীরামপুর মিসনের ডাঃ উইলিয়াম কেরীই এই স্কুলের প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন। কিছুকাল পরে হিন্দু, মুসলমান, পর্টুগীজ, আর্ম্মাণী, মগ, চীনেম্যান প্রভৃতি জাতির বালকগণও ইহাতে প্রবেশ করিয়াছিল।

(৩৪) বিশপস্‌ কলেজ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বিসপ মিডল্‌টন্‌ এই কলেজের ভিত্তিস্থাপন করেন। এদেশীয় ক্রিশ্চানদিগকে খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারেব জন্য প্রস্তুত করাই এই কলেজের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। এখন যেখানে শিবপুর এন্‌জিনিয়ারিং কলেজ রহিয়াছে, সেইখানেই পূর্ব্বে বিশপস্‌ কলেজ ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিশপস্‌ কলেজের বাড়ীখানি গভর্ণমেন্টকে বিক্রয় করা হইলে এই কলেজ ৩৩নং সার্কিউলার রোডে উঠিয়া আসে। অবশেষে ২২৪ নং লোয়ার সার্কিউলার রোডে জমি কিনিয়া বাটী নির্ম্মাণ করা হয়। এখন এই কলেজ স্থায়িভাবে এইখানেই অবস্থিত রহিয়াছে।

(৩৫) ম্যাকে সাহেবের স্কুল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ম্যাকে সাহেব নিমতলা ষ্ট্রীটে এই স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় এই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই এই স্কুলটি উঠিয়া যায়। ম্যাকে-সাহেব স্কটল্যাণ্ড দেশবাসী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী অতি উত্তম ছিল।

(৩৬) লেডিস্ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন। বিবি উইলসন (বিবি কুক)। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলটি স্থাপন করেন।

(৩৭) আর্ম্মিনিয়ান্ ফিল্যান্থ্রপিক ইন্‌ষ্টিটিউশন। আর্ম্মাণী-গণের বিদ্যাশিক্ষার্থে ১৮২১, ২রা এপ্রিল এই স্কুলটি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(৩৮) ইউরোপিয়ান ফিমেল অরফ্যান এসাইলাম। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে বিবি টমসন এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বামী টি. টমসন সাহেব স্বয়ং এই স্কুলের তত্ত্বাবধান করিতেন। যে-সকল সৈনিকপুরুষ যুদ্ধে বা অন্য কোন কারণে প্রাণত্যাগ করিতেন, তাঁহাদের প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাগণকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য সহৃদয় রেভারেণ্ড টমসন সাহেব এই স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে সারকিউলার রোডে ৩৭,০০০্ টাকা ব্যয় করিয়া জমি ক্রয় করা হইয়াছিল। এই স্কুলটি দ্বারা ইউরোপীয় সৈনিক-কন্যাগণের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল।

(৩৯) লিন্‌ড্‌ষ্টেট্ ও অর্ডের সেমিনারী। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে দুইজন সাহেবের সহযোগিতায় এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। স্কুলটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

(৪০) ইণ্ডিয়ান একাডেমী। রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে দিকে শুঁড়িপাড়ায় এই স্কুলটি স্থাপন করেন। সাধারণ লোকে ইহাকে "রামমোহন রায়ের স্কুল" বলিত। রামমোহনে দুই পুত্র রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ রায় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিছু দিন এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন। মহর্ষি লিখিয়াছেন, "শৈশব কাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু কলেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটী হেদুয়া-পুষ্করিণীর ধারে অবস্থিত।" এই স্কুলের অনতিদূরে হরীতকী-বাগানে স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী ছিল। নিকটে

বলিয়া তিনি বাল্যকালে কিছুদিন এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন। ভূদেববাবু যখন এই স্কুলে Reader No, II পড়িতেন, তখন কাশীনাথ মিত্র নামক একটি লোক তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। একদিন তিনি ভূদেববাবুকে বিলক্ষণ প্রহার করায় তিনি স্কুল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৩০, ১৫ই নভেম্বর রাজা রামমোহন রায় বিলাত-যাত্রা করেন। কিন্তু এদেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তিনি পূর্ণচন্দ্র মিত্রকে প্রধান শিক্ষক এবং নবীনমাধব দে কে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামমোহনের বিলাত যাত্রার পরে উভয়ের মধ্যে হিসাবপত্রের ব্যাপার লইয়া গোলযোগ হওয়ায় নবীনমাধব দে একটি নূতন স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৪১) কলিকাতা গ্রামার স্কুল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। পেরেন্ট্যাল একাডেমীর অধ্যক্ষগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হওয়ায় স্কুলটির সৃষ্টি হয়।

(৪২) পেরেন্ট্যাল একাডেমী বা ডভটন কলেজ (Doveton College)। ১৮২৩ ১লা মার্চ জন উইলিয়ম রিকেট্স এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা খ্রিশ্চানদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। যাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার সম্যক্ আলোচনা হয়, তদ্বিষয়ে এই স্কুলটি যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। এই স্কুলটি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৪৩) প্র্যাট্ মেমোরিয়্যাল গের্ল্স্ স্কুল। ৮৪এ নং লোয়ার সার্কিউলার রোডে বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। এখন ইহা ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত।

(৪৪) মধুসূদন চক্রবর্ত্তীর একাডেমি। মধুসূদন চক্রবর্ত্তী নামক একজন নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মাণিকতলায় এই স্কুলটি স্থাপন করেন। নবীনমাধবের স্কুল ছাড়িয়া ভূদেববাবু পাঁচ মাস এই স্কুলে পড়েন। স্কুলের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি অবশেষে হেয়ার সাহেবের স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

(৪৫) ভেরিউলাম (Verulam) একাডেমী। ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলের অবস্থা যখন শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন তাহার সহিত এই স্কুলটি মিলিত হইয়াছিল। মাণ্টাস্ব নামক একজন সাহেব

এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল।

(৪৬) সেণ্ট্রাল স্কুল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মে মাসে এই স্কুলের ভিত্তি-স্থাপন ও পরবর্ত্তী বৎসরে নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছিল। কুমারী উইলসন এই স্কুল পরিদর্শন করিতেন।

(৪৭) গোবিন্দ বসাকের স্কুল। এই স্কুলটি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। হাইকোর্টের জজ্ স্বর্গত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

(৪৮) চার্চ মিসনারী স্কুল। দরিদ্র হিন্দু বালক ও বালিকা-গণের নিমিত্ত ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলের সৃষ্টি হইয়াছিল।

(৪৯) জয়নারায়ণ মাষ্টারের স্কুল। এই স্কুলটি নিমতলায় অবস্থিত ছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়া সেই বৎসরেই লোপ পাইয়াছিল। ভোলানাথ চন্দ্র কয়েক মাস এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

(৫০) কলিকাতা হাই স্কুল। ১৮৩০, ১লা জুন তারিখে এই স্কুলটির সৃষ্টি হইয়াছিল। রেভারেণ্ড্ ম্যাক্কুইন সাহেব ইহার প্রথম রেক্টার হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ইহার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহার অধঃপতন হয়।

(৫১) নবীনমাধব দের স্কুল। রাজা রামমোহন রায় বিলাত গমন করিলে প্রধান শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র মিত্র ও দ্বিতীয় শিক্ষক নবীনমাধব দে উভয়ে মিলিয়া রাজার প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান একাডেমী" চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু লভ্যাংশ লইয়া বিবাদ হওয়ায় নবীনমাধব দে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে একটি অবৈতনিক ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান একাডেমী ত্যাগ করিয়া এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কৈলাসচন্দ্র বসুও কিছুদিন এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ভূদেববাবু লিখিয়াছেন, "আমি যখন এই স্কুলে ভর্ত্তি হই, তখন নবীনমাধববাবু একদিন হেয়ার সাহেবকে আপন স্কুলে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করাইলেন। হেয়ার সাহেব সন্তোষ প্রকাশ করিলে নবীনবাবু সাহেবকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার স্কুলের কোন

ছেলেকে সাহেব যেন নিজের স্কুলে ভর্ত্তি না করেন,—করিলে তাঁহার স্কুলটি উঠিয়া যাইবে। হেয়ার সাহেব এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, এবং বরাবরই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।”

(৫২) ক্ষেম বসুর স্কুল। ক্ষেমঙ্কর বসু নামক জনৈক কায়স্থ পাথুরিয়া ঘাটায় একটি স্কুল করিয়াছিলেন। ১৮৩০ ও ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল বলিয়া মনে হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথমতঃ এই স্কুলেই লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

(৫৩) সেণ্ট জেভিয়াস্ কলেজ। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রোম্যান্ ক্যাথলিক সাহেবগণ এই কলেজটি স্থাপন করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জেসুয়িটগণ চলিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে বহুকাল ধরিয়া এই কলেজটির সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

(৫৪) লা-মার্টিনিয়ার স্কুল। ১৮৩৬, ১ মার্চ্চ তারিখে এই স্কুলটি স্হাপিত হইয়াছিল। মেজর-জেনারল ক্লড্ মার্টিন এই স্কুলের নিমিত্ত যথেষ্ট টাকা দান করিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে ছাত্রগণ বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা করেও আহারাদি পায়।

(৫৫) নেটিভ অর্ফ্যান্ স্কুল। বিবি উইলসন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে স্কুল স্হাপন করেন।

(৫৬) জেনারেল এসেম্‌ব্লিস ইনষ্টিটিউশন ও ফ্রি চার্চ ইন্‌ষ্টিউশন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড ডাফ সাহেব এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। এ দেশীয় বালকদিগকে শিক্ষাদান করা তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিলেও তাঁহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করাই তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। প্রথমতঃ এই স্কুল ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাটিতে অবস্হিত ছিল। প্রথম দিন ৬ জন মাত্র ছাত্র ভর্ত্তি হয়। রাজা রামমোহন রায় মহাশয় এবিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হেদুয়া-পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান বাড়ীখানি নির্ম্মিত হইলে সেইস্হানে এই স্কুল উঠিয়া আসিয়াছিল।

কয়েক বৎসর পরে ডাফ সাহেবের সহিত তাঁহার সঙ্গিগণের মনান্তর ঘটিলে ডাফ সাহেব ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে নিমতলায় প্রসিদ্ধ “ফ্রি-চার্চ ইন্‌ষ্টিউশন” কলেজ খুলিয়াছিলেন।

(৫৭) ইউনিয়ন্ স্কুল। এই স্কুলটি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দুপেট্রিয়ট-সম্পাদক প্রসিদ্ধ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন।

(৫৮) মেট্রপলিট্যান একাডেমী। হাটখোলার দত্তবংশীয় গুরুচরণ দত্ত মহাশয় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলটি স্থাপন করেন। গরাণহাটায় বাঁধা-বটতলার উত্তরদিকে ঠিক চিৎপুর রোডের পশ্চিম ভাগে যে বৃহৎ বাটীখানি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই উক্ত স্কুল বসিত। এই বাটীতে পূর্ব্বে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর শাখা স্কুল ছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এই বাটীতেই "জুলিয়াস সিজর" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। দর্শকগণকে টিকিট কিনিয়া অভিনয় দেখিতে হইয়াছিল। টিকিট বিক্রয় করিয়া বাঙ্গালী এই প্রথম অভিনয় করেন।

(৫৯) লোরেটো হাউস। ইহা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৭নং মিড্ল্টন্ রোডে স্থাপিত হইয়াছিল। "লোরেটো সিস্টারস্" ইহার প্রধান অভিভাবিকা ছিলেন। সম্ভ্রান্ত সাহেবদিগের কন্যাগণ ইহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। ধর্ম্মতলায় ইহার একটি শাখা-স্কুল আছে। Cathedral Female School, Bowbazar Female School ও St. John's Female School নামক আর তিনটি শাখা-স্কুলও দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলিও লোরেটো সিসটারদিগের দ্বারা পরিচালিত। ইহাতে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র বালিকাগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থ.কেন। ইহারাও যথাক্রমে ১৮৪২, ১৮৪৪ এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল।

(৬০) কেথিড্র্যাল অরফ্যানেজ। ক্রিশ্চানগণের চেষ্টায় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়। গৃহশূন্য মাতাপিতৃহীন ছাত্রেরাই এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করে। কতকগুলি ছাত্র বেতন দেয়, অবশিষ্ট ছাত্রগণের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট বেতন দিয়া থাকেন।

(৬১) ইটালী অর্ফ্যানেজ "লোরেটো সিস্টার"-গণের চেষ্টায় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। ইটালী নর্থ-রোডের উত্তর দিকে ডক্টর কোরিউ সাহেব একখানি সুবিস্তৃত বাড়ী ও তৎসংলগ্ন প্রচুর জমি স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া ইহাতে এই স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। স্কুলটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে

ছাত্রগণ বেতন দিয়া পড়ে। দ্বিতীয় বিভাগে মাতাপিতৃহীন বালকগণ বিনা বেতনে পড়শুনা করে। তৃতীয় বিভাগে, খৃষ্টধর্ম্ম-দীক্ষিত দেশীয় মাতাপিতৃহীন বালকগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে।

(৬২) সেণ্ট জোসেফ্স্ স্কুল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ৬৯নং বউবাজার ষ্ট্রীটে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। The Bowbazar Boys' School ইহা রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত। এই স্কুলটি দুই ভাগে বিভক্ত, একটি ছাত্রগণ বেতন দিয়া পড়ে, অপরটিতে দরিদ্র ছাত্রগণ বিনা বেতনে পড়িয়া থাকে।

(৬৩) হিন্দু চারিটেবল্ ইন্ষ্টিটিউসান্ বা হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়। ১৮৪৫, ২ জুন হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, রমাপ্রসাদ রায়, হরিমোহন সেন, নবীনচন্দ্র সিংহ, সাতু সিংহ, রাধানাথ দত্ত, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ছাতুবাবু, লাটুবাবু, প্রভৃতি কলিকাতার তাৎকালিক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব এই বিদ্যালয়ের সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন ইহার সম্পাদক ছিলেন।

স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিনের জন্য মাসিক ৬০্ টাকা বেতনে এই স্কুলের হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলেম।

হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ের ফণ্ডের টাকা আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) হাত দিয়া "ইউনিয়ন-ব্যাঙ্কে" জমা ছিল। কিন্তু এই ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া যাওয়ায় ফণ্ডের সমস্ত টাকাই নষ্ট হইল এবং স্কুলটিও শীঘ্রই উঠিয়া গেল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বহুযত্নে এই স্কুলটি স্থাপন করিয়া ছিলেন। ইহা দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

(৬৪) সেণ্ট-পল্স্ স্কুল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাই-স্কুলের অধঃপতন হওয়ায় পর বৎসর ইহার স্থানে সেণ্ট-পল্স্ স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল।

(৬৫) সেণ্ট্-জন্স্ কলেজ। জেসুয়িটগণ সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ পরিত্যাগ করিয়া যাইলে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল।

(৬৬) বীটন্ নেটিভ ফিমেল স্কুল। ১৮৫০ নভেম্বর মাসে

জে, ই, ই, ডি বেথ্ন (বীট্ন্) সাহেব এই স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন। ডিরোজিও সাহেবের প্রসিদ্ধ ছাত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বেথুন কলেজের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ডেপুটি গভর্ণর স্যার জন্ লিট্লার ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। স্কুল-স্থাপনের সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

(৬৭) সেণ্ট্ স্যান্ডাক্টস্ (St. Sanduct's) সেমিনারী। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে আর্মিনিয়ান ফিল্যানথ্রপিক ইন্ষ্টিটিউসন বিলুপ্ত হইলে পর বৎসর এই স্কুলটি স্থাপিত হইয়াছিল।

(৬৮) সেণ্ট্ জেম্স্ স্কুল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৮৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে সেণ্ট্ জেম্স চার্চের নিকটেই এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। যে-সকল ছাত্র বেতন দিতে অক্ষম, তাহারাই এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্কুল-বাড়ীখানির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

লেখক-প্রবন্ধ-পরিচিতি

অন্নদাশঙ্কর রায়—পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সারা ভারত থেকে আই. সি. এস. পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটির সভাপতি, বিশ্বভারতী কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, বাংলা অকাদেমীর সভাপতি সর্বজন-শ্রদ্ধেয় লেখককে সম্প্রতি নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। শতাধিক গ্রন্থের লেখক একাডেমী পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার ও আনন্দ পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত।

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধটি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে "বিচিত্রা" পত্রিকায় প্রকাশিত।

অনুরূপা দেবী—সমাজ সংস্কারে অক্লান্ত কর্মী কাশী ও কলিকাতার বহু কন্যাবিদ্যাপীঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং একাধিক নারীকল্যাণ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। জ্যোষ্ঠা ভগিনী সাহিত্যিক ইন্দিরা দেবীর অনুপ্রেরণায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তিনি ৩৩টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর সম্মানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী ও ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক প্রদান করেছিলেন।

এই গ্রন্থে তাঁর লেখা সংগৃহীত প্রবন্ধটি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

অনাথনাথ বসু—বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞান অর্জন করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের কাজ যথেষ্ট সফলতা লাভ করেন। ১৯৪৮ খ্রীঃ দিল্লীর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (Central Institute of Education) অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২—৫৩) এর সদস্য ছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থ আছে।

এই ' বন্ধটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

অবলা বসু—স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর পত্নী লেডী অবলা বসু নামে সমধিক পরিচিত, বহুবার ইনি স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। ১৯১৯ খ্রীঃ নারী শিক্ষা সমিতি এবং বিধবাদের জন্য 'বিদ্যাসাগর বাণী ভবন' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা ছিলেন।

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধটি "সুপ্রভাত" পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দে বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

কৃষ্ণভাবিনী দাস—ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সেবাকাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। কলিকাতার পথে পথে ঘুরে ঘুরে পর্দানশীন মেয়েদের শিক্ষা-ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তাঁরই উদ্যোগে মণ্ডলের তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয়। তাঁর লিখিত বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ বহু পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি 'প্রদীপ' পত্রিকায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

চুণীলাল ভট্টাচার্য্য—ইনি একজন প্রাবন্ধিক। মূক-বধির শিক্ষার উপর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখেছেন।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্যক্তিগত জীবনে সাবজজ ছিলেন। এনার ছদ্মনাম পলিটিকাস। ইতিহাস রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল। মডার্ণ রিভিউ, প্রবাসী, প্রদীপ প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ ও সমালোচনা লেখক হিসেবে পাঠক সমাজের কাছে পরিচিত ছিলেন।

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

নিরুপমা দেবী—গদ্য রচনা ও গল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করবার জন্য শরৎচন্দ্র ও অনুরূপা দেবীর কাছে কৃতজ্ঞ। স্বদেশী যুগে

তাঁর রচিত বহু গান ও কবিতা খ্যাতিলাভ করেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক ও জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ বর্দ্ধমান সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সম্মানিত হন।

তাঁর লেখা প্রবন্ধটি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর আশুতোষ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। বহ সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা সংগ্রহ ও বঙ্গানুবাদ করে কাশী থেকে উদ্ভটসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়—দেশবাসীর দ্বারা 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত। রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য ডি. এস. সি. উপাধি ও হোপ্ পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ছাত্রানুরাগী, বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, ইতিহাস, ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। ভারতে রসায়ন চর্চা ও গবেষণার পথিকৃৎ জাতিভেদ, বাল্য বিবাহ, পণপ্রথা প্রভৃতি কুপ্রথার বিরোধী ও আর্তত্রাণে সদা তৎপর ছিলেন।

এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবি বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধের প্রতীক ছিলেন। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের রচয়িতা হিসেবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র নামে সম্মানিত হয়েছিলেন। জনগণ কর্তৃক সাহিত্য সম্রাট উপাধিতে সম্মানিত। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সার্থক উপন্যাসের ও প্রথম সমালোচনা সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৪ টি। যোগাযোগ ও ভাবের আদান প্রদানের জন্য 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধটি "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় ১২৮৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত।

বিনয়কুমার সরকার—১৯০৫ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ঈশান স্কলারশিপ সহ বি. এ ও ১৯০৬ খ্রীঃ এম. এ. পাশ করেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও তুলসীচরণ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী ও বাংলা ভাষা ছাড়াও ৬টি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। বিদেশে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রত্যাখান করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ অধ্যাপনা কালে মালদহে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

"গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা" প্রবন্ধটি ১৩১৬ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিমলাচরণ লাহা—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সুবর্ণপদক, ব্যানার্জী গবেষণা পুরস্কার (লক্ষ্ণৌ), গ্রিফিথ পুরস্কার ও সিংহলের বুদ্ধাগম শিরোমণি পুরস্কার প্রাপ্ত এই লেখক কলকাতার বিখ্যাত লাহা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৪ খ্রীঃ ডক্টরেট উপাধি পান। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, আইন, প্রাচীন শ্লোক-সমূহ, ইতিহাস, ভূগোল, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 'বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট' পত্রিকার সম্পাদক, এশিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি, কলিকাতার শেরিফ, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। তিনি বহু পাণ্ডিত্যমূলক গবেষণা গ্রন্থের রচয়িতা।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সহ সম্পাদক ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের তাঁর অবদানের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ সংখ্যা ৩৩। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

মায়া সোম—ইনি একজন শিশু শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ছিলেন। শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ 'বিচিত্রা, 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি ১৩৪০ বঙ্গাব্দে 'উদয়ন' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

মোহম্মদ ওয়াজেদ আলি—সারাজীবন গ্রামবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি কলেজ, হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন।

তাঁব লেখা প্রবন্ধটি 'উদয়ন' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

যতীন্দ্রমোহন সিংহ—কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল উড়িষ্যাবাসী। ইনি ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় লিখতেন। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসৃত হয়েছে।

"হিন্দুর জাতীয় শিক্ষা" প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

যোগেশচন্দ্র বাগল—বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ও গবেষণায় তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ 'রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার', 'সরোজিনী বোস স্মৃতি স্বর্ণপদক' ও 'শিশিরকুমার পুরস্কার লাভ করেছিলেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিবার সম্পাদকীয় বিভাগের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪০ খ্রীঃ তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাঠক সমাজে সুপরিচিত হন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর লেখা 'Women's Education in Eastern India' এবং 'স্ত্রীশিক্ষার কথা' বই দুখানি বিশেষ তথ্যবহুল।

এই সংকলনে সংকলিত প্রবন্ধটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষির বিস্তারিত নিষ্প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা সমাপ্ত না করতে পারার জন্য পরিণত বয়সে আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ঠাকুর বাড়ীর পরিবেশে তিনি বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত

ও অংকন বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সঙ্গীত প্রত্যেক বিভাগেই তাঁর অবদান অজস্র এবং অপূর্ব। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্, সুরকার, নাট্যকার ও স্বদেশপ্রেমিক। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বভারতী। তাঁর লেখা শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থগুলি আজও শিক্ষার মূল্যবান দলিল হিসাবে পরিগণিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৩২৬ বঙ্গাব্দে ১৮ই আষাঢ় শান্তিনিকেতনে যে ভাষণ দেন, সেই ভাষণটি "বিশ্বভারতী" নামে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে 'বিচিত্রা" পত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা' প্রবন্ধটি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রাজশেখর বসু—রবীন্দ্র পুরস্কার, আকাদেমী পুরস্কার ও পদ্মভূষণে উপাধিতে ভূষিত রাজশেখর বাংলা সাহিত্যে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রসরচনার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের প্রিয়পাত্র মোট ২১টি গ্রন্থ রচনা করলেও রচনার কারণে ও গুরুত্বে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় পুরুষ হয়ে আছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত বানান—সংস্কার সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সংসদের সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেছিলেন।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি "দেশ ঃ সাহিত্য সংখ্যা," ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—খ্যাতনামা সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ সাংবাদিক হিসেবে নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং দৃঢ়চেতা ছিলেন। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষাতেই বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে বৃত্তিলাভ করেছিলেন। সিটি কলেজ, এলাহবাদ কায়স্থ পাঠশালা ও বিশ্বভারতীয় প্রভৃতির অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি 'প্রদীপ', 'প্রবাসী" 'Modern Review' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীঃ ও ১৯৩১ খ্রীঃ এলাহাবাদে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং সেকেণ্ডারী এডুকেশন রিফর্ম কমিটির সদস্য ছিলেন।

সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতাগণ এবং রবীন্দ্রনাথ, আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ প্রায়ই তাঁর মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

এই গ্রন্থে তাঁর লেখা প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। কৃতী ছাত্র এণ্ট্রান্স, বি. এ., এম. এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন ও পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির অধিকারী। ব্যক্তিগত জীবনে রিপন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। শৈশব থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল। নবজীবন, সাধনা, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। বাংলা সাহিত্য জগতে 'সাহিত্য পরিষদের' গুরুত্ব মূলতঃ রামেন্দ্রসুন্দরের আত্মত্যাগের জন্যই প্রতিষ্ঠিত।

১৩০৫ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'ভারতী' পত্রিকায় এই গ্রন্থে সংগৃহীত লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—১৯০৫ খ্রীঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। প্রথমে রংপুর জাতীয় বিদ্যালয় ও পরে কলিকাতার জাতীয় বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। সহপাঠীর মধ্যে প্রফুল্ল চাকীর নাম উল্লেখযোগ্য। বিনয় কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও গণেশ দেউসকরের ছাত্র ছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছেন। 'সাপ্তাহিক হিতবাদী', 'বিজলী', 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। I. P. T A., World Peace Council, সাহিত্য একাডেমী ও সঙ্গীত নৃত্য একাডেমীর সদস্য ছিলেন। সারা জীবন নাটক রচনা পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন।

১৩২৫ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় "জাতীয় শিক্ষা" প্রবন্ধটি প্রকাশিত।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক। জনগণ কর্তৃক অপরাজেয় কথাশিল্পী, দরদী কথাশিল্পী, অদ্বিতীয় কথাশিল্পী আখ্যায় ভূষিত। মানব প্রীতি শরৎসাহিত্যকে অনন্য বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে। কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয় প্রদত্ত জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডি. লিট উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন শুধু কথা-শিল্পী রূপে নয়, প্রবন্ধকার রূপেও তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন দাবী করতে পারেন।

'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধটি চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত নারায়ণ পত্রিকায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৮৮৬ খ্রীঃ-এ ইংরাজীতে এ. এম এ. পাশ করে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রী. ডন পত্রিকার সম্পাদক রূপে যোগদান করে। ১৯১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিলেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টের প্রতিবাদে গঠিত ডন সোসাইটির (১৯০২) তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীঃ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হলে তিনি তাঁর প্রথম তত্ত্বাবধায়ক হন। তাঁর পরিচালাধীনে বাংলাদেশে অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের পর তিনি কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯১৪ খ্রীঃ থেকে তিনি শেষ জীবন কাশীতে কাটান।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি "সুপ্রভাত" পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম এই প্রবন্ধকারের। সবুজপত্রের লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। গদ্য ও পদ্য রচনায় কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিন। তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর লিখিত প্রবন্ধে নূতন ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

"প্রবাসী" পত্রিকার ১৩২৫ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

সরলা দেবী—পিতা ভারতীর জাতীর কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও প্রখ্যাত লেখিকা ছিলেন। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সর্বসাধারণের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতেন। পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে পর্দানশীন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের কাজেও উদ্যোগী হন। তাঁর চেষ্টার

ফলে ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয় ও সারা ভারতে তার শাখা বিস্তার লাভ করে। উত্তরাধিকার সূত্রে সাহিত্য প্রতিভা ছিল। কিছুদিন 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন, ও বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

এই গ্রন্থে তাঁর লিখিত প্রবন্ধটি "বিচিত্রা" পত্রিকায় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে তাঁর লিখিত প্রবন্ধটি "বিচিত্রা" পত্রিকায় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে সংখ্যায় প্রকাশিত।

স্বামী বিবেকানন্দ—আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা বলে সর্বত্র পূজিত হন। স্বল্পায়ু বহু কাজ করে গেছেন, কিন্তু কর্মের চেয়ে তাঁর বাণী ও প্রেরণা মহত্তর। তিনি আমাদের দেশকে নূতন জাতীয়তা ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন ও বিশ্বের কাছে ভারতের ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সফল কথ্য ভাষার তিনি অন্যতম প্রধান পরিচায়ক। তিনি ইংরাজী ও বাংলার বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধটি "স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী" থেকে সংগৃহীত।

সৈয়দ মুজতবা আলি—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক জার্মানের বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত। ১৫টি ভাষায় দক্ষতা ছিল। 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিংহ দাস পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সরস মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা, গভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতায় তাঁর রচনাবলী সমৃদ্ধ হয়েছিল। দেশে ও বিদেশে বহু বৎসর অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁর লেখা প্রবন্ধটি তাঁর রচনাবলী থেকে সংগৃহীত।

স্বর্ণলতা মল্লিক—মেয়েদের শিক্ষা ব্যাপারে একজন উৎসাহী সমাজ সচেতন নারী ছিলেন। তিনি ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সভায় যে ভাষণ দেন সেই ভাষণটি "সুপ্রভাত" পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। সেই অভিভাষণটি এই গ্রন্থে সংকলিত।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধটি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত।

॥ নির্দেশিকা ॥
